স্মৃতির খেয়া

সাহানা দেবী

প্রাইমা পাবলিকেশন্স
৮১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীনিশীথ ঘোষ
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০৯ এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

আমাদের মুনুদি

একদিন গুরুদেব তাঁকে সস্নেহে বলেছিলেন, 'আমি যদি সুরলোকের সম্রাট হতাম তবে তোমাকে আমার শান্তিনিকেতনে বন্দী করে নিয়ে আসতাম।'

বিশ্বকবির স্নেহধন্যা, ঋষি অরবিন্দের প্রিয় শিষ্যা ও শ্রীমায়ের আদরিণী কন্যা আজীবনের সুর-সাধিকা সাহানা দেবী—যিনি জীবনের একতারায় বেঁধে নিয়েছেন এক অখণ্ড-অমিয় মহাজীবনের ত্যাগ-তপস্যা-ভক্তির মহাগীত, তপশ্চারিণী মীরার মতো। সে মহাগীত কখনও বেজেছে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রার্থনা হয়ে, কখনও ঝরেছে অতুলপ্রসাদের প্রেমের অশ্রু হয়ে, কখনও তা ঝরেছে দ্বিজেন্দ্রগীতির কাব্য-গঙ্গোত্রী হয়ে।

ব্যক্তি-পরিচয় আর ব্যক্তিত্ব এক নয়। যেমন এক নয় জীবন ও জীবিকা।

গোলাপে কাঁটার মতো, দীপে আগুনের মতো, চাঁদে কলঙ্কের মতো—সাহানা দেবীর ব্যথা তাঁর একান্ত নিজস্ব—তাঁর গান সবার—গন্ধের মতো, আলোর মতো—ও জ্যোৎস্নার মতোই বিশ্বজনীন, সার্বজনীন।

তাই তো দেশবন্ধু-ভাগ্নী সাহানা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সেবিকা সাধিকা সর্বত্যাগিনী সাহানাদেবী।

'সাহানা' বসন্তের গোধূলি রাগ। বাসনার অন্তই বুঝি বসন্ত। অর্ধশতক জনজীবন থেকে দূরে 'ধন নয় মান নয়' মন্ত্র বুকে করে 'সুর' ও 'সেবার' লব কুশকে বুকে নিয়ে বসে আছেন 'সীতা'—তাঁর ব্যথার পূজার বেদন-দীপটি জেলে। স্নেহধন্য—

হিমাদ্রি রায়চৌধুরী

স্মৃতির খেয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথায় কখন পাড়ি দিচ্ছি তার ঠিকানা নেই। বেপরোয়া হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি দিক সম্বন্ধে খেয়ালশূন্য হয়ে। মন নোঙর বাঁধল এসে প্রথম জীবনের ঘাটে। চলে গেলাম 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'—তারই মাঝে, সেইখানে বিচরণ করছি। বিস্মৃতপ্রায় টুকরো টুকরো কত কথা, কত ঘটনার রঙিন ছবিগুলি সব একে একে উজ্জ্বল হয়ে এসে সামনে জ্বলজ্বল করছে। কিসের যেন সাড়া পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, পাতালের ঘুমন্তপুরী জেগে উঠেছে। দেখছি—কালের আবর্তনে যে জীবন বিলীন হয়ে গেছে অতীতের মাঝে, সেই অতীত-জীবন কেমন করে সামনে এগিয়ে আসছে, কেমন করে সেকাল একালের মধ্যে প্রবেশ করছে। বিগত যে জীবন, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আর নেই, তাকে দেখতে পাচ্ছি স্মৃতির রাজ্যে। স্মৃতি তাকে কাছে এনে দিচ্ছে, দিচ্ছে তার স্পর্শ। বেশ ঘোরের মধ্যে রয়েছি যেন কিসের একটা সঙ্গে যোগস্থাপনা করে। কখনও দেখি এসে দাঁড়িয়েছি মামার বাড়ির আঙিনায়, যে বাড়িতে বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি। যেখানে দেখেছি উদারতার, ত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত কত। দেখেছি বন্ধুর জন্যে জামীন হতে গিয়ে নিজেকে দেউলিয়া হতে। দেখেছি দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব হতে। আর দেখেছি স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবনকে পণ করে মরণকে তুচ্ছ করতে। বিশাল অন্তঃকরণ ছিল যাঁদের পরিচয়, যাঁদের কাছে অর্থ ছিল অর্থশূন্য, বিত্ত ছিল পায়ের ভৃত্য, সেই মামাবাড়িতে এস দাঁড়িয়ে আছি।

কলম তুলে নিলাম—

যে সালে বাংলাদেশে সেই সাংঘাতিক রকমের ভূমিকম্প হয়, আমার জন্ম সেই ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ভূমিকম্পের কিছুদিন আগে—আমি তখন মাত্র কয়েক দিনের শিশু। পিতৃদেব ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত সে সময়ে ফরিদপুরে সিভিল সার্জন। বাড়িভরা লোক। আমাদের মামা মাসিরাও কেউ কেউ তখন সেইখানে। ভূমিকম্পের সময় মা নাকি আমাকে কোলে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন আকাশের আশ্রয়ের তলে।

আমার বড়বোনের কাছে শুনেছি তখন নাকি তাঁরা সবাই মিলে খাটে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় খাটটি খুব জোরে নড়ে ওঠে। মাসিমারা ভাবলেন নিশ্চয় ছোটমামারই এ কাজ। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন ছোটমামাকে ধমক দিয়ে বলেন 'এই ভোলা, কি করছিস ? অমন করে খাট নাড়ছিস্ কেন ?'

ছোটমামার ডাকনাম ভোলা, উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দেন, 'বা রে! আমি কেন খাট নাড়তে যাব ?'

তখন সকলেই ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পেরে বাইরের দিকে ছুটতে থাকেন। যাই হোক শেষপর্যন্ত দেখা গেল আমাদের বাড়ির কারো কোনও ক্ষতি হয়নি।

ছোটমামা, ছোটমাসিমা, এঁরা আমাদের বড়বোনেরই প্রায় সমবয়সী ছিলেন, একসঙ্গে সব খেলাধূলা করতেন। ছোটমাসিমা আমাদের বাড়িতেই বেশি থাকতেন। ফরিদপুরের এই বাড়িতে আমাদের সবার চেয়ে বড়বোন দিদির দশবছরের ছোট্ট জীবনটির অবসান হয়। দিদি চলে যাবার ছয় মাস পরে, আমার দেড় বছর বয়সে, আমাদের পিতৃবিয়োগ হয়। আমরা তখন চারটি বোন একটি ভাই। আরেকটি বোন, সব-ছোট বোনটি, তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। বাবার মৃত্যুর দুমাস বাদে সে জন্মায়। এই অবস্থায় মাত্র তিরিশ বছর বয়সে আমাদের ছোট ছোট নিয়ে মা অকূলে ভাসলেন। শুনেছি পিতৃদেব মৃত্যুর আগে আমার মামা চিত্তরঞ্জনকে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) ডেকে তাঁর হাতে মাকে দিয়ে বলে যান —'চিত্ত, এরা রইল, দেখো।'

ভাইবোনেদের মধ্যে মা ছিলেন সকলের বড়। মামাবাড়ির সকলের হৃদয়ে পিতৃদেবের স্থান ছিল একটা বিশেষ জায়গায়। সকলকেই দেখতাম তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই গলার সুর বদলে ফেলতেন। আর সে সুরের পিছনে থাকত তিনি তাঁদের মনে যে ছাপ রেখে গেছেন তারই ছবি। বুঝতে পারা যেত দিদিমা দাদাবাবু থেকে আরম্ভ করে মামা মাসিদের প্রত্যেকেরই মনের গহনে

তিনি কোথায় বিরাজ করতেন। মনে হত অন্য আর সকলের চেয়ে তিনি ছিলেন ভিন্ন কোথাও, হয়ত বা ছিলেন অন্য আধারের। কথাবার্তা আলাপ আলোচনার সবকিছুর ভিতর পিতৃদেবের যে চিত্রটি তাঁরা আমাদের মনের সামনে তুলে ধরতেন তাই থেকে আমরা তাঁর পরিচয় পেতাম।

তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই দিদিমাকে দেখেছি কখনোই একথাটি বলতে ভুলতেন না যে, পিতৃদেব তাঁদের ঘরের শুধু জামাই-ই ছিলেন না, ছিলেন ওই পরিবারের একটি পরম হিতৈষী বন্ধু। বলতে ভুলতেন না যে, তাঁদের অসময়ে, দুর্দিনে তিনি কতই করেছেন, এমন কি আমাদের মা পর্যন্ত সব সময় সব জানতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর 'চেক্'-বই থেকে সে-সব জানা যায়। এমনি করেই আমাদের মন সংগ্রহ করে বেড়াত তাঁর সম্বন্ধে টুকরো টুকরো খবর, তাই থেকে খানিকটা আভাস পেতাম তাঁর চরিত্রের, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর, আর তাই থেকে তিনি আমাদের চোখে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠেন।

মায়ের এই অবস্থা হবার পর থেকে দিদিমা আর কোনও দিন সিন্দূর পরেন-নি। নরুন পেড়ে ধুতি পরতেন। অলঙ্কার অবশ্য আগেই সব দিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীর দেনার জন্যে। হাতে থাকত শুধু শাঁখা আর লোহা। আমরা জ্ঞানাবধি দিদিমাকে এই বেশেই দেখেছি। পরে শাঁখাও খুলে ফেলেন যখন আমাদের ছোটমামা বসন্তকুমার দাশ, চব্বিশ বছর বয়সে, তাঁর বিবাহের মাত্র দু'বছরের মধ্যে মারা যান।

ছোটমামা বার ফাইনাল পাস করবার আগে একবার দেশে বেড়াতে আসেন। সেই সময় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে অল্পদিনের মধ্যেই আবার বিলাত চলে যান, এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে এক বছর বাদে ফিরে আসেন। তিনি ফিরে এসে যখন কলকাতা আদালতে যোগদান করেন, তখন আলিপুর আদালতে চলেছে বিখ্যাত বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা—দেশবাসীর মনপ্রাণকে এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে। সকলেরই মন জুড়ে আছে এই মামলা আর তার গতিবিধি। মামাবাবু দাঁড়িয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে। মামারবাড়িতে সকলকে দেখলে মনে হত সকলেই রুদ্ধশ্বাসে উদ্‌গ্রীব হয়ে কিছুর জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন। দেশের লোকেরা সব চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে—প্রাণপণ তারা চাইছে এই মামলায় তাঁর জয়লাভ—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ সহ আসামীদের মুক্তি।

ছোটমামা যখন তিন বছরের ছেলে তখন তাঁকে তাঁর বড় জ্যাঠামশাই কালীমোহন দাশের বিধবা পত্নীকে দত্তক দেওয়া হয়। একে একে বড় দিদিমার

ছুটি ছেলেই (একটি বিবাহের পর) চলে যাওয়ায় ছোটমামাকে যখন পোষ্যপুত্র নিলেন তখন ছোটমামার নামের সঙ্গে দাশেদের তখনকার নামের ধারা অনুযায়ী 'রঞ্জন' রাখতে বোধ হয় তিনি আর তেমন ভরসা পেলেন না। তাঁর নাম হল 'বসন্তকুমার'। যাইহোক ছোটমামাকে নেবার অল্প দিনের মধ্যেই বড়দিদিমা গত হলেন এবং ছোটমামা আবার ফিরে এলেন এ বাড়িতে। আমাদের এই ছোট-মামাটি ছিলেন আনন্দময় পুরুষ। তাঁর অসাধারণ প্রাণোচ্ছলতায় বাড়ি যেন সর্বক্ষণ আনন্দমুখর হয়ে থাকত। সকলকে কাছে টেনে নিয়ে একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে মাতিয়ে রাখবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা দেখেছি তাঁর। ছোটমামার মৃত্যুর পর এ বাড়িতে আর তেমন করে হাসির হুল্লোড় শোনা যায়নি। কি প্রাণখোলা প্রাণমাতানো হাসির রোলই যে উঠত তখন।

সেই দিনগুলির কথা মনে হলেই ছোটমামার সেই হাস্যোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারাটি সামনে এগিয়ে আসে। অগ্রজ চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁর ভক্তি ভালোবাসা এবং আনুগত্য একটা দেখবার জিনিস ছিল। মামাবাবুও ছোট এই ভাইটিকে কি ভালোই বাসতেন, স্নেহের যেন অন্ত ছিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলেরই ছোটমামা খুবই আদরের ছিলেন। বড় সাধ ছিল দেশের কল্যাণে তাঁর জীবন-খানি সঁপে দিতে। কিন্তু তা আর হল না। তার আগেই চলে যাবার ডাক এল। তাঁর অকাল প্রয়াণে মামাবাবু যে কত কাতর হয়েছিলেন তা বোঝা যেত তিনি যখন ঘুরে ফিরে শিশুর মত কেবলই ছোটমামার কথা বলতেন। ছোটমামাকে পোষ্য দেওয়া হয়েছিল বলে মামাবাবুর অন্তস্থলে যে একটা গোপন ব্যথা ছিল তা এই সময় প্রকাশ হয়ে পড়ত। কেননা, প্রায়ই তাঁকে সেকথা বলতে শোনা যেত।

কালীমোহন দাশের বিধবা পুত্রবধূ আমাদের বড়মামিমার মুখে ছোটবেলায় অনেকবার একটা কথা শুনেছি যে, বড়দাদামশাই রাস্তার ধারে কোথায় যেন একটি শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে পান, এবং সেই শিবলিঙ্গটি নিয়ে এসে বাড়িতে মন্দির করে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করার আগে তিনি স্বপ্নে আদেশ পান যে, ওই শিবলিঙ্গ যেন স্থাপনা করা না হয়, করলে ওঁর বংশ থাকবে না। তিনি জেদী মানুষ ছিলেন, স্বপ্নাদেশের বিশেষ মূল্য দেননি (এখানে বলে রাখি যে, সত্যই কালীমোহন দাশের বংশে বাতি দিতে কেউ আর রইল না)। এখন যেটা 'চিত্ত-রঞ্জন সেবাসদন' এই বাড়িই বড়দাদামশাইয়ের সেই বাড়ি, নাম ছিল তখন 'কালীমোহন আলয়'। আর এই বাড়ির পুকুরপাড়ের শিবমন্দিরই বড়দাদা-মশাইয়ের স্থাপিত সেই তুলে আনা শিবের মন্দির। এখন আর সে শিবমন্দির

আছে কি না জানি না। মামাবাবু যতদিন এই বাড়ি দেশের কাজের জন্যে দান করে না দেন ততদিন পর্যন্ত এই শিবমন্দিরে নিত্য নিয়মিত পূজার্চনা হত আমরা দেখেছি, জানি। শুনেছি পুকুরটি এখন আর নেই, বুজিয়ে ফেলে তার উপর ইমারত গড়া হয়েছে।

টাইফয়েড রোগে ভুগে ১৯১০ সালের মে মাসে দার্জিলিঙে জলাপাহাড়ের উপর 'সণ্ট্ হিল' নামক বাড়িতে মেজমামিমার কাছে ছোটমামা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মামাবাবু তখন আরাতে বিখ্যাত 'ডুমরাওন কেস্' করছিলেন। ছোটমামা তাঁর জুনিয়র হয়ে এই মামলায় সবে কাজ শুরু করেছিলেন। ছোট-মামার মৃত্যুতে দিদিমা শয্যা নিলেন। তারপর আর বছর তিনেক বেঁচেছিলেন। দিদিমার তিরোধানের পর তাঁর দেহ যখন সুসজ্জিত করা হয় আল্‌তা সিন্দুর ও চওড়া লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরিয়ে, তখন কেবল দেখেছিলাম তাঁর সধবার বেশ।

মামাবাবু যখন আইন ব্যবসা শুরু করেন তখন মামাবাড়ির অবস্থা সচ্ছল ছিল না, দাদামশাইয়ের ঋণের জন্যে। বন্ধুদের জামিন হতে গিয়ে দাদাবাবুকে দেউলিয়া হতে হয়। মামাবাবুকে তখন অনেক সময় হেঁটে আদালতে যেতে হত। কতদিন এমন হয়েছে যে, শুধু ডালভাত ছাড়া তাঁর অদৃষ্টে আর কিছু জোটেনি। এই অবস্থা জেনেও পিতৃদেব মামার হাতেই আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। মামার উপর তাঁর এমনই বিশ্বাস ছিল, এতটা নির্ভরযোগ্য তাঁকে বুঝেছিলেন। মা-ও তাঁর যা কিছু সম্বল ছিল সব নিঃশেষে ভাইকে দিয়ে দেন পিতৃঋণ লাঘবের কিছু কাজেও যদি লাগে।

নিজেকে নিঃসম্বল করে অপোগণ্ড শিশুগুলিকে নিয়ে ভাইয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে মা চলে এলেন পিত্রালয়ে। সেই থেকেই আমরা মামারবাড়িতে মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে মানুষ হয়েছি। চিরজীবন মামাবাবু আমাদের জন্যে কি করাই করেছেন। তাঁর হৃদয়টি ছিল আকাশের মত উদার অন্তহীন। এমন একখানি হৃদয়ও আর চোখে পড়েনি। মামাবাবু জীবনে কোনও দিনই বিস্মৃত হননি যে, সন্তানদের মুখের দিকে না তাকিয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, তাঁর দিদি যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যখন তাঁর রোজগার ছিল না, নামও হয়নি, এবং ভবিষ্যতে তিনি কি হবেন না হবেন সে-সব কিছুই না জেনে। মায়ের এই দেওয়াকে মামাবাবু যে কতবড় চোখে দেখতেন সে-সব তিনি কতবার কতভাবে কতখানি বুকভরা দরদ দিয়ে ব্যক্ত করতেন কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, সে আমরা বারবার দেখেছি। আজীবন এমন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেও আর

কাউকে দেখেছি কি না মনে করতে পারি না। আমাদের মা, তাঁর দিদিকে তিনি প্রায় পুজা করতেন বললেও বোধ হয় বেশি বলা হয় না। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমাদের মায়ের দ্বারা কখনও কোনও অপকার বা কোনও রকম হেয় কিছু হতেই পারে না। আর একটি বিশ্বাস ছিল যে, মা কখনও কোনও কারণেই মিথ্যা বলবেন না। তাঁর কাছে তাঁর দিদি ছিলেন এ-সবের ঊর্ধ্বে। সত্যই আমাদের মা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। এঁদের ভাইবোনের সম্বন্ধই ছিল যেন অন্য কোনও এক ভিত্তির উপর, এত পবিত্র আর এত স্বর্গীয় মনে হত।

মাও তেমনি দেখতাম ভাইটিকে দেখতেন কোন্ দৃষ্টিতে, আর স্থান দিতেন কোথায়। মাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—চিত্ত ছোট কাজ করতেই পারে না। এ ধারণা থেকে এতটুকুও তাঁকে কেউ কোনও দিন টলাতে পারেনি। এই দেবতুল্য ভাই ছিল তাঁর কাছে সকল তুলনার অতীত। মামাবাবুর বিরুদ্ধে কোনও কথা তিনি সইতেই পারতেন না, বিশ্বাসই করতেন না। আমরা অনেক সময় বলাবলি করতাম—মামাবাবু সম্বন্ধে মা অন্ধ। অনেক সময়েই মা দুঃখ করে আমাদের বলতেন,—'তোমরা যে কি মামারবাড়ি পেয়েছ তার কিছুই তোমরা বুঝলে না'—এও বাপের বাড়ি সম্বন্ধে মায়ের দুর্বলতা আমরা ভাবতাম।

কিন্তু যত দিন গেছে তত বুঝতে পেরেছি তাঁর কথার তাৎপর্য, মর্ম। দিদিমা, দাদাবাবুর কাছে বড় হয়েছি। দিনের পর দিন তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছি, কিন্তু আজও মনে করতে পারি না তাঁদের মধ্যে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হিংসাপরায়ণতা —এই ধরনের কোনও প্রবৃত্তি কখনও দেখেছি বলে। এবং এই জাতীয় জিনিস কারও মধ্যে না-থাকা বা দেখতে না-পাওয়া, এটা যে তার চরিত্রের কত বড় দিক, দুনিয়ায় কত দুর্লভ বস্তু, তা চিনতে পেরেছি অনেক পরে, বড় হয়ে মামারবাড়ির আওতা থেকে বের হয়ে আসবার পরে সংসারে প্রবেশ করে। অনেক ঠেকে, অনেক দেখে, নানা মানুষের সংস্পর্শে এসে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার ফলে বুঝতে শিখেছি এইসব জিনিসের মূল্য। বুঝতে পেরেছি, মামারবাড়িতে যে-সব উদারতার দৃষ্টান্ত অহরহ দেখেছি অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার মধ্যে, তা জগতে কত বিরল। চিনতে পেরেছি, আমরা যা সাধারণ ভাবতাম, তা কত অসাধারণ।

মনে পড়ে তাই মায়ের সে-সব কথা, মনে পড়ে আজও মামারবাড়ির কথা—দানশীলতা, মহানুভবতা —এইসব ছিল যাঁদের সহজাত বৃত্তি, এইসব নিয়েই যাঁরা জন্মেছিলেন, এইসব ছিল যাঁদের সাথের সাথী, চরিত্রের স্বাভাবিক দিক, জীবনের

অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। এঁরা মোটেই হিসেব করে দিতে জানতেন না। স্বভাবে এঁরা পরিণামদর্শী ছিলেন না, এবং দিতে হবে বলেও দিতেন না। দেবার মধ্যে এঁদের বাধ্যবাধকতার অনুভূতি থাকত ন', দিতেন স্বভাবের স্বাভাবিক তাগিদের বশে। দিতে ভালোবাসতেন, দিয়ে আনন্দ পেতেন, পেতেন তৃপ্তি—অতি সাধারণ ব্যাপারের মতনই ছিল এসব তাঁদের কাছে। এই সমস্ত কতগুলি জন্মগত গুণাবলীর প্রভাবে এঁদের সাংসারিক জীবনযাত্রার সাধারণ পরিবেশও ছিল স্বতন্ত্র, পরবর্তী জীবনে তার পার্থক্য এতই পরিষ্কার ধরতে পারতাম, আর পদে পদে বিস্মিত হয়েছি কত যে, তা বেশ ভালো করেই মনে আছে।

মামারবাড়ির ওই অসময়ে আমাদের এতগুলিকে নিয়ে এইভাবে এসে পড়ে তাঁদের বোঝার ভার আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যে মায়ের কোথায় যেন বিঁধত। তার জন্যে সর্বদাই একটা বেদনা, একটা অস্বস্তি যে তিনি বয়ে বেড়াতেন সেটা না বললেও বোঝা যেত। একে পিতা তাঁর দেউলিয়া, তার উপর দেখছেন ভাইয়ের অবস্থাও এমন যে, তা প্রায় দুরবস্থায় এসে ঠেকেছে—এই অবস্থায় সকলের সব বোঝার গুরুভার বহন করে ভাইকে যে এমন দুস্তর মরু পার হতে হচ্ছে—এ যেন তিনি কিছুতেই ভুলতে পারতেন না, খুবই কষ্ট পেতেন। একদিন কথায় কথায় দুঃখ প্রকাশ করে ভাইকে বলেওছিলেন—'চিত্ত, আমি তোর কতই নিচ্ছি।'

শুনে, মায়ের সব বেদনা যেন নিজের অন্তরে তুলে নিয়ে, মমতায় স্বর ভরে দিয়ে, মামাবাবু মাকে বলেন—'দিদি, তোমার সঙ্গে আমার টাকার সম্বন্ধ! প্যারীবাবু কি সেই সম্বন্ধ রেখে গেছেন!'

আমাদের কেউ শাসন করলে দিদিমা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে আমরা কেউ জোরে কেঁদে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠতেন, —'তোমরা বোঝা না, ওরা অমন করে কাঁদলে আমার পাঁজরের এক একটা হাড় খসে যায়!'—দিদিমার এই দুর্বলতা আমরা বুঝতাম এবং তারই সুযোগ নিয়ে সুবিধা পেলেই বড়দের—যাঁরা আমাদের শাসন করতেন তাঁদের বকুনি খাওয়াতাম—দিদিমার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে 'বাবা গো' বলে কেঁদে ভাসিয়ে। শুনি, একাজে আমি নাকি অদ্বিতীয়া ছিলাম।

মাতামহ ভুবনমোহন দাশ কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নী ছিলেন। যথেষ্ট ধনশালী, বিত্তশালী বলা যায়। বনেদী ঘরের হলেও দাদাবাবু নিজে থাকতেন অতি সাদাসিধেভাবে। উপার্জনও যত ছিল দানও ছিল তত। যা রোজগার করতেন তার বেশির ভাগ খরচ হয়ে যেত দানে। এত নরম মানুষ ছিলেন

দাদাবাবু, হৃদয়টিও ছিল এতই দরদে ভরা যে, কেউ এসে টাকা চাইলে তিনি না দিয়ে শুধু পারতেন না তাই নয়, টাকা ধার নিয়ে গেলে তা-ও কখনও ফেরত চাইতে পারতেন না। এমনি করে অনেক অর্থ তাঁর চলে যেত।

কত লোকই তাঁর এইসব সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে টাকা বের করে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধুরাও বাদ যাননি, তাঁরাও ছাড়েননি তাঁর বন্ধুবৎসলতার, উদারতার সুবিধাটুকু নিতে। তাঁদের উপকার করতে, উন্নতির সুযোগ দিতে, দাদাবাবুকে অনেকবার তাঁদের অনেকর জন্যে জামিন হতে হয়েছে, আর সেও তাঁদেরই অনুরোধে, তাতে তিনি কখনও আপত্তি করেননি। এই সব নানা কারণে নানাভাবে, বিশেষ করে বারবার জামিন হবার জন্যে, তাঁকে এত ঋণ-জালে জড়িয়ে পড়তে হয় যে, দেউলিয়া হওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। শুনেছি এসব বন্ধুবরেরা নাকি তখন দাদাবাবুর সঙ্গ বর্জন করতে দ্বিধামাত্র বোধ করেননি।

দাদামশাইরা তিন ভাই ছিলেন। কালীমোহন বড়, দুর্গামোহন মেজ এবং ভুবনমোহন ছোট। দাদাবাবু ও তাঁর মেজভাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

দাদাবাবুর মধ্যে আভিজাত্যের এমন একটা ছাপ ছিল যা তাঁর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলত, এবং যা ফুটে উঠত তাঁর চলায় বলায় আচার ব্যবহারে। তাঁর ভাবতে গেলেই ভেসে ওঠে সজ্জনতার প্রতিমূর্তি সেই শুভ্র সুন্দর প্রশান্ত সমাহিত চেহারাটি। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত তাঁর মধ্যেকার সেই অবিচলিত ভাবটি, যেটি ছাড়া দাদাবাবুকে ভাবাই যায় না। দুঃখ শোক তিনি বড় কম পাননি। পুত্রকন্যা বিয়োগের পরম শোকেও মানুষটিকে যেমন শান্ত স্থির থাকতে দেখা গেছে, আবার জীবনের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে, যেদিন ঋণের দায়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয় সেদিনও তেমনই নির্বিকার অবিচলিত চিত্তে তার সব ফলাফল গ্রহণ করতে দেখা গেছে। শুধু জীবনের শেষ প্রান্তে, বৃদ্ধ বয়সে, যাঁর সঙ্গে জীবনের তিপ্পান্ন বছর একসঙ্গে অতিবাহিত করেছেন, সেই জীবনসঙ্গিনী যখন চলে গেলেন, তখন দেখেছিলাম রাত্রে বিছানায় উঠে বসে দাদাবাবু যেখানে আমাদের দিদিমাকে দাহ করা হয় তারই পানে একদৃষ্ট চেয়ে আছেন।

পুরুলিয়ার বাড়িতে দিদিমা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই বাড়িরই জমির একদিকের কোণে দিদিমার চিতাশয্যা রচনা করা হয়। দাদাবাবু দিদিমা যে ঘরে শুতেন সেই ঘর থেকে সেই জায়গাটি সোজা দেখতে পাওয়া যেত। আমার মামাতো বোন মোনা (অর্পণা দেবী) দিদিমা দাদাবাবুর কাছে শুতো। আমিও

কখনও কখনও শুতাম। সেই সময়ই চোখে পড়ে এই সকরুণ দৃশ্যটি—দাদাবাবুর বিছানার উপর উঠে বসে থাকা ও দিদিমার জীবন-সমাপ্তির শেষ চিহ্ন ওই চিতার দিকে অমন ভাবে তাকিয়ে থাকা! এত কষ্ট হয়েছিল দেখে। দিদিমা চলে যাবার পরে দাদাবাবু আর মাত্র সাত মাস বেঁচেছিলেন। তখনকার দিনে খাঁটি মানুষের অভাব হয়ত ছিল না, কিন্তু দাদাবাবুর মধ্যে আরও এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে যেদিক দিয়েই তাঁর পরিচয় দিতে চাই, মনে হয় হল না ঠিক, মন তৃপ্ত হয় না।

লিখতে বসে কত কথাই মনে পড়ছে। পুরুলিয়ার বাড়িতেও দেখেছি আর কলকাতার রসা রোডের বাড়িতেও দেখেছি (এখন যেটা চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন) সামনের বারান্দায় গদি-আঁটা তক্তপোষে তাকিয়া দেওয়া সাদা ধব ধবে বিছানার উপর দাদাবাবু বসে আছেন, সামনে তক্তপোষ সংলগ্ন লেখাপড়ার সব সরঞ্জাম-সুশোভিত মস্ত বড় একটি টেবিল—কখনও একমনে লিখে চলেছেন, কখনও বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নল মুখে হয় আরাম করছেন, নয়ত কিছু ভাবছেন। আর নয়ত নাতি-নাতনীদের নিয়ে কৌতুক করছেন।

আমাকে দাদাবাবু দুটি নামে ডাকতেন, একটি হচ্ছে 'ঝুনুবাঈ'—বোধহয় গান করতে পারতাম বলে, আর অন্যটি 'বম্বেমেল্'—আমি নাকি এক নিশ্বাসে কোথাও না থেমে ভীষণ তাড়াতাড়ি কথা বলতাম। পরবর্তী জীবনেও ঠাট্টা সম্পর্কিত কেউ একজন রসিকতা করে বলেছিলেন যে, আমার জন্যেই নাকি কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়! তাঁর রসিকতার ক্ষমতা উপভোগ না করে পারিনি।

আমরা নাতি-নাতনীরা দিদিমা দাদাবাবুকে নিয়ে খুব জমাতাম। বৃদ্ধ বয়সে কথা কাটাকাটি তাঁদের লেগেই থাকত। আমরা করতাম কি—একেকজন করে তাঁদের মুখের সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডি, এল্, রায় রচিত—'বুড়ো বুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত'—গানটির একটি করে চরণ গেয়ে চলে আসতাম, আবার আর একজন গিয়ে পরের চরণটি গেয়ে আসত। এমনি করে পর পর যেতাম আর আসতাম। দিদিমা দাদাবাবু রাগ ভুলে খুব উপভোগ করতেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের এই সব আমোদ আহ্লাদ। দাদাবাবু যে রাগ করতেন তা নয়, শান্ত সুরেই সব বলে যেতেন, তবে বেশ টিপ্পনী কেটে বলতেন, আর দিদিমা উঠতেন চটে। আমাদের খুব মজা লাগত।

দাদাবাবু গাইতে পারতেন চমৎকার। যেমন মিষ্টি তেমন সুরেলা কণ্ঠ ছিল আর গলার কাজও ছিল তেমন সুন্দর! মনে আছে, ভোর না হতেই চাকর

তামাক সেজে এনে গড়গড়াটি কাছে দিয়ে যেত, বিছানায় শুয়ে শুয়েই দাদাবাবু গাইতে আরম্ভ করতেন কি সুন্দর সব ভোরের রাগরাগিণী। কি যে ভালো লাগত। দাদুর গানেই বেশির ভাগ দিন আমাদের ঘুম ভাঙত, আর নয়ত জাগলেও শুয়ে অপেক্ষা করতাম দাদাবাবু গান আরম্ভ করবেন কখন সেই আশায়। তাঁর গান শুনে তবে বিছানা ছেড়ে উঠতাম। গান রচনাও তিনি করতেন, তাঁর স্বরচিত অনেক গান আমাদের শিখিয়েছিলেন। শুধু গান নয় কবিতাও তিনি লিখতেন। তাছাড়া তাঁর ইংরেজী অনেক লেখা নানা কাগজে প্রকাশিত হত দেখেছি। লেখার রীতিমত অভ্যেস ছিল, ক্ষমতাও ছিল। দু' একটি কাগজের তিনি সম্পাদকও ছিলেন।

দাদাবাবু ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, স্পষ্টকথার মানুষ। যা তিনি অন্যায় বলে বিশ্বাস করতেন তার প্রতিবাদ তিনি অকুণ্ঠে করতেন। একবার দুর্গা-মোহন দাশের জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার পি. কে. রায় লিখেছিলেন—

'The teachers of the Brahma Samaj should co-operate with the teachers of free Christianity and liberal religion in the West to unfold the secret of man's spiritual nature, to unfold the Laws of the spiritual wealth of ancient India.

দাদাবাবু তার প্রতিবাদ করেন, লিখলেন—

'You do not also ask them to co-operate with the spiritual teachers of your country, both the past and present, especially when you speak of the spiritual wealth of ancient India.……I find that whenever there is a reference to moral and spiritual education, you always advice seeking help from the West, as if the East has nothing to teach you.'—

ছোটবেলা থেকেই দেখতাম দিদিমা আমাদের খুব দিতে শেখাতেন। কোন ভালো জিনিস বা কিছু আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গরীব দুঃখী কাউকে দিয়ে আসতে বলতেন। তাদের খাওয়ানো দিদিমার একটা কাজ ছিল। খুব ভালো-বাসতেন তাদের খাওয়াতে। দিদিমার পাশে বসে আমরাও কত সময় তাদের খাওয়া দেখতাম। মনে আছে একটি অন্ধ সাঁওতাল ছেলে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত, দিদিমা নিজে গিয়ে তার সামনে বসে তার হাতটি ধরে বলে বলে দিতেন 'এইখানে ভাত', 'এটা তরকারি' ইত্যাদি, আর ছেলেটি হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে তুলে নিয়ে খেত। বড় মায়া লাগত দেখে। আর একটি অন্ধ ভিখারীর গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে এলেই আমরা তাকে গাইতে

বলতাম আর সে তার লাঠিটি ধরে ঘুরে ঘুরে বেশ নেচে নেচে এই গানটি গাইত—

'এত কি ভালো রে কালা কদমতলা,
অবলারই মন লয়ে একি তোমার খেলা, রে কালা।
তুমি ত বাজাও বাঁশী দিয়ে গাছে হেলা,
আমি দিন দুপুরে করব কত জলকে যাবার ছলা, রে কালা।
রাধা রাধা বলে বাঁশী করে কে উতলা
আরে গুরুজনার মাঝে বসে হল একি জ্বালা, রে কালা।
পাগল ব'লে গৃহকাজে করে হেলা ফেলা
ঐ রাধানামের বাঁশী শুনে মন হয়েছে ভোলা, রে কালা।'

গানটি আমরা শিখেছিলাম, খুব গাইতাম। আরেকটি গান তুলেছিলাম কলকাতার বাড়িতে একটি বৈষ্ণবীর গান শুনে, একতারা বাজিয়ে মহিলাটি গাইত—

'কে তোমায় চিনিতে পারে (হে হরি)
যে ভাবে ওই পদ পায় সেই পদ অনায়াসে যাবে ভবসিন্ধু পারে।
লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠেতে ছিলে
ত্রেতা যুগে হরি রাবণ বধিলে,
কংস ধ্বংস করি নিলে রাজ্যপুরী
'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে জগাই মাধাই তরে

যে পদেতে হল পাণ্ডবেরই জয়
সেই পদ ভাবেন ভোলা মৃত্যুঞ্জয়,
সেই পদ ঘেমে মহী গঙ্গা হয়
সেই পদ দিলে গয়াসুর শিরে।

চুরি করে ব্রজে খেতে ক্ষীর ননী
যুগল করে তোমার বাঁধতেন নন্দরানী,
আপন জোরে রাই বাঁধলেন কমলিনী
ভক্তিভাবে বাঁধা ছিলে বলির দ্বারে।'

গানটিতে যুগে যুগে ভগবানের লীলার অনেক কথাই ছোটর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এক একবার মনে হয় এমনি করে মুখে মুখে শুনেই বোধ হয় আমাদের বাংলা-দেশের নিরক্ষর মহিলারা সব রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক

অনেক কাহিনীই কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এঁদের মুখে এইসব গল্প শুনে অবাক হতে হয়, এত সুন্দর সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেন। সেই কোন্ যুগ থেকে এ জিনিস ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে চলে আসছে। কোথা থেকে, কেমন করে এসব বিখ্যাত গল্প এঁরা এমন করে জেনেছিলেন তা আমরা শুনিনি। রামায়ণ মহাভারত পড়েও অনেকে যা না জানে, এঁরা না পড়েও দেখা গেছে তাদের চেয়ে কোনও অংশে কিছু কম জানেন না। আশ্চর্য এঁদের স্মরণশক্তি। আমরা মা ওঁদের দিদিমা, মামিমা, আমাদের দিদিমা, বড়মামিমা এঁদের কাছে এই সব গল্প কত যে শুনেছি, কি ভালো যে লাগত, আর কি আগ্রহ সহকারে যে শুনতাম!

মনে আছে জটায়ুপক্ষীর ডানাকাটার জায়গাটা শুনে কি কান্নাই কেঁদে ছিলাম। অনেকবারই কেঁদে ভাসিয়েছি নানা কাহিনীর নানা জায়গা শুনতে শুনতে। অনেক জায়গা এমনই দাগ কেটে ভিতরে বসে যেত যে, কিছুতেই মন আর সেখান থেকে কোনও দিকে নড়তে চাইত না। সীতার বনবাসের কথা শুনে রামকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি কতকাল। দুষ্মন্তের উপরও দারুণ ক্রোধে বিচলিত হয়ে পড়তাম, ক্ষমার প্রশ্নই আসত না মনে। আর সাবিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সত্তাও ছুটে চলত যমের পিছনে, দেরি যেন আর সইত না। রামায়ণ-মহাভারত, সাবিত্রী-সত্যবান, শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী সব উপাখ্যানই এই রকম মুখে মুখে শুনে আমরা অনেকখানি জেনে ফেলেছিলাম পড়বার আগেই। তারপর বই আকারে যখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে আরম্ভ করি, মনে আছে সে কি সুর করে সারাদিন পড়া—

'রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি
দণ্ডকমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ মর্ত্যে নাচে মর্ত্যজন
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥'

সুরের স্বরলিপি হচ্ছে—

সা গা রা গা | গা গা গা গা | রা রা গা গা |
রা মে র জ ন ম শু নি না চে ন স

গা গা মা গা | রা গা রা সা | সা রা রা রা |
ক ল মু নি দ ণ্ড ক ম ণ্ড লু ক রি

রা রা -া -া | -া -া -া -া | গা পা ক্ষা পা |
হাতে........ .... স্ব র্গে না চে

পা পা পা পা | র্ধা পা র্ধা গা | গা গা মা গা |
দে ব্ গ ণ্ ম র্ত্যে না চে ম র্ত্য জ ন্
রা গা রা সা | সা রা রা গা | রা রা -া -া |
হ রি যে না চি ছে দ শ র থে ·
-া -া -া -া— |

এই পর্ব এখানে শেষ করে ফিরে যাওয়া যাক দিদিমার কথায়।

॥ দুই ॥

মা বলতেন তাঁরা ভাইবোনেরাও সব তাঁদের জ্যেঠতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। দিদিমা তাঁর নিজের আটটি সন্তানের সঙ্গে ভাসুর দুর্গা-মোহনের ছয়টি মাতৃহীন শিশুকে একসঙ্গে মায়ের স্নেহে প্রতিপালন করেন। এই মাতৃহারাগুলির জন্যে তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। মা হয়ে তিনি যেন ভুলতে পারতেন না ওদের মা না থাকার বেদনা। এইসব মামা-মাসিদের কাছে পরে বড় হযে শুনেছি দিদিমার কত কথা, কেমন করে কিভাবে তাঁদের মানুষ করেছিলেন। কখনও নাকি তাঁদের মনেও হয়নি যে তাদের মা নেই। সর্বদা সমান দৃষ্টির নিচে, অতি সন্তর্পণে সযতনে সবকিছু থেকে আড়াল করে, কেমন করে দিদিমা তাঁদের আগলে রাখতেন, সেইসব বলতে তাঁরা খুব ভালোবাসতেন। আমাদেরও শুনতে ভালো লাগত, খুব মন দিয়ে শুনতাম, এক জায়গায় তাঁদের সঙ্গে আমাদেরও খানিকটা মিল খুঁজে পেতাম। কেননা, তাঁদের যেমন মা ছিলেন না, আমাদেরও তেমনি বাবা ছিলেন না। ঠিক এমনি করেই দিদিমার সজাগ দৃষ্টি অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারা দিত, পাছে আমাদের এই দুর্বল স্থানে কেউ আঘাত করে। আশ্রিত, প্রতিপালিত আত্মীয়-স্বজন বহুলোককে নিয়ে ছিল দিদিমার সুবৃহৎ সংসার, তাঁর সজাগ দৃষ্টি তাদের সকলের উপরই সমভাবে নিবদ্ধ থাকত, সকলকেই এমনিভাবে অনেক কিছু থেকে আড়াল করে রাখতে দেখেছি

আজ যখন এই সব কথা ভাবি তখন এই কথাই মনে হয়, সত্যি, কি মানুষই ছিলেন এঁরা! গর্বে বুক ভরে ওঠে। দিদিমা নিজে যেমন দরকার হলে সব কিছু অকাতরে দিয়ে দিতে পারতেন, তেমন তাঁর সন্তানেরাও পারতেন। নিজের কথা না ভেবে, কি রইল না রইল সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে, অবলীলাক্রমে

দিয়ে দিতে পারার নানা দৃষ্টান্ত আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। অবশ্য এসবের মূল্যজ্ঞান হয় অনেক পরে। মামারবাড়িতে থাকার দরুন জীবনের এই দিকটাকে কাছে থেকে ভালো করে দেখবার কত সুযোগ যে পেয়েছি। তাই ভাবি, জীবনের ভালো দিকটির অনেকখানিই আমরা আমাদের এই মামাবাড়িতে দেখেছি।

দিদিমার স্নেহাদরে প্রতিপালিত সেই সব মামা-মাসিমা হচ্ছেন—

(১) সরমাসিমা, সরলা রায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পি. কে. রায়ের পত্নী।

(৩) বড়মামা, সত্যরঞ্জন দাশ, বারিস্টার এবং Empire of India Life Assurance Company'র প্রতিষ্ঠাতা।

(৩) অবুমাসিমা, লেডি অবলা বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী।

(৪) খুশিমাসিমা, শৈলবালা রায়, কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ডি, এন, রায়ের পত্নী।

(৫) সতীশমামা, সতীশরঞ্জন দাশ, (এস, আর, দাশ) অ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে ল-মেম্বার।

(৬) জ্যোতীশ মামা, জ্যোতীশরঞ্জন দাশ (জে, আর, দাশ), রেঙ্গুন হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ও পরে বিচারপতি।

আমাদের মামা-মাসিদের পরিচয়ও এই সঙ্গে দেওয়া যাক—

(১) আমাদের মাতৃদেবী তরলা দেবী, ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্তের পত্নী।

(২) মামাবাবু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

(৩) মাসিমা, অমলা দাশ (অবিবাহিতা), তখনকার দিনে বিশেষ সুপরিচিতা সুগায়িকা।

(৪) সেজমাসিমা, প্রমীলা সেন অ্যাডভোকেট শরৎচন্দ্র সেনের পত্নী।

(৫) মেজমামা, প্রফুল্লরঞ্জন দাশ, সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার পি, আর, দাশ (কিছুকাল পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি)

(৬) ন'মাসিমা, ঊর্মিলাদেবী, অনন্তনারায়ণ সেনের পত্নী (দেশসেবিকারূপে বিশেষ পরিচিতা)।

(৭) ছোটমামা, বসন্তকুমার দাশ, ব্যারিস্টার, অল্প বয়সে গত।

(৮) ছোটমাসিমা, মুরলাদেবী, বিরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

এইবার আমাদের ছোড়দিদিমা, মা ওঁদের খুড়িমার অপূর্ব স্বার্থত্যাগের কথা একটু বলি। দাশ-পরিবারের বধূ ইনি। ধনী দুহিতা ছোড়দিদিমা, দাদাবাবুর খুড়তুতো ভাই রাখালচন্দ্র দাশের সহধর্মিণী, সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচার-পতি এবং শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশের জননী, —তাঁর ভাসুর, আমাদের দাদাবাবুর ঋণের কথা শুনে নিজের সমস্ত অলঙ্কার, এমন কি অঙ্গে যা ছিল তা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন! তাই ভাবি এই সব আত্মীয়তা বা সম্বন্ধ ছিল কোন্ স্তরের! কোন্ বস্তু কোন্ সূত্র দিয়ে গাঁথা, কোন্ স্পর্শ নিহিত ছিল এইসব শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার মূলে।

সদা সন্তুষ্টচিত্তা প্রফুল্লময়ী ছোড়দিদিমাকে আমরা চিরকালই নিরাভরণাই দেখে এসেছি। হাতে থাকত দুটি শাঁখা। আমরা যে তাঁদের বাড়ি এত যাওয়া আসা করতাম আমরাও কোনও দিন কিছু শুনিনি, বা বিশেষভাবে কিছু লক্ষ্য করিনি। এতই অভ্যস্ত ছিলাম ওঁকে ওইভাবে দেখতে যে, আমাদের অন্য কিছুই মনে হত না। পরে বেশ বড় হয়ে মায়ের কাছে সব শুনতে পাই। মা ওঁরা সকলেই তাঁদের এই খুড়িমাকে ভালোও যত বাসতেন শ্রদ্ধা ভক্তিও তত করতেন। পিতৃঋণের জন্যে খুড়িমার এ হেন স্বার্থত্যাগের কথা মা মামাবাবুকে আজীবন অপরিসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে দেখেছি।

তখনকার দিনে একান্নবর্তী পরিবার ঘরে ঘরে দেখা যেত। সেইটাই ছিল সংসারধর্মের প্রচলিত ধরন ও ধারা। স্বার্থত্যাগের যে-সব দৃষ্টান্ত তখন কর্তা-গিন্নী থেকে বৌঝিদের মাঝে দেখতে পাওয়া যেত, এবং পদে পদে এই স্বার্থ-ত্যাগের যে প্রেরণা যে শিক্ষা তখন পরিবারস্থ সকলকে এক করে, একমুখী করে রাখত, এখন ঠিক সেরকম আর দেখতে পাওয়া যায় না। যুগের হাওয়া বদলে গেছে। তখনকার আদর্শ যা ছিল এখনকার আদর্শ তা নয়। দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ভিতর দিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমাদের মনের গড়ন হয়ে গেছে ভিন্ন। আমরা সব কিছুই এখন ভিন্নভাবে দেখি, ভিন্নভাবে গ্রহণ করি। সকলের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে, যার জন্যে আজকে আমাদের মধ্যে কেউ আর বড় একটা বিনা বিচারে কিছু মেনে নিতে পারে না।

একদিক দিয়ে মনের প্রসার বেড়েছে সন্দেহ নেই। এখনকার জীবন দেখা যায়, বহুলাংশে সংস্কারমুক্ত। তবে হৃদয়ের প্রসারতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়, তার সাড়া যেন এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। হয়ত বা তা চাপা পড়ে গিয়ে থাকবে যান্ত্রিক যুগের যন্ত্রের কলরোলে, কিম্বা হয়ত বিচারবুদ্ধি বিশ্লেষণের

যুগবার্তায় শুরু সে আজ। এখনকার সংসারের পরিধি অনেক ছোট, পারিবারিক জীবন শুধুমাত্র কয়েকটিকে নিয়ে। জীবনের নানা সমস্যা ও জটিলতার চাপে হয়ত বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্কীর্ণ করতে হয়েছে, কিংবা কালের গতির সাথে জীবনের গতিও আপনিই বদলে যাচ্ছে। এ যুগের মানুষ হয়ে উঠেছে অনেকটা স্বাধীনচেতা। ঘরে-বাইরে স্বাধীনভাবে থাকা ও বিচরণ করাটাই তাদের অভিপ্রেত। আগে যা ছিল সে-সব আর এখন তারা চায় না। তারা চায় নতুনকে আর নতুনত্বকে। অতীত তাদের গৌরব, তাদের পুজনীয় হলেও নতুন তাদের বরণীয়, তাদের স্বপ্ন।

বাল্যকাল থেকে মামাবাবুর দানের বিরাট দিকটি এত দেখেছি যে, টাকার মূল্য বুঝতে আমার অনেকদিন লেগেছিল। তিনিও তাঁর পিতার মতন হিসেব করে দানধ্যান করতে জানতেন না। হিসেব জিনিসটাই ওঁর মধ্যে ছিল না। খরচের বেলায় যেমন নির্বিকারচিত্ত, সঞ্চয়ের বেলায়ও তেমনি উদাসীন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ভোগী হলেও ভোগ জিনিসটা তাঁর অন্তরের গভীর স্তরের বস্তু ছিল না। মানুষটি ছিলেন নির্লিপ্ত। দেখেছি, কাপড়-জামা পরবার সময় তাঁর ভৃত্য যা তুলে দিচ্ছে তাই অম্লানবদনে পরছেন। সিল্কের গেঞ্জি চাকর সামনে তুলে ধরলে যেমন দুহাত তুলে গায়ে দিতেন, আবার শতছিদ্র গেঞ্জি ধরলেও একইভাবে দুহাত তুলে তাই পরতেন, এ আমরা বহুবার দেখেছি। একদিন ওই রকম একটি ছিদ্রভরা গেঞ্জি গায়ে দিচ্ছেন দেখে আমাদের এক মাসিমা হেসে বলে উঠলেন—'ওমা, তুমি ও কি পরছ, দাদা?'—তখন তাকিয়ে দেখেন সেটা ছিদ্রসার।

মামাবাবুর স্নেহ-ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, কোনও কিছুরই তুলনা খুঁজে পাই না। সবই তাঁর অসাধারণ। সবই ছিল অন্য জাতের। শুধু বড় দিকেই যে তিনি বড় ছিলেন তা নয়, ছোটখাটো অতি তুচ্ছ জিনিসেও তাঁর অসাধারণত্ব ছিল সমান। দিতে ভালোবাসেন, এমন আরও দেখেছি, কিন্তু মামাবাবুকে দেখতাম চাইলে শুধু যে তিনি খুশি হতেন বা পছন্দ করতেন তাই নয়, চাইতেন যে আমরা তাঁর কাছে চাই, আবদার করি, দাবি করি। তাঁর উপর আমাদেরও যে একটা অধিকার আছে, এইটে তিনি এই সবের মধ্যে দিয়ে অনুভব করতে চাইতেন এবং করতে ভালোবাসতেন। সমস্ত অন্তর দিয়ে যেভাবে সাড়া দিতেন অমন করে সাড়া দিতে আমি ত কাউকে দেখিনি। মামাবাবুর কাছে গিয়ে কিছু চাইতে মনে এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ এসব কোনও দিনই বোধ করিনি। বরং আনন্দ করে আনন্দ মনে গিয়ে বেশ অনায়াসে চেয়ে বসতাম, যেন সেটাও একটা

আনন্দেরই ব্যাপার। যখনই যা কিছু চেয়েছি তখনই সে সমস্ত ত পেয়েইছি, উপরন্তু প্রতিটি আবদার পূরণের সঙ্গে মামাবাবু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর অকৃত্রিম প্রাণভরা স্নেহ। আমার প্রত্যেকটি আবদারের উত্তর আমি এই ভাবেই পেয়েছি।

শুধু আমাদেরই নয়, যে কেউ তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছে এমনি করেই ভরে দিয়েছেন তাদেরও, তাদের আশার অতিরিক্ত দিয়ে। একবার একটি অচেনা ভদ্রলোক তাঁর কাছে কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সাহায্য চাইতে আসেন। সেই গরীব ভদ্রলোক অনেক বড় বড় গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তিদের কাছে ঘুরে ঘুরে কারও কাছে দুটি টাকা, কারও কাছে একটি, কারও কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে সবসুদ্ধ একশ' কি এই রকম কিছু টাকা কোনও রকমে জোগাড় করতে পেরেছিলেন। যখন তিনি মামাবাবুর কাছে এলেন তখন মামাবাবু প্রথম জানতে চাইলেন তাঁকে কে কি দিয়েছেন। তিনি সব বৃত্তান্ত বললেন। শুনে মামাবাবু প্রশ্ন করেন—'আর কেউ কিছু দেবে?' উত্তরে ভদ্রলোকটি বলেন—'আর কেউ কিছু দেবেন কি না বলতে পারি না। বড় অপমানিত হয়ে এক এক জায়গা থেকে ফিরতে হয়েছে।' প্রত্যুত্তরে মামাবাবু জিজ্ঞেস করে জেনে নেন তাঁর কত টাকার প্রয়োজন এবং তৎক্ষণাৎ বাকি সমস্ত টাকা দিয়ে তাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেন।

তাই বলছিলাম যে, চাওয়া জিনিসটিকে তিনি গ্রহণই করতেন সম্পূর্ণ অন্য-ভাবে। সেইজন্যে তাঁর দেওয়ার ভঙ্গীও ছিল আলাদা। এসব জিনিস যে কত সুন্দর হতে পারে তার অনেক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম মামাবাবুর অমূল্য সংস্পর্শে, সান্নিধ্যে, তাঁকে দেখে, তাঁর অফুরন্ত স্নেহের অঝোর ধারায় প্রতিনিয়ত আপ্লুত হয়ে। তাঁরই কল্যাণে জীবনের অনেকদিন পর্যন্ত এসবের উল্টো দিকটির অপ্রিয় সংবাদ কর্ণগোচর হয়নি। ক্রমে বোধগম্য হয় বিপরীত অভিজ্ঞতার ধাক্কার পর ধাক্কায়। যাক সে কথা। আরও বলি বাল্যের সে-সব মধুর দিনের কথা। কিছু কিনবার হয়ত সাধ হয়েছে, কিন্তু টাকা কোথায় পাব বা কে দেবে. মনে এসব প্রশ্নের স্থানই ছিল না। মামাবাবু আদালত থেকে ফিরে মোটর থেকে যেই নামতেন, কাছে গিয়ে আবদারের সুরে বলতাম—'মামাবাবু, আমার এত টাকা চাই।' শুনে তৎক্ষণাৎ নিজের হাতদুটি সোজা টান করে উপরের দিকে তুলে ধরে পকেট দেখিয়ে বলতেন—'নে, পকেটে যা আছে।' হাতে যা ধরে তুলে নিলাম। চেয়ে দেখতেনও না কি নিলাম, কত নিলাম। আমার বিয়ের পরেও কোনও সাধ আহ্লাদ মেটাবার জন্যে টাকার

দরকার হলে, মামাবাবুকে লিখলে, তিনি দূরে থাকলে 'তার'যোগে সে টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

একবার মনে আছে আমি তখন কাশীতে। রামকমলের খুব কীর্তন হচ্ছে। ইচ্ছে হল বাড়ির পিছন দিকের মাঠে সামিয়ানা খাটিয়ে রামকমলের কীর্তন দেব। মামাবাবুকে লিখতেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেলাম। মনের সাধ পূর্ণ করে কীর্তন দিলাম। আবার একবার বিখ্যাত উচ্চাঙ্গের কীর্তন-গাইয়ে নবদ্বীপবাসী গণেশ কীর্তনিয়া এলেন কাশীতে। এবারও মামাবাবুকে যেই লিখলাম অমনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন বেশ বেশি পরিমাণে। সেই টাকা দিয়ে তিন দিন ধরে সেই মাঠে গণেশের কীর্তন গান হল। প্রাণভরে সেই অপূর্ব কীর্তন শুনলাম। মামাবাবু নিজেও এই গণেশের কীর্তন শুনতে অসম্ভব ভালোবাসতেন। এমনি করে আমার কত সাধ যে তিনি পূর্ণ করতেন! একবার মুখফুটে শুধু চাইলেই হল। আমার বিয়ে যখন ঠিক হয়, শুনে মামাবাবু বলেছিলেন—'কি রে ঝুনু, তুইও পায়ে শিকল পরলি? আমি ভেবেছিলাম মুক্ত বিহঙ্গের মত তুই শুধু গান গেয়েই বেড়াবি, তা দেখছি তোর পায়েও বেড়ি পড়ল!' তাঁর মুখে কতবার যে শুনেছি—'আমার রোজগারের টাকায় আমার যে অধিকার সর্বসাধারণেরও সেই অধিকার।' তখন একথার তাৎপর্য বুঝিনি। আজ মনে হয়, এত বড় কথা শুধু এখনকার দিনে নয়, তখনকার দিনেও ধারণার অতীত ছিল।

একবার ভাগলপুরে মকদ্দমায় মামাবাবুকে যেতে হয়। সেখানে তাঁর একটি পুরানো বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা হয়। বন্ধুটির মলিন চেহারা দেখে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করে জেনেছিলেন বন্ধুটির কন্যার বিবাহে বাড়ি ইত্যাদি সর্বস্ব বন্ধক দিতে হয়েছে, তার উপরেও আরও কিছু দেনাও স্কন্ধে চেপেছে। শুনে মামাবাবু বন্ধুটিকে বাড়িই শুধু খালাস করে দেননি অন্য দেনা পর্যন্ত পরিশোধ করে দেন। শুনেছিলাম, সেই টাকার পরিমাণ অন্ততঃ দশ হাজারের কম নয়। আমার দিদিকেও বলেছিলেন—'তোরা চাস্ না কেন? দরকার হলেই চাইবি। তোরা না জানালে আমি জানব কেমন করে। আমি কখনও মনে করি না যে, আমাকে ভগবান যা দিচ্ছেন তা কেবল আমারই জন্যে। আমি মনে করি আমার মধ্যে দিয়ে তিনি আমার আশেপাশে সকলেরই অভাব মোচন করতে চান।'

আমার দিদির বিয়ের কিছুকাল বাদেই তার স্বামী ডাক্তার অমূল্য মিত্র আরায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অমূল্যবাবু আরায় ডাক্তারি করতেন। তাঁর অবস্থা বেশ চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে আমার আরেক ভগ্নীপতি ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'তার' পেয়ে অমূল্যবাবুকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতা

নিয়ে আসতে চলে গেলেন। মামাবাবুর বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে যাবার কথা, কিন্তু ইচ্ছেটা অমূল্যবাবুকে নিয়ে এলে তাঁর অবস্থা দেখে চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। কিন্তু তখন যুদ্ধের জন্যে গাড়ি রিজার্ভ পাওয়া মুস্কিল হচ্ছিল। মামাবাবুর পক্ষেও আর অপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হল না। তখন তিনি যাবার সময় আমাদের মায়ের হাতে একটি blank cheque সই করে দিয়ে বলে গেলেন—'যে টাকা প্রয়োজন হয় বসিয়ে নিও, অর্থের জন্যে যেন চিকিৎসার ত্রুটি না হয়।'

আমার বিয়ের পরেও, আমার গুরুতর অসুখ হয়েছে, মামাবাবু আমায় কলকাতা আনিয়ে নিয়ে খরচপত্তর করে চিকিৎসাদি করিয়েছেন দিনে রাতে নার্স রেখে দিয়ে। এমনতর দেওয়া তাঁর কতই দেখেছি। শুধু আত্মীয় স্বজনের জন্যেই নয়, যার যখন যা দরকার জানতে পেরেছেন তখনই এমন করেই তার জন্যেও করেছেন। দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর 'তুমি' 'আমি' ছিল না। অমূল্যবাবু খুব সুন্দর কীর্তন গাইতে পারতেন। মামাবাবু আরায় ডুমরাওন রাজার কোন মামলা করছিলেন। বেশ কিছুকাল সেখানে ছিলেন। রোজই সন্ধ্যাবেলা অমূল্যবাবুর কীর্তন শুনতেন। কীর্তন শুনে এতই মুগ্ধ হলেন যে অমূল্যবাবুকে হাজার টাকা দামের একটি চমৎকার বিলিতি অর্গ্যান উপহার দেন।

আমার এক বোনের ছোট্ট একটি ছেলের কথা বলি। মামাবাবুর অসম্ভব আদরের ছিল এই নাতিটি। বাড়িতে তখন সেই প্রথম শিশু আমাদের সব ভাই-বোনেদের মধ্যে। সবে তখন সে হামা দিতে শিখেছে। মনে আছে রসা রোডের বাড়ির উপরে টানা বারান্দায় মামাবাবু প্রায়ই পায়চারি করতেন। মামাবাবুকে ওইভাবে হাঁটতে দেখলেই সেও তাঁর পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে হামা টেনে বেড়াত। এটা ছিল তার রোজকার একটি খেলা। মামাবাবু যেই বারান্দার শেষপর্যন্ত গিয়ে ঘুরতেন, অমনি সেও তাড়াতাড়ি ঘুরে আবার শুরু করত। অনেক সময় মামাবাবু মজা দেখবার জন্যে মাঝপথে হঠাৎ ফিরে চলতেন, সে কি মজা পেত জানি না, দেখতাম খিল খিল করে হেসে মামাবাবুকে ধরার চেষ্টায় কি কাণ্ড করে যে হামা দিত. মামাবাবুর খুব ভালো লাগত, খুব হাসতেন ওর কাণ্ড দেখে। এই খেলা চলত যতক্ষণ না মামাবাবু তাকে কোলে তুলে নিতেন।

তারপর আর একটু বড় হতে দেখেছি, আদালতে যাবার সময় মামাবাবু রোজ নিজে খাবার সময় তাকেও খাইয়ে দিতেন, কত আবদার যে সে তাঁর কাছে করত। বেশ বুঝত মামাবাবু তার একটি মহা আবদারের জায়গা। মামাবাবুও আদর দিতে ত্রুটি করতেন না। রোজ দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন,

—'দাদু, আজ তোমার কি চাই?'—এইভাবে এক এক করে কত দামী দামী খেলনাই যে তার জমে উঠতে লাগল। রোজই প্রায় একটা না একটা কিছু সে পেত। একদিন দেখা গেল মহা ব্যস্ত হয়ে সে মামাবাবুর খোঁজ করছে, দেখা হতেই গিয়ে বললে,—'দাদু, আমার একটা জ্যান্ত ঘোড়া চাই',—শুনে মামাবাবু ত হেসেই অস্থির। বললেন,—'আচ্ছা দাদু, জ্যান্ত ঘোড়া পাবে তুমি রাঙা শুক্কুর বারে।'—শিশু কি বুঝল জানি না। মহানন্দে ফিরে চলল।

মামিমা বাসন্তী দেবীও ছিলেন সেই রকম অসামান্যা। মামাবাবুর এত দান ধ্যান, এত রকমের দেওয়া থোওয়া, এসব সম্বন্ধে মামিমার যেন আপত্তি বলে কোনও বালাই-ই ছিল না। সবেতেই তাঁর সত্তা রাজী—এমনই একটা নিশ্চিন্ত ভাব তাঁর মধ্যে দেখেছি। মামাবাবুর থেকে মামিমার কিছু যে আলাদা এ আমরা ভাবতে যেমন পারিনি জানতেও তেমন পারিনি। মামাবাবুর সব কিছুতে মামিমার নীরব সমর্থন, নীরব আত্মনিবেদন মামাবাবুর মহত্ত্বকে আরও তুলে ধরেছে, ফুটিয়ে তুলেছে। স্বামীর ইচ্ছেতে নিজেকে এমন করে ছেড়ে দিতেন যে, তাঁর আলাদা মনোভাব কখনও উঁকিও দেয়নি, ছায়াপাতও করেনি। তাই এইসব ব্যাপারে মামিমার আলাদা মনোভাবের কোনও অস্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি।

তাঁর অসাধারণত্ব সামনে এগিয়ে নিজের সাক্ষ্য দিত না, থাকত আড়ালে নিজেকে না দেখানোর মধ্যে। তাকে দেখতে চাইলে দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু না চাইলে নজরে পড়বার মতন মনে হত না। শুনতে খুব অদ্ভুত লাগে, কিন্তু কথাটি সত্য। বলছি সে-সব কথা। দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবীর কথা এখন বলছি না, বলছি আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃসমা মামিমা বাসন্তী দেবীর কথা, যখন মামাবাবু 'দেশবন্ধু' হননি, যখন মামাবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁরই উপার্জনে সংসার চলছে। আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজন বহু আশ্রিত, পোষ্য—বাড়িভরা লোক। মামিমাকে কিন্তু কর্ত্রীত্বের পদে তখন আমরা দেখিনি। শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেওর, জা, এঁদের সকলকে নিয়ে অনেক দিন ঘর করেছেন। নিজের সংসারে নিজের একটা আধিপত্য, প্রাধান্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি—এ সবে তাঁর নজর, বা কাড়াকাড়ির কোনও ভাব কখনও দেখা যায়নি। সকলের সঙ্গে তাঁদের একজন হয়েই তিনি থেকেছেন। তাঁদের ডিঙিয়ে সামনে এসে স্থান অধিকার করার দিকে তাঁর মনও ছিল না স্পৃহাও ছিল না।

শাশুড়ী যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি ছিলেন সংসারের কর্ত্রী, পরে আমাদের

অবিবাহিতা মাসিমার হাতে ছিল সংসারের ভার। তিনি সংসার ত্যাগ করে পুরুলিয়াতে অনাথ-আশ্রম করে যখন সেখানে চলে গেলেন তখন মামিমা তাঁর সংসার তুলে নিলেন, আমাদের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। মামিমার বড়মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। মামিমা যদি তেমন হতেন তাহলে মামাবাবুর কাছে অমন করে যাওয়া বা চাওয়া আমাদের কখনই এমন সহজ হত না। তাছাড়া মামিমার কাছেও আমি অজস্র আবদার করেছি। তাঁর টেবিলের উপর সাজানো কোনও জিনিস পছন্দ হলেই তুলে নিতাম। এতটুকু আপত্তি করতে বা বিরক্ত হতে দেখিনি।

একবার মনে আছে একটি সুন্দর ঘড়ি, চামড়ার কেস-এ মোড়া, নতুন বের হয়েছে, তাঁর ঘরে দেখে বললাম—'মামিমা, এটা কিন্তু আমি নেব'—ঘড়িটি তাঁর খুবই পছন্দের ছিল। দু-একবার শুধু একটু বললেন—'লক্ষ্মী আমার সোনা, ওটা নিস না। তোকে আমি আর একটা কিনে দেব।' আমি কিন্তু তাঁর কথা শুনলাম না, ঘড়িটি তুলে নিলাম,—'তুমি আর একটা কিনে নিও'—বলে। মামিমা তখন আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন,—'ঘড়িটাতে যেন রোজ চাবি দিস না। আট দিন অন্তর চাবি দিতে হয় মনে রাখিস।' সেই চোখে অসন্তুষ্টির কোনও আভাসই ছিল না। এমনই ছিলেন ওঁরা, আর এমনই ছিল ওঁদের সঙ্গে আমার প্রাণখোলা জোর-জুলুমের সম্বন্ধ।

মামিমা খুব বড়লোকের আদরের মেয়ে ছিলেন। বিয়েতে তাঁর বাবা বাড়ি সাজিয়ে কত কি দিয়েছিলেন। গয়নাগাঁটির ত কথাই নেই, জুড়ি ঘোড়াগাড়ি থেকে বসবার ঘরে পিয়ানো পর্যন্ত—কিছু আর বাকি রাখেননি। কিন্তু মামিমাকে আমরা রঙীন কাপড় পরতে বা সাজগোজ করতে, কিম্বা সে-সব গয়নাগাঁটি কখনও পরতে দেখিনি। নিজের ছোট ননদদের, আমার বড় দিদিদের, মামিমা তাঁর গয়না কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন তা জানি।

মামিমার চেহারাটি ভাবলেই চোখে ভাসে পরনে শান্তিপুরী কি ঢাকাই মিহিসুতোর সাদা শাড়ি, আর কপালে মস্ত সিন্দুরের টিপ—এত সুন্দর মানাত মামিমাকে, চেহারাটি ছিল যেমন সুন্দর তেমন ব্যক্তিত্বে ভরা। বাংলাভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সব বড় বড় লেখকদের লেখা শুধু পড়েননি, পড়ে সে-সব সম্বন্ধে মতামত দেবার মত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান মামাবাবুর চাইতে কোনও অংশে কম ছিল না। মামাবাবু অনেক সময় মামিমার মতামত জিজ্ঞেস করতেন এবং গ্রহণ করতেন। বাংলাভাষায় মামিমার জ্ঞান তাঁর নিজের চেয়ে বেশি ছিল

তিনি মনে করতেন। বৈষ্ণবসাহিত্য নিয়ে মামিমার সঙ্গে তাঁকে বহু আলোচনা করতে শুনেছি। মামিমার মতামতের খুবই মূল্য ছিল তাঁর কাছে।

আমার মামাতো বোন মোনা আর আমি একসঙ্গে একই ঘরে থাকতাম। একখাটে শুতাম। সে আমার চেয়ে দেড়বছরের ছোট হলেও আমরা সমবয়সীর মতন একইভাবে বড় হয়েছি। মামিমা তার জন্মে শাড়ি কিনলে আমার জন্মেও কিনতেন। সে যা হাতখরচ পেত আমিও তাই পেতাম। মোনার ও আমার জন্মে দিদিমা একই রকম সোনার তাবিজ গড়িয়ে রেখে গিয়েছিলেন আমাদের বিয়ের জন্মে। একই মাস্টারের কাছে দুজনে ক্লাসের পড়া পড়তাম। মোনা আমার চাইতে ইংরেজীতে অনেক ভালো ছিল, আমি ওর চাইতে অঙ্কে ভালো ছিলাম। একই ওস্তাদের কাছে গান শিখতাম। দুজনে এক ইস্কুলে একসঙ্গে যেতাম। ভালোবাসাও যত ছিল, ঝগড়াও তত হত। সে ছিল নিরীহ প্রকৃতির, তাই চোটটা তারই উপর পড়ত বেশি।

একটা মজার গল্প বলার আছে। বিয়েতে তখন প্রায়ই দেখতাম রুপোর ছাতার হাতল বিবাহোপহার পেতে। এই জিনিসটির প্রতি আমাদের একটা অবজ্ঞা-ব্যঙ্গ-মিশ্রিত মনোভাব ছিল। কেননা, জিনিসটি যে পাচ্ছে সে যে আবার অন্যের বিয়েতে টাকা বাঁচাবার জন্মে সেটি উপহার পাঠাবে তা জানা কথা। কাজেই, এইভাবেই হাত ঘুরতে ঘুরতে জিনিসটি এসে থাকে এবং অনেক হাত ঘুরে যায় এই খবরটি এতই জানা হয়ে গিয়েছিল যে, ছাতার হাতলের মূল্য কারও কাছেই আর কিছু ছিল না, এক ঠাট্টার সামগ্রী ছাড়া। যাইহোক, মোনার আর আমার মধ্যে কড়ার হল যে, যার আগে বিয়ে হবে আর সে যদি রুপোর ছাতার হাণ্ডেল উপহার পায়, তবে সেটি সে অপরকে তার বিয়েতে দেবে। আমার বিয়ে হল আগে। মোনার উপর ভার পড়ল বিয়ের উপহার সব এলে তা নেওয়া ও সাজিয়ে রাখা।

মোনা বেচারী ত শশব্যস্ত। এক একটি উপহার আসে আর সেটি সে অতি সন্তর্পণে খুলে দেখে। সন্ধ্যার সময় দেখি ভাবি উৎফুল্ল হয়ে এসে আমার কানে কানে বলছে—'ঝুনু, এখনও কিন্তু তোমার প্রেজেন্টের মধ্যে ছাতার হাতল আসেনি। দেখা যাক আরও কিছুক্ষণ!' না এলে ও যেন বাঁচে! যাক, শেষ-পর্যন্ত সত্যই কোনও রুপোর হাতল এল না, মোনাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এই নিয়ে খুব হাসাহাসি চলল, মোনাকে নিয়েই পড়ল সবাই—'কি রে, ছাতার হাতলে তোর এত ভয়?'

মোনা বলে—'না বাবা, ও জিনিসটি কেউ পেলে আমরা যা ঠাট্টা করি !'

মামাবাবুর দেখেছিলাম মাতৃভক্তি। তাঁর জীবনে মায়ের স্থান ছিল সকলের আগে। সর্বদা সবকিছুই আগে গিয়ে মাকে বলা চাই, মাকে জিজ্ঞেস করা চাই। কোনও নতুন মামলা বা জটিল ব্যাপার কিছু হলে মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে তবে তিনি সে কাজে হাত দিতেন। দিদিমার কোনও কথা তিনি ঠেলতে বা ফেলতে পারতেন না। এই মাতৃভক্তি ছিল তাঁর অনেক প্রেরণার উৎস। বোমা ষড়যন্ত্রের মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দাঁড়াবার জন্যে যখন মামাবাবু অনুরুদ্ধ হন তখন তাঁর মায়ের ঐকান্তিক আগ্রহই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে সেই মামলা গ্রহণের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গানটিতে একটি লাইন আছে—

দে গো তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার মাথার মানিক হবে—

মামাবাবুকে দেখলে মনে হত দিদিমার পায়ের ধূলা যেন তাঁর মাথার মানিকই ছিল। দিদিমাকে কোনও কথা বিশ্বাস করাতে হলে 'চিত্ত বলেছে' বললেই হত। তাহলে তাঁর আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকত না। বিনা বাক্যব্যয়ে অনায়াসে মেনে নিতেন। মামাবাবুর কথা দিদিমার কাছে ছিল বেদবাক্য। মৃত্যুশয্যায় দাদাবাবুকে কাছে ডেকে তাঁকে বলতে শুনেছি—'যদি জন্ম-জন্মান্তর থাকে, আমাকে আবার আসতে হয়, তবে তোমাকে স্বামী আর চিত্তকে ছেলে যেন পাই।'

মামাবাবুর মস্ত দুঃখ ছিল যে, দিদিমার শেষসময়ে তিনি তাঁর পাশে থাকতে পারেননি। পূজাবকাশে বিলাতভ্রমণে গিয়েছিলেন। মামাবাবুর জাহাজ যেদিন বম্বে বন্দরে এসে পৌছায় সেইদিনই পুরুলিয়াতে দিদিমার প্রাণ নশ্বরদেহমুক্ত হয়।

দিদিমা কেবলই খোঁজ করতেন 'চিত্ত এসেছে ?' শেষে তাঁর কেমন বিশ্বাস হল মামাবাবু ফিরে এসেছেন, যে কারণেই হোক আসতে পারছেন না। পুরুলিয়ার বাড়িটি আজ 'নিস্তারিনী কলেজ' নামে মেয়েদের কলেজ হয়েছে। দিদিমার নাম ছিল 'নিস্তারিনী'। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই কাজটি সুসম্পন্ন করে গিয়েছেন।

॥ তিন ॥

মানভূম জেলার এই পুরুলিয়াতে আমাদের বাল্যজীবনের অনেকদিন কেটেছে। মামিমা অসুস্থ হয়ে পড়াতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দেন কলকাতার বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাঁকে রাখতে। এইজন্যে সে সময়ে মামাবাবু পুরুলিয়ায় বিস্তর জমিযুক্ত মস্ত সুন্দর একখানা বাড়ি কেনেন। বাড়ির নাম ছিল 'Clark's Bungalow', পরে দাদাবাবু বদলে নাম দেন 'Retreat'। স্টেশন থেকে আসবার পথে বহুদূর থেকে দেখা যেত, শহর থেকে অনেক দূরে, একেবারে খোলা মাঠের মাঝখানে বেশ খানিকটা জমি সংলগ্ন পাশাপাশি দুটি বাড়ি, তারই একটি ছিল আমাদের এই বাড়ি। আর পাশেরটি ছিল সুবল সাহেব বলে এক সাহেবের বাড়ি।

পুরুলিয়াতে, আমাদের বাড়িতে কেউ আসছেন খবর এলে, সকালে ট্রেন আসার শব্দ শুনলেই আমরা ছোটরা সব গিয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়াতাম। এইখান থেকে স্টেশনের রাস্তাটি পরিষ্কার দেখা যায়। সেই রাস্তাটির শেষ সীমার দিকে একমনে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম, কখন ঠিকে গাড়ি বের হবে তার প্রথম সঙ্কেতের জন্যে। যেই না ঠিকে গাড়ির জুড়িঘোড়ার মুখ দৃশ্যপটে উদয় হত আর আমাদের সে কী উল্লাস, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতাম— 'ওই ত ঠিকে গাড়ি আসছে।' অর্থাৎ, ওই রাস্তা দিয়ে ঠিকে গাড়ি আসতে দেখা মানেই যাঁর আসার কথা তিনি আসছেন। কারণ, স্টেশনে থেকে আমাদের বাড়ি আসার ওই একটি কেবল পথ।

আমাদের বাড়িটি ছিল বড় সুন্দর জায়গায়। সামনের দিকে রাস্তাটি পার হলেই প্রথমে পড়ে খানিকটা মাঠ, তারপর—শুধু ধানের ক্ষেত আর ধানের ক্ষেত। মাঠজোড়া চলেছে ধানের ক্ষেত। পূর্ব পশ্চিম এই দুই সীমানার দিকে তার দুটি রাস্তা, একটি চলে গেছে স্টেশনে ঘুরে, অপরটি গেছে শহরের সুবৃহৎ সুন্দর হ্রদটিকে মাঝে রেখে তার চারধার ঘুরে।

এই রাস্তাটি বড় সুন্দর। একদিকে নিচে ধেনো জমি, অন্যদিকে জলভরা হ্রদ, তার মাঝে একটু উঁচুতে গাছে ঢাকা রাস্তাটি। মনে হত সারি সারি গাছগুলি লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে, আড়ালে রয়েছে যে হ্রদ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। হ্রদটিকে বলা হয়ে থাকে 'সাহেব বাঁধ'। বাঁধটি যত বড় তত গভীর, সর্বদাই কানায় কানায় জলে পূর্ণ হয়ে থাকতে দেখেছি। ভারি চমৎকার। এর মাঝে ক্ষুদ্র দুটি দ্বীপের মতন আছে। জলের মাঝখানে ছোট বড় সবুজ গাছপালায় ভরা

দ্বীপ দুটির মনোরম দৃশ্য বাঁধের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই বাঁধের জলে প্রণয়ীযুগলের ডুবে মরার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে পাওয়া যেত, স্মৃতিস্তম্ভও রয়েছে দেখেছি। তাই, বাঁধের ধারে বেড়াতে গেলে বেশ গা ছম্ ছম্ করত। একথা অবশ্য সঙ্গীদের কাছে চেপে যেতাম। ধানের ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শহরের এলাকা আরম্ভ—দেখা যেত পাকাবাড়ি সব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব ক্ষেতের আল বেয়ে আমরা কত যেতাম আসতাম। বিশেষ করে আমি ও যাকে সঙ্গে পেতাম তাকে নিয়ে প্রায়ই ভরা দুপুরে চলে যেতাম চুপি চুপি ধানের ক্ষেতে। কখনো কখনো এপাশে ওপাশে গাছের গায়ে হঠাৎ সাপ জড়িয়ে আছে দেখা যেত। আঁৎকে উঠে ভয়ে কাঁটা হয়ে পড়ি-কি-মরি করে পিছু হটে যেদিকে পারি সরে পড়ে অন্য পথ ধরতাম।

ধানের ক্ষেত ছিল আমাদের বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। সাপখোপের ভয়ের কারণ থাকলেও ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগত। কাছে কোথাও জনমনিষ্যি নেই, দূরে কৃষকদের কুটির হয়ত দু-একটা দেখা যাচ্ছে, মনের আনন্দে চলে যেতাম দূরে, আরো দূরে। নিজেরা নিজেদের কাছে দুঃসাহসিকতা প্রমাণ করে ফিরে আসতাম। সবচেয়ে ভালো লাগত ধান গাছের সবুজ শীষগুলি যখন হাওয়ার ছোঁওয়ায় দুলত, মনে হত আমাদের মনেও লাগত এসে তার দোলা। কি সুন্দর যে সারা মাঠটিকে দেখতে লাগত—পুলকে আকুল সব ধানগাছগুলি নুয়ে নুয়ে যেন কার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলেই ধানের ক্ষেত হয়ে উঠত তরঙ্গলীলায়িত। যখন যেদিকে হাওয়া বইত তখন সেদিক পানে ছুটে চলত এই সবুজের আপনহারা ঢেউগুলি। বারান্দায় বসে বসে দেখতাম, আর এক এক সময় মনে হত আমার মনও অমনি করে তরঙ্গ তুলে চলেছে ওদের অনুসরণ করে।

মনে আছে পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'—গানটি যখন প্রথম শুনি, তখন চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছিল পুরুলিয়ার সেই ধানের ক্ষেতের দৃশ্য। আর রবীন্দ্রনাথের —'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা'—এই লাইনটি আজো গাইতে গেলেই মূর্ত হয়ে ওঠে পুরুলিয়ার বাল্যস্মৃতি। মনে পড়ে সেই ধানের ক্ষেতের কথা—

আলোর সাথে ছায়ার সাথে
পূর্ণিমাতে, শুক্লা রাতে,

প্রভাতরবির কিরণ মাথায়
অস্তরবির রক্তিমাভায়,
ঝড়ের মত্ত হাওয়ার বেগে,
মেঘ বিজলীর চমক লেগে
ঝল্‌কে ওঠা আলোর ফাঁকে
দেখেছি যে কতই তাকে।
কত ভাবে দেখেছি তার
সবুজ রঙের কত বাহার
কত শোভা মনোলোভা—

বাড়িটির পিছন দিকে সোজা সামনে বরাবর তাকালে চোখে পড়ে পলাশ বন। ফুল ফুটত যখন মনে হত আকাশের নিচে সব লালে লাল হয়ে আছে—কি যে সুন্দর!

রবীন্দ্রনাথের—'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—গানটি জানা থাকলে হয়ত কণ্ঠ ছেড়ে গাইতাম। বোধকরি এ গান তখনও কবি রচনা করেননি।

পশ্চিম কোণে চোখ ফেরালে সাঁওতাল পল্লীটিকে দেখতে লাগত আঁকা ছবি একখানি। সেই দিকে এগিয়ে চলতে থাকলে চাষী জীবনের অনেকখানি চোখের সামনে এগিয়ে আসত—ফালা ফালা সব জমিতে কত রকমের ফসল ফলে আছে। মনে হত মাটির বুকে নানা রঙের মেলা বসেছে যেন। গাঁয়ের ডোবায় জলকেলিরত হংস সম্প্রদায় থেকে থেকে ডুব দিয়ে কি যেন তুলছে। ফাঁকা মাঠে এদিক ওদিক গরু চরছে, রাখালবালক লাঠি হাতে হয় তাই দেখছে নয়ত বাঁশি হাতে তাইতে মেঠো সুর ভরে তুলছে। পাশের জমিতে নতুন চাষের আয়োজন চলেছে। অদূরে অগভীর জলাশয়ে মহিষের দল সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে মাথাটি তুলে আরাম করে বসে আছে।

এইসব নানা পার্শ্বচিত্র দেখতে দেখতে অগ্রসর হতাম। বেশ লাগত। কোনো পল্লীচিত্র আগে ত দেখিনি। সাঁওতাল পল্লীতে আমরা প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। ভারি পরিষ্কার জাত এই সাঁওতালেরা। কি সুন্দর গোছালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওদের ঘর গৃহস্থালি। ঘরের ভিতর এবং দাওয়া থেকে বাইরের আঙিনা পর্যন্ত এমন নিখুঁত করে নিকিয়ে রাখা যে, ঢুকতে গেলে প্রথমেই মনে হয় চারদিক যেন ঝক্‌ঝক্‌ করছে। পলাশবন অবধি গেলে আরো কত দূর দূরান্তর দেখা যায়—মনে হতে থাকে কী দূর···কী দূর গাছ পালা সব ক্রমে শেষ সীমায় এসে থাকত শুধু একটি ক্ষীণ রেখা হয়ে। নতুন দেখতে শেখার

আনন্দে তখন মন ভরপুর—নীলাকাশ, রাঙামাটি, সবুজের প্রাচুর্যে ভরা দিক্ দিগন্তর—যা দেখছি সবেতে পাচ্ছি একটা অনাস্বাদিত আনন্দের আস্বাদ।

এই সবের মাঝে এই পুরুলিয়াতেই হয় প্রকৃতির সাথে আমাদের প্রকৃত পরিচয়, একটা যোগাযোগ। তারপর রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা তাকে এনে দেয় আমাদের একেবারে কাছের গোড়ায়। তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির ভাণ্ডার তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন আমাদের সম্মুখে।

তখনকার জীবনযাত্রায় বিলিতি রুচির খুব প্রভাব দেখা যেত। বিশেষ করে বাড়িঘরদোর সাজানোয়, খাওয়া-দাওয়ায় ও থাকার ধরন ধারণে। কাজেই, আমাদের বাড়িও তার প্রভাবমুক্ত ছিল না। আমরাও দুপুরবেলা ছোটবড় সকলেই রান্নাবাড়ির প্রকাণ্ড বারান্দায়, দিদিমার তত্ত্বাবধানে পাচক ব্রাহ্মণের তৈরী সুস্বাদু খাবার মাটিতে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম। আবার রাত্রে খাবার টেবিলে মহানন্দে বাবুর্চির রান্না বিলিতি খানা বিলিতি কায়দায় খেতাম। এই রকমের দুই ভাবের সংমিশ্রণে চলত আমাদের জীবন।

মা আর দাদাবাবু মিলে কি অদ্ভুত সুন্দর ফুলের বাগান যে করেছিলেন! বাড়ির সামনে গোলচত্বর ঘুরে খানিকটা দূরে ফটক পর্যন্ত রাস্তার চারপাশে কত রকমের, কত বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহ যে দেখা যেত, কত জাতের রংবেরং-এর গোলাপ বাগান আলো করে ফুটে থাকত। মাচা বেয়ে ওঠা লতানে গোলাপ গাছগুলিতে ফুল ফুটলে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত, বাগান থেকে চোখ ফেরানো যেত না। দেশ-দেশান্তর থেকে নানা রকমের ফুলের, সব্‌জির বীজ, নানা গাছের কলম সব আনানো হত। মরুভূমি দেশের 'পান্থপাদপ' গাছও এনে লাগানো হয়। বাড়ির চারিদিকের বারান্দা নানারকম লতায় ও ফুলের গুচ্ছে ছেয়ে থাকত। সকাল সন্ধ্যা আমাদের বাড়ি ফুলের সুগন্ধে আমোদিত হয়ে থাকত।

পুরুলিয়াতে সে-সময় প্রায়ই দেখতাম মা-মাসিমারা, মামিমা এবং মামাবাবু থাকলে মামাবাবু, এঁরা সকলে খুব স্পিরিট আনতে বসতেন। পরলোকগত কোনও আত্মাকে নামিয়ে আনা এর উদ্দেশ্য। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ তখন ওখানে ছিলেন। তিনিও প্রায়ই এসে সকলের সঙ্গে বসে যেতেন। একটি তেপায়া টেবিলের চারদিকে সব বসা হত দুটি হাতের আঙুলগুলি বেশ ছড়িয়ে বিছিয়ে নিজের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বুড়ো আঙুল লাগিয়ে, আর পাশের জনের

কড়ে আঙুলের সঙ্গে কড়ে আঙুল যুক্ত করে, হাতের পাতা আল্‌তো করে টেবিলের উপর রেখে।

যে ঘরে বসা হত সেই ঘরটি অন্ধকার করে নিয়ে, বিশেষ কোনও মৃত আত্মার উপর মনঃসংযোগ করে, নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকা হত, যতক্ষণ না কেউ অনুভব করত যে, কোনও আত্মার আবির্ভাব হয়েছে।

তখন একজন কেউ জোরে বলতেন 'যদি কেউ এসে থাক, তবে টেবিলের একটি পা তোল।'

অমনি তেপায়াটির কোনও একদিকের একটি পা আস্তে আস্তে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে আবার স্বস্থানে নেমে আসত।

কখনও বলা হত, 'যদি কেউ এসে থাক ত, দুবার পা ঠক্‌ ঠক্‌ কর।'

টেবিলের পা দুবার উঠত ও ঠক্‌ করে নামত।

একবার এই রকম বলা হয়, 'যদি কেউ এসে থাক, তবে টেবিলটা বারান্দায় নিয়ে চল।'

টেবিল চলতে আরম্ভ করল একবার এদিকের এক পা তুলে আবার ওদিকের আর এক পা তুলে, একবার এদিকে ঘুরে আর একবার ওদিকে। সেই টেবিলে হাত দিয়ে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সকলেই আস্তে আস্তে হাত তুলে নিলেন, শুধু আমার এক মাসিমা তাঁর হাতদুটি টেবিলের উপর তেমন করেই বিছিয়ে রাখলেন, তবে উঠে দাঁড়ালেন ও টেবিলের সঙ্গে আস্তে আস্তে চলতে থাকলেন। টেবিলটি এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে।

আর একবার আর একটা ঘটনা মনে আছে। বলা হয়েছিল...'যদি কেউ এসে থাক, তবে টেবিলটা নাড়াও ত দেখি।'

যাঁরা সেদিন বসেছিলেন সকলেই এমন কায়দায় টেবিলে হাত রাখলেন যে, টেবিল যাতে কিছুতেই নাড়তে না পারে। হয়ত-বা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এসব আত্মার শক্তি একবার পরীক্ষা করে দেখা। যাই হোক, দেখা গেল টেবিলটা নড়ল না বটে, কিন্তু মড় মড় শব্দে ভেঙে গেল।

পরে দেখতাম ওঁদের মধ্যে কেউ একজন একখানা সাদা কাগজের উপর একটি পেন্সিল আলগাভাবে ধরে তার মুখটি সেই কাগজে ঠেকিয়ে রেখে বসতেন। এখানেও বলা হত, 'যদি কেউ এসে থাক, তবে তোমার নাম লেখ।'

নাম লেখা হত, অনেক রকম লেখাই হত। সব সময় যে চেনা লোকের আত্মাই আসতেন তা নয়। অনেক অচেনা লোকের আত্মার আবির্ভাবও হতে

দেখা গেছে। এই রকম একটি আত্মা একবার এসে নাম করে বলে গিয়েছিল যে, আমাদের দুটি অসুস্থ পিসতুতো ভাইয়ের মধ্যে একটি বাঁচবেন ও অপরটি বাঁচবেন না। কথা ঠিকই ফলেছিল। এই সব কত আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি। আমাদের ছোটদের সেই ঘরে থাকতে দেওয়া হত না বটে, কিন্তু মনে আছে ব্যাপারটি দেখার ও জানার এতই অদম্য বাসনা তখন যে, কিছুতেই তা সম্বরণ করতে পারতাম না, এদিক ওদিক থেকে লুকিয়ে দেখতাম। পরে কলকাতার বাড়িতেও মামাবাবু মামিমা ওঁরা প্রায়ই বসতেন। সেই সময়ই একদিন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের স্পিরিট এসে মামাবাবুকে শ্রীঅরবিন্দের মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে বলেন। তখন আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয়েছে।

এইবার নিজের কীর্তির একটি মজার গল্প করা যাক। পুরুলিয়ার বাজারে যা পাওয়া যেত না, আনাজ, ফলমূল, মিষ্টান্ন সব নিয়মিত কলকাতা থেকে আসত। কমলালেবু, রসগোল্লা, সন্দেশ এই সব আমাদের ছোটদের সমান ভাগ করে দেওয়া হত। মামিমার কাছে শুনেছি, নিজের ভাগটা নিমেষে খেয়ে শেষ করে আমি নাকি মোনার কাছে গিয়ে চাইতাম—'মোনা ভাই, তোর থেকে আমাকে একটু ধার দিবি?'

মোনা আপত্তি করত না, দিত। তার অভ্যেস ছিল ধীরে সুস্থে বেশ রসিয়ে খাওয়া, কাজেই ওর ভাগটি খেয়ে ফুরোতে দেরি হত। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি চাইলেই সে আমায় দিত। শেষে একদিন কি হল জানি না, আমি গিয়ে চাইতেই বেশ অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে উঠল—'নিজেরটা খেয়ে আবার পরেরটা চাইতে এসেছে!'

আমি নাকি তখন তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম—'পর কি রে ভাই, পর কি রে ভাই, তুই কি আমার পর?'

এই ব্যাপারটি মামিমা নিজে যত উপভোগ করেছিলেন, পরকে শুনিয়ে তত উপভোগ করতেন। বহুবার তাঁর মুখে এই গল্প শুনেছি।

কয়েকবছর আগে পণ্ডিচেরীতে এসে মোনা কিছুদিন আশ্রমে আমার সঙ্গে থেকে যায়। দুজনে বলাবলি করছিলাম যে, জীবনের শেষভাগে আবার আজ দুজনে এই আশ্রমে একই ঘরে একই সঙ্গে কাটান গেল, ভাবতে অদ্ভুত লাগছে! সেই সময়েই মোনা একদিন গল্পচ্ছলে হেসে বলেছিল, 'কত কমলালেবুর কোয়াই যে তুমি আমার ধার নিয়েছিলে তা আর জীবনেও শোধ দিলে না!'

দাদাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজে একবার কি জব্দটাই হয়েছিলাম সেই কথাটা

বলা যাক। গাছে চড়তে আমি খুব ভালোবাসতাম। সুবিধা পেলেই গাছে চড়ে বসে থাকতাম। পুরুলিয়ার বাড়িতে সে-সব সুযোগের অভাব হত না। বিস্তর ফলের গাছ ছিল। একদিন একটা পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি দাদা কোথা থেকে এসে আমার ডালটিকে ধরে এমন জোরে নাড়া দিচ্ছেন যে, পড়ে যাবার মতন অবস্থা। যত বলছি—'দাদা, ওরকম কোরো না, আমি পড়ে যাব',—দাদার গ্রাহ্যই নেই। সামনেই ডালটি ধরে টেনে নামাচ্ছেন আর ছেড়ে দিচ্ছেন।

আমি সেদিন ঠিক করলাম দাদা গাছে উঠলে আমি ওই রকম করে দাদাকে জব্দ করব।

একদিন মিলে গেল সুযোগ। দাদা পেয়ারা গাছে উঠে এডাল ওডাল করে বেড়াচ্ছেন। আমি আস্তে আস্তে গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। আমার সুবিধামত একটি ডালে দাদা আসতেই আমি ডালটি ধরে খুব জোরে নাড়া দিতে গিয়ে দেখি ডাল আর নড়ে না। প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিয়ে নিচের দিকে খানিকটা নামিয়ে এনে স্প্রিং দিয়ে ছেড়ে দিতে গিয়ে দেখি আমার পা আর মাটিতে নেই, আমাকে নিয়েই ডাল উঠে পড়েছে, আমি ঝুলছি ডালটি ধ'রে। তারপর হাত ছেড়ে দিতেই পড়লাম যেখানে সেখানে পুরোনো মরচে ধরা একটা ঘোড়ার নাল পড়ে ছিল, তার দুদিকের দুটি সরু মুখ আমার পায়ের গোড়ালিতে বেশ খানিকটা করে বিঁধে গেল। খুব রক্তপাত হল। কেউ একজন এসে নালটি টেনে বার করে দিল বটে, কিন্তু হাঁটবার আর উপায় রইল না। তারপরেই জ্বরে বেঘোর অবস্থা। মাস দুএক তাই নিয়ে ভোগান্তির একশেষ। গুরুজনেরা খুব তিরস্কার করলেন—'আর দাদাকে জব্দ করতে যাবি?'—

মোনার সঙ্গে আমার ভাব যথেষ্ট থাকলেও রেষারেষিও যথেষ্ট ছিল। আমি ভাবতাম মোনার যতখানি জোর তার বাবার উপর আছে, আমারও ঠিক ততখানি জোর মামাবাবুর উপরে আছে। একটি ঘটনা বলি। তখন বেশ বড় হয়েছি। চোদ্দ-পনেরো হবে হয়ত বয়স। কলকাতায় ফিরে এসেছি, রয়েছি রসা রোডের বাড়িতে। মামাবাবুর অবস্থা ফিরেছে, খুব রোজগার। কি কারণে একদিন আমরা পার্কস্ট্রীটের 'সতরাম দাস ধল্‌মল্‌'-এর গয়নার দোকানে গিয়েছি। গিয়ে দেখি শোকেস্‌-এ সাজানো রয়েছে চমৎকার একটি নেক্‌লেস,—বড় বড় সব মুক্তা ঝুলছে—দেখে মোনা বললে—'কি সুন্দর নেক্‌লেসটি, ঝুনু দেখছ? আমি এইটে ঠিক বাবার কাছ থেকে নেব।' আমি অমনি বলে উঠলাম—'ককখনও না, আমি এটা মামাবাবুর কাছ থেকে নেবই।' উভয়ের মনোভাব এই—আচ্ছা দেখা

যাক কে নেয়। মামাবাবু তখন কবিতা লিখছেন, গান লিখছেন। ঘটনাচক্রে সে-সময় একটি গান লিখে আমায় বলেন 'তুই যদি আমার এই গানটিতে ভালো সুর দিতে পারিস তবে তোকে একটা হীরের নেকলেস দেব।' গানটি হচ্ছে—

'কেন ডাকো অমন করে
ওগো আমার প্রাণের হরি,
কেমন করে যাব বল
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি।

আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে গানটিতে সুর দিলাম এবং মামাবাবুকে গেয়ে শোনালাম। তাঁর পছন্দ হল। বললেন 'আচ্ছা, বিপিনবাবু আসুন, তাঁকে শোনাই তিনি কি বলেন।'

বিপিন পাল তখন রোজ মামারবাড়িতে আসতেন। মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা। তিনি এলে মামাবাবু গানটি তাঁর কাছে গেয়ে শোনাতে বলেন। আমি গাইলাম। গানটি তাঁরও পছন্দ হল।

তারপর দেখি আদালতে যাবার সময় মামাবাবু আমায় ডেকে বলে গেলেন বিকেলে তৈরী থাকতে, তিনি ফিরে এসে আমায় গয়নার দোকানে গিয়ে যাবেন। মামাবাবু এমনিতে আত্মভোলা মানুষ ছিলেন, কিন্তু কাউকে কোনও কথা দিলে সে-কথা তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করে রাখতেন। আমি ভাবতেই পারিনি আমাকে গয়না কিনে দেবার কথা মামাবাবু অত মনে করে রাখবেন।

যাই হোক, আমি তৈরী হয়ে রইলাম। তিনি ফিরে এসেই আমায় ডেকে পাঠালেন। নিয়ে গেলেন 'সত্‌রাম দাস ধল্‌মল্‌'-এর দোকানেই, দেখে আমার কি যে মন খুশি! মনে রয়েছে এই দোকানেই মোনার সাঙ্গ নেকলেস নিয়ে সেই কথা। দোকানে ঢুকতে প্রথমেই মামাবাবু আমায় একটি হীরের আংটি বেছে নিতে বললেন। বেশ মনে আছে আংটি পছন্দ করবার সময় মনে ভাবছি —নেকলেসের বদলে মামাবাবু কি তবে আংটি দেবেন,—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যাই হোক, আংটি পছন্দ করা হল, তিনি সেটি কিনে দিয়ে বললেন, —'এবার ঝুনুঝুনু, তুমি একটা হীরের নেকলেস পছন্দ করে নাও।'

আমি তখন একেবারে অবাক! একটা দেবেন বলে মামাবাবু দুটো জিনিস কিনে দিচ্ছেন! যাই হোক, হীরের নেকলেসের কথা তখন আর ভাবছি না। ভাবছি যেটি নিতে চাই সেটির কথা। বললাম, 'হীরের নেকলেস আমার চাই না, মামাবাবু, সেদিন এইখানে দেখেছিলাম সেটা আছে কি না জানি না। যদি থাকে তবে আমি সেইটাই নেব।' বলেই যেদিকে সেই নেকলেসটি সাজানো

ছিল, তাড়াতাড়ি সেই দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেটি ঠিক সেইখানেই সাজানো রয়েছে। মামাবাবুকে দেখিয়ে বললাম, 'এইটে আমি নেব।'

মামাবাবু বললেন, 'এইটে তোর বেশি পছন্দ ?'—আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মামাবাবু কিনে দিলেন। আংটি আঙুলে পরে আর নেক্‌লেসের মখমলের বাক্সটি হাতে নিয়ে বিজয়োল্লাসে বাড়ি ফিরে এলাম।

আসতেই, মামিমা ডাকলেন—'কই রে, দেখি কি এনেছিস ?'—আনন্দ করে নিয়ে দেখাতেই তিনি বেশ একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বললেন—'মামা দিতে গেলেন হীরের নেক্‌লেস, আর মেয়ে আমার আনন্দে মুক্তোর একটা নেক্‌লেস নিয়ে এল,—তুই কি রে !'

মামিমার কথা শুনে একটু হকচকিয়ে গেলাম, ভাবছি—তাহলে কি কিছু বোকামি করে বসলাম ! মোনাও খুব হেসে বলতে লাগল—'তুমি কি ঝুণু, বাবা হীরের নেক্‌লেস দিতে গেলেন আর তুমি নিলে না ?'—পরে সকলেই বুঝলেন এই নেক্‌লেসটি আনার মূলে নিহিত রয়েছে কোন্ অভিসন্ধি। ব্যাপারটি সব শুনে মামাবাবু খুব হাসতে লাগলেন। পরে বললেন—'মোনার কাছে ও জিতবে বলেই হোক বা যে কারণেই হোক এত বড় প্রলোভন যে ওকে টলাতে পারেনি—That is something, I appreciate it.'

শুনে ন'মাসিমা বলে উঠলেন—'এ আর এমন কি কথা, জেদের বশে অমন কাজ সবাই করতে পারে। তাছাড়া হীরে মুক্তোর মূল্যজ্ঞান ওদের এই বয়সে কি এত হয়েছে ?'—

উত্তরে মামাবাবু বললেন—'তা বলতে পারিস না। ওদের এখন যে বয়স এই বয়সে মেয়েদের গয়নার মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান হয়ে থাকে। আর তাছাড়া ও ভালো করেই জানত যে, আজ যদি ও আমার কাছে দশ হাজার টাকা দামের নেক্‌লেস চাইত ত আমি ওকে তা-ই কিনে দিতাম। কাজেই, প্রলোভন যথেষ্টই ছিল।'—কথাগুলি বেশ জোর দিয়ে বললেন।

শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কোন জিনিসকে মামাবাবু কি চোখে দেখলেন ! সত্যিই অতি সাধারণ জেদের বশে করা একটা জিনিস ওঁর মনকে কিভাবে স্পর্শ করল ! অবাক হয়ে দেখলাম। অন্যশ্রেণীর মানুষ এঁরা, গঠিতই অন্য উপাদানে। আমাকে যেখানে তুলে দিলেন তার মূলে রয়েছে তাঁর সেই অসামান্যতা। ভাবছি আর চোখ ফেটে কেবল জল আসছে।

মামাবাবুর শাসন-প্রণালীর একটি গল্প বলি। ব্যাপারটি খুব চিত্তাকর্ষক। আমার দাদা সুধাংশুমোহন, মামু সুধীরঞ্জন আর মামাতো ভাই ভোম্বল

(চিত্তরঞ্জন) এই তিনজনের ভাব ছিল অসম্ভব। সর্বদাই এই তিনজনকে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। ভোম্বল ছিল দাদাদের চাইতে অনেক ছোট। তবে সে দাদার একান্ত অনুগত ছিল। মামু দাদার চাইতে অল্পই ছোট ছিলেন। মামাবাবু এঁদের তিনজনকে 'ট্রিনিটি—পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা' —বলতেন।

দাদা-মামাদের তখন কত বয়স মনে নেই, তাঁরা বোধহয় তখনও ইস্কুলে পড়ুয়ার দলে কিংবা সবে কলেজে ঢুকেছেন। এঁদের নামে নানা অভিযোগ অনুযোগ মামাবাবুর কাছে আসত। একবার কোনও আত্মীয় এসে মামাবাবুকে বলেন যে, এরা সব চুরুট খেতে আরম্ভ করেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়, এদিক ওদিক এদের চুরুট খেতে দেখা যায়, মামাবাবু শাসন না করলে আর চলে না—ইত্যাদি।

মামাবাবু দাদাকে ডেকে পাঠালেন। দাদার কাছে শুনেছি, মামাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে দাদাদের সব হৃদ্‌কম্প উপস্থিত, কি না জানি শুনতে হয়। ভয়ে ভয়ে গিয়ে মামাবাবুর কাছে দাঁড়াতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কি রে, তোরা নাকি চুরুট ধরেছিস ?'

দাদারা স্বীকার করাতে তিনি শুধু বললেন—'খাবিই যদি তবে লুকিয়ে খাবার কি দরকার, সামনে খেলেই হয়।' দাদারা ত হতভম্ব! ভেবেছিলেন তাদের ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম একটা কিছু আছে।

যাই হোক, এর পরেই একদিন মামু সুধীরঞ্জন তাঁদের বাড়ির গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে চুরুট খাচ্ছেন। এমন সময়ে আড়চোখে চেয়ে দেখেন তাঁদেরই পাড়ার অতি-পরিচিত এবং আত্মীয়সমান এক ভদ্রলোক পিছন দিক থেকে পা টিপে টিপে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, মতলব চুরুটসুদ্ধ মামুকে হাতে-নাতে ধরা। মামু সেটা বুঝতে পেরেও বেশ নিশ্চিন্ত মনে ধোঁয়া ছেড়ে চুরুট খেয়েই চলেছেন। কেননা, মামাবাবু ওদের চুরুট খাওয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ভদ্রলোকটি ধীরে ধীরে এসে মামুর কাঁধে হাতটি দিয়ে যেই বলে-ওটা—'এইবার ?'—মামুও রহস্যের সুযোগ নিয়ে মুখটি তাঁর দিকে ফিরিয়ে গালভরা সেই চুরুটের ধোঁয়া ভদ্রলোকের মুখের উপর ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'কি' ?—ভদ্রলোক বেচারা কি রকম যেন বোকা বনে গেলেন। ব্যাপারটি তিনি বোধহয় এতটা আশা করেননি।

॥ চার ॥

মামারবাড়িতে থাকতে জীবনকে আমরা যেভাবে দেখেছিলাম, যেমন করে চিনেছিলাম, তার যে ছবি মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল, মামারবাড়ির বাইরে আর তাকে তেমন করে দেখতে পাইনি। যা দেখেছি তা দেখে বরং মন খারাপই হয়েছে বেশি। বিশেষ করে মনে আছে 'তোমার' ও 'আমার' এই দুইএর মাঝে গণ্ডী টানা ও প্রভেদ করা জিনিসটির সংস্পর্শে যখন প্রথম আসতে হল তখন কি রকম যে লাগত, সমস্ত অন্তর যেন সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইত।

কত সময়েই হতবাক হয়ে গিয়েছি দেখে যে, একই সংসারে, একসঙ্গে সকলে বাস করেও, ওরই মধ্যে একটা গণ্ডী টেনে নিয়ে ভাই ভাই যে যার সংসারটিকে পৃথক দেখছে, আর সেইটুকুকে ঘিরেই বাস করছে তাদের মন। কেমন যেন সবেতে একটা ভাগাভাগির ভাব—আমি দিচ্ছি আমারটিকে, তুমি দিচ্ছ তোমারটিকে, এই মনোবৃত্তি। এইসবে ওদের কিছুই মনে হয় না। বরং এই সবই যেন স্বাভাবিক। আর আমরা দেখে এসেছি এর একেবারে উল্টোটি। এই সব দেখতে শুধু যে অনভ্যস্ত ছিলাম তাই নয়, দেখিইনি আগে। এদিকে চোখ ফুটেছে এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই। নইলে জীবনের এই একটা দিকও যে আছে তার পরিচয় তখন পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল না, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাও ছিল না। মামারবাড়িতে মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদের কখনও কোনও বিষয়ে কোনও রকম পৃথক করা হয়নি। ধরতেই পারিনি যে, ওবাড়ি আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, অন্যের বাড়িতে এসে বাস করছি। নিজেদের বাড়ি হলে যে অধিকার, যতটা জোর নিয়ে মানুষ বাস করে, সেই অধিকার, ততটা জোর নিয়ে আমরা মামারবাড়িতে থেকেছি। এছাড়া অন্যকিছু কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি। আমাদের মামিমা বাসন্তী দেবীকেও কেউ কখনও দেখেনি, আর আমরাও দেখিনি আমাদের বঞ্চিত করে শুধু তাঁর নিজের সন্তানদের জন্যে কিছু করেছেন অথবা তাদের সঙ্গে আমাদের কোথাও তফাত করেছেন। কোনও দিক দিয়েই টের পাইনি যে, মামাতো ভাইবোনদের চেয়ে মামারবাড়িতে আমাদের দাবী, আমাদের প্রাধান্য কোনও অংশে কিছু কম। এই ছিল আমাদের মামারবাড়ি।

অতি অল্প বয়েস থেকেই আমি গান গাই। বোধকরি আমার জ্ঞান হওয়া থেকেই সে আমার সাথের সাথী। তাকে ছাড়া চলতে শিখিনি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দেখি আজও সে রয়েছে আমার পাশে।

সাত-আট বছর বয়েসেই গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে লালচাঁদ বড়ালের সব গান গলায় তুলে তাঁর ঢং ঢাং সব হুবহু অনুকরণ করে গাইতে পারতাম। মামাবাবু প্রায়ই বলতেন, 'imitation of Baral বলে তুই গ্রামোফোনে গান দে।'

তারও আগে, আমার আরো কম বয়স তখন, শুনেছি পুরুলিয়াতে মাসিমা (অমলা দাস,—তখনকার দিনে এঁর গানের খুবই নাম ছিল) আমার বড় বোনেদের ও ছোটমাসিমাকে নিয়ে প্রায়ই গান শেখাতে বসতেন। একদিন একটি খাম্বাজ সুরে টপ্পা ঢঙের হিন্দী গান দিদিদের সব শেখাচ্ছিলেন। গানটি হচ্ছে—'আয়ে আজু মেরা আয়ে নন্দলালা'।

আমি তখন পাশের ঘর থেকে দরজার পর্দাটি তুলে মুখ বার করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম। তার একটু পরে, দিদিদের গানটি শেখবার আগেই—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাকি গানটি গেয়ে মাসিমাকে শুনিয়েছিলাম। মাসিমা যে কি খুশি! গানটি ছিল তানে ভরা। ছোট বয়েসে এই গানটি যে আমায় কত জায়গায় গাইতে হয়েছে। যেখানে যেতাম সেইখানেই এই গানটি গাইতে বলত।

একবার আমরা তিনটি বোন দার্জিলিঙে মেসোমশাই ডাঃ ডি. এন. রায়ের (প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার) White Hall নামক বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে রয়েছি। বিবিমাসিমা (ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী) এবং চৌধুরী পরিবারের অনেকেই তখন জলাপাহাড়ের উপর Dingle নামক মস্ত বাড়িতে এসে রয়েছেন। তাঁদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে যেতেই বিবিমাসিমা আমাকে গাইতে বললেন। মনে আছে, এই 'আয়ে নন্দলালা' গানটি আমি গাইলাম। তারপর থেকে দেখা হলেই বিবিমাসিমা বলতেন, 'ঝুনু, তোমার সেই নন্দলালা গানটি একবার গেয়ে শোনাও না।' ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না যে, শেষদিন পর্যন্ত গানটির কথা তাঁর মনে ছিল। মৃত্যুর কদিন মাত্র আগে, ২৬।৭।৬০ তারিখে, শান্তিনিকেতন থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি আমি পাই। সেই চিঠিতেও এই গানটির কথা উল্লিখিত আছে। তিনি লিখেছেন—'সেই কতকাল আগে একটা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা পাগলী (!) মেয়েকে জানতাম, যে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে 'আয়ে নন্দলালা' গানটি গাইত—মনে আছে? তারপর বড়ঝুনু নামে কতবড় গাইয়ে হল। তখন থেকে একেবারে ডুব মারল।'—

মাসিমা তাঁর এই বোনঝিটির গান সম্বন্ধে খুব গর্বিত ছিলেন, আমি যেমন আজ আমার ভাইঝি মঞ্জু (গুপ্তা) সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করি। মনে আছে আমার ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পূরবী রাগের হিন্দী গান

শেখাচ্ছিলেন। মাসিমার সে কি আনন্দ পূরবী রাগের মত কঠিন রাগ আমি এত সহজে গলায় তুলছি দেখে।

যখন তানের পর তান দিতাম তখনও দেখেছি মাসিমার আনন্দের যেন সীমা-পরিসীমা থাকত না। তাঁর নিজের কণ্ঠে তান যে কি অপূর্ব ছিল, দানাগুলি সব যেন আলাদা হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত। আর, কী কণ্ঠই ছিল মাসিমার! কোথায় গলা চলে যেত তারা সপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত! কলকাতায় কংগ্রেসে একবার মাসিমা একা যা 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছিলেন সেরকম 'বন্দেমাতরম্' গান তারপরে এ পর্যন্ত আর কেউ গাইতে পারেন নি। তখনকার দিনে 'মাইক' ছিল না, কংগ্রেসের অতবড় প্যাণ্ডেলে শেষপর্যন্ত মাসিমার গলা পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল।

তাঁর কণ্ঠে ভক্তিরসাত্মক গান একটা শোনবার জিনিস ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দ্বৈতসঙ্গীত, তখনকার দিনে যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মুখেই শুনেছি যে, সে ভুলবার নয়। আমরাও আমাদের এক পিসতুতো ভাই-এর সঙ্গে মাসিমার দ্বৈতসঙ্গীত যা শুনেছি সেও ভুলবার নয়, সেও এক অপূর্ব ব্যাপার। গানের জায়গায় জায়গায়, 'ময়নাদা'—আমাদের সেই পিসতুতো ভাই (চারুচন্দ্র দাশ ব্যারিস্টার, সতীদেবীর পিতা এবং রুমা গুহঠাকুরতার মাতামহ) যে সুরে গাইতেন, মাসিমা তার থেকে এক সপ্তক উঁচু সুর ধরে গাইতেন, সে যে কী অদ্ভুত শুনতে লাগত। যেমন ময়নাদার অপূর্ব কণ্ঠ তেমনি মাসিমার, শুনে যেন আর আশ মিটত না। 'তমীশ্বরাণাম্ পরমং মহেশ্বরম্' এই বেদগানটি আমরা মাসিমা ও ময়নাদার মিলিতকণ্ঠে একাধিকবার শুনেছি। শুনে কখনও পুরানো হয়নি। এমনই একটা গভীর ভাবের সৃষ্টি হত, বিশেষ করে 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' এই শেষ লাইনটি যখন মাসিমা ময়নাদার সুর থেকে এক সপ্তক উঁচুতে ধরে গেয়ে শেষ করতেন, তার রেশ লেগে থাকত মনে প্রাণে ও কানে বহুক্ষণ ধরে।

গ্রামোফোনে মাসিমা বহু গান দিয়েছিলেন। ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে বোধকরি অমলা দাসই, সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে সর্বপ্রথম গ্রামোফোনে গান দেন। তখনকার দিনে পেশাদার বাঈজী ছাড়া কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে গ্রামোফোনে গান দিত না। বহুগুণে গুণান্বিতা আজীবন কুমারী আমাদের এই মাসিমা একদিকে যেমন ভক্তিমতী অপরদিকে তেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না তেজস্বিনী নারী ছিলেন। বুদ্ধিও ছিল ক্ষুরধার। মামাবাবুকে বলতে শুনেছি—'অমলা যদি ব্যারিস্টার হত তবে ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠতাম কিনা সন্দেহ।'

অল্প বয়স থেকেই নিজে উপার্জন করতেন এবং স্বোপার্জিত অর্থে নিজের অনেক খরচ নিজেই চালিয়ে নিতেন। তখনকার দিনে এতটা স্বাধীনচেতা কর্মক্ষম মহিলা কমই দেখা যেত। শেষজীবনে তিনি পুরুলিয়ার বাড়িতে অনাথ-আশ্রম করে সেইখানে তাদের সাথে জীবন অতিবাহিত করেন।

আমার ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে। আমরা বোনেরা এবং মামাতো বোন মোনা তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করি। অল্পদিনই শিখেছিলাম। মনে আছে সুরেনবাবু প্রথম যেদিন এলেন, আমার একটি গান শুনেই আমাকে গান দিলেন 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল'—রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী সুরের টপ্পা গান। আমায় কোনও দিন তিনি গলা সাধবার কথা বলেননি বা তান সাধাননি।

সুরেন ওস্তাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করবার আগে আমার গানের পুঁজি ছিল বেশির ভাগ গ্রামোফোনের রেকর্ড থেকে তোলা গান—লালচাঁদ বড়াল, বিনোদিনী দাসী, গহরজান, মাল্‌কাজান, জানকী বাঈ, পান্নাময়ীর কীর্তন,—এইসব গান, আর মাসিমার কাছে শেখা গান। আমায় বসিয়ে দেওয়া হত গাইতে আর আমি পর পর গেয়েই চলতাম। মামাবাবু বলতেন, 'ওকে একবার আরম্ভ করিয়ে দিতে পারলেই হল, ব্যস্‌, তারপর চলতে থাকবে গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতন। গ্রামোফোনে পিন্‌ বদলাবার, চাবি দেবার দরকার হয়, ওর সে-সব হাঙ্গামাও নেই!'

একসঙ্গে বসে আমি দেড়শ পর্যন্ত গান গেয়েছি না থেমে। শান্তিনিকেতনে রাত্রে মীরাদি, কবিকন্যার ঘরে কতদিন বসে গান আরম্ভ করে গাইতে গাইতে রাত কাবার করে দিতাম। গাইতে আরম্ভ করলে আর থামতে ইচ্ছে হত না। গাইতে গাইতে আরো গাইতে ইচ্ছে করত। নাওয়া খাওয়া কোনও কথাই মনে থাকত না।

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ আমাদের মামারবাড়িতে এলে, কিম্বা আমরা রাজবাড়ি গেলে, তিনি প্রায়ই আমাকে রেকর্ড থেকে তোলা, হয় লালচাঁদের গান নয়ত পান্নাময়ীর কীর্তন গাইতে বলতেন। আমার মুখে তাদের অবিকল নকল করে গাওয়ার ভঙ্গী শুনতে তিনি ভারি ভালোবাসতেন। খুব উপভোগ করতেন। বসে বসে নিজেই ফরমাশ করে যেতেন একটার পর একটা।

মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে শেষ যেবার দেখা করতে যাই সেবারের কথা। পুরানো দিনের কত কথা যে কত দরদের সঙ্গে বলতে লাগলেন। আগেকার দিনের অনেক গান সেদিন বসে বসে গাইলাম, শুনলেন। আর কতবারই বললেন,

'ছোটবেলাকার কথা তোর মনে আছে? লালচাঁদ বড়ালের কী নকলই তুই করতে পারতিস্, মনে পড়ে সে-সব কথা?' তার পরেই মাসিমার গানের কথা তুললেন ও তাঁর কণ্ঠের কী প্রশংসাই করলেন (মাসিমা তখন আর নেই)। বলেছিলেন মনে আছে, 'না শিখেই অমলা যা গাইত, শিখলে যে সে কোন বড় ওস্তাদের সমকক্ষ হতে পারত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

আমার সঙ্গে বসে বসে এই সব নানা গল্প করছিলেন। পরে বেড়াতে যাবার সময় হলে তিনি বেড়াতে বের হলেন। আমি রানীমাসিমার সঙ্গে বসে কথা বলছিলাম। একটুক্ষণ পরেই খবর এল মহারাজের অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তাঁকে নিয়ে এসে শুইয়ে দেওয়া হল। কথাবার্তা বেশ বলছিলেন, এমনিতে বাইরে থেকে দেখে খুব বেশি কিছু হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছিল না।

যাই হোক, আমার সে রাত্রে 'ধর'-এ (ইন্দোরের কাছে) রওনা হবার কথা, সেখানে আমার স্বামী 'ধর'-এর মহারাজাকে চিকিৎসা করবার জন্যে আগেই চলে গেছেন। সেখানে পৌঁছে খবরের কাগজ খুলতেই মহারাজার মৃত্যুসংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলাম! মনের মধ্যে চলতে লাগল কত কথা। নাটোরের রাজবাড়ি আমাদের আপনজনের বাড়ির মতই ছিল। ছোটবেলায় আমরা প্রায়ই রাজবাড়িতে রানীমাসিমার কাছে থাকতাম। মহারাজা আমাদের মাকে 'দিদি' বলতেন। মহারানীকে আমরা 'রানীমাসিমা' বলতাম। বিভাদি (রাজকুমারী), মনুদা (মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ) এঁরা আমাদের মামাবাবু মামিমাকে আমরা যা বলে ডাকতাম তাই বলে ডাকতেন। বিভাদি মনুদা এঁরা বলতে গেলে আমাদের মাসিমার হাতেই মানুষ। মাসিমা এঁদের খুবই স্নেহ করতেন। মাসিমার অন্তিমশয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে মনুদা গানটি গেয়েছিলেন—

'দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর (দীনে)
আমার হৃদিবৃন্দাবনে কমল আসনে মনপ্রাণসনে বিহর (হরি)
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি
অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি
হৃদয় মাঝারে সতত নিরখি তব রূপ চিরসুন্দর (হরি)।
এই কর হরি দীনদয়াময়
তোমায় আমায় যেন ছুটি নাহি রয়
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয় চিন্ময় চিরসুন্দর (হরি)।'

গানটি মাসিমার বড় প্রিয় ছিল। রসা রোডের বাড়িতে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মাসিমার জীবনদীপ নিভে যায়।

মুনুদা আমার থেকে বছরখানেকের বড় ছিলেন। আলিবাবা নাটকের আবদাল্লা আর মর্জিনার গান রাজবাড়িতে ছোটবেলায় আমরা তুজনে একসঙ্গে মজা করে নেচে কত যে গেয়েছি। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সকল রকম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব বড় বোদ্ধা ছিলেন। পাখোয়াজ বাজানোয় তাঁর খুব নাম ছিল। মুনুদাও পরে এসবে বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গানও গাইতেন, ভালো ওস্তাদ রেখে শিখেছিলেন। রাজবাড়িতে নানা সঙ্গীতের আসরে বসে অনেক ভালো গান-বাজনা শোনবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পান্নাময়ীর ঢপ্ কীর্তন রাজবাড়িতে প্রথম শুনি। পরে অবশ্য মামারবাড়িতে তার কীর্তন খুব হত। গহরজান প্রভৃতি বড় বড় বাঈজীদের গান নাটোরের রাজবাড়িতেই প্রথম শুনি।

মহারাজার সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছুকাল। তখন 'মানসী ও মর্মবাণী'র খুব নাম ছিল। তাঁর অনেক লেখা সে সময় ঐ পত্রিকায় বের হত, পড়েছি। মহারাজা চমৎকার রসিকতা করতে পারতেন। ভারি সুরসিক মানুষটি ছিলেন। একবার আমার মা কচি বাঁশের ডগা দিয়ে তরকারি রেঁধে মহারাজকে খাইয়েছিলেন। খেয়ে তিনি বললেন—'দিদি, আপনি ত সাংঘাতিক মানুষ দেখছি, আজ বাঁশ রেঁধে খাওয়ালেন, কাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে বলবেন—'চরে খাও।' মনে আছে কি রকম হাসির রোল উঠেছিল। তাঁর আর একটি রসিকতার গল্প অতুলদার (অতুলপ্রসাদ সেন) মুখে অনেকবার শুনেছি। রাজবাড়িতে সে সময় সাহিত্যের সঙ্গীতের নানা আসর প্রায়ই লেগে থাকত। একবার এইরকম একটি আসরে অতুলদা গাইছিলেন—

'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর—'

গানটি শেষ হতেই মহারাজা অতুলদাকে ডাকলেন, 'ওরে অতুল, এদিকে আয়।' অতুলদা কাছে আসতেই মুখের দিকে এমন এক ভঙ্গীতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কে র‍্যা?'

তার বলার ধরনে সবাইকার একসঙ্গের হাসিতে সেদিন ঘর নাকি মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

মহারাজা সপরিবারে একবার পুরুলিয়াতে বেড়াতে আসেন। তাঁদের জন্যে লেকের ধারে চমৎকার একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। তখন প্রথম মোটরগাড়ি উঠেছে। তাঁর সঙ্গে এল একটা নতুন মোটর। আমাদের ছেলেমানুষদের

কৌতূহলের শেষ নেই। সেই মোটরগাড়িটি যখন রীতিমত আওয়াজ করতে করতে যেত আসত, আমরা কৌতূহলমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম। প্রথম যেদিন সেই গাড়িতে চড়ে বসি ও গাড়ি চলতে শুরু করে আমাদের কী উন্মাদনা-অভিভূত অবস্থা! কিছুতেই কেউ আর ভুলতে পারছি না, চোখে মুখে উছলে উঠছে সেই ভাবের ছটা।

১৯০৫ কিম্বা ১৯০৬ সালে, বোধ হচ্ছে জানুয়ারি মাসে, ভবানীপুরে পোড়াবাজারের মাঠে প্রকাণ্ড মণ্ডপ করা হয় প্রদর্শনীর জন্যে। খুব বড় প্রদর্শনী হয় সেবার, রবীন্দ্রনাথের দুটি গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' ও 'কালমৃগয়া' মাসিমা আমাদের দিয়ে করিয়েছিলেন। আমার বড়বোনদের এবং তাদের সমবয়সীদের দিয়ে করিয়েছিলেন 'মায়ার খেলা' আর আমাদের ছোটদের দিয়ে 'কালমৃগয়া'। আমাদের এই অভিনয়ের মধ্যে সার নীলরতন সরকারের মেয়েরাও সব ছিলেন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর চতুর্থা কন্যা বুলী (মীরা, ৺সুধীর সেনের পত্নী) আমার অতি বাল্যবন্ধু। আজো তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ রয়েছে। কয়েক বছর আগেও, মাদ্রাজে এসেছিলেন কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে, সেখানে থেকে পণ্ডিচেরী এসে আমার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যান।

আমাদের এই অভিনয় দুটিতে মেয়েরাই ছেলেদের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, ছেলে মেয়ে একসঙ্গে একত্রে অভিনয় করা তখনও সমাজে চালু হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আসতেন আমাদের রিহার্সাল দেখতে। 'মায়ার খেলা'তে প্রতিমাদি (লেডী প্রতিমা মিত্র) হয়েছিলেন 'প্রমোদা'—দুটি প্রধান নায়িকার মধ্যে একটি। কী ভালো যে করেছিলেন এখনও মনে আছে। যেমন অভিনয়, তেমনি গান। অভিনয় এর আগে আমরা দেখিওনি, করিওনি। কাজেই সব জিনিষটা এত চিত্তাকর্ষক লাগত। মনে পড়ে প্রমোদার উদাসভাবে বসে গাওয়া গানটি ও তার ভাব-অভিব্যক্তির কথা—

'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম প্রাণ মন দেহ—'

প্রতিটি গানই তিনি এত সুন্দর করে অভিনয়ে ভাব পরিস্ফুট করে গেয়েছিলেন। এখনও কানে বাজে শেষের দিকের দুটি হতাশার গান:

'কেন এলিরে ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে—
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে—'

এবং

'আর কেন, আর কেন,

কেন দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ'—

বেদনায় ভরা নৈরাশ্যের চিত্র যা ফুটিয়েছিলেন, সকলের চোখই সজল হয়ে উঠেছিল। আমার সেজদি 'শান্তা'র ভূমিকায় নেমেছিলেন। 'মায়ার খেলা'তে 'প্রমোদা' ও 'শান্তা' এই দুটিই প্রধান নায়িকা। সেজদি (নলিনা ঘোষ) শান্তার নিঃস্বার্থ প্রেমের স্নিগ্ধ চিত্রটি খুব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন গানের এই লাইনগুলিতে—

'তুমি সুখ যদি নাহি পাও,

যাও সুখের সন্ধানে যাও

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে আর কিছু নাহি চাই গো।

যদি আর কারে ভালোবাসো

যদি আর ফিরে নাহি আসো

তবে তুমি যাই চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।'

তাঁর আর একটি গানও দর্শকদের মনে খুব রেখাপাত করেছিল—

'যদি কেহ নাহি লয় আমি লইব

তোমার সকল ভার আমি বহিব।

ভুলভাঙা দিবালোকে

চাহিব তোমার মুখে

প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।'—

এই নাটকের প্রধান তিনটি নায়ক অমর, কুমার ও অশোক, এরা তিনজনই প্রমোদার প্রেমমুগ্ধ। প্রমোদার সখীরা তাইতে যে বিশেষ তুষ্ট তা মনে হয় না। প্রমোদা ও শান্তা দুজনেই অমরকে ভালোবাসে। দুজনের ভালোবাসার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রমোদা অমরকে চায়, তাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ। শান্তা অমরের সুখ চায়, সে যাতে সুখী হয় সেইটেই শান্তার কাম্য। নিজের সুখ তার কাছে বড় নয়। অমর, কুমার, অশোক, এদের কোনও কোনও উক্তির উত্তরে প্রমোদার সখীদের মুখনাড়া, ব্যঙ্গ করে গাওয়া গানগুলি অদ্ভুত জমেছিল। দু-একটি তুলে দিচ্ছি। ছবিগুলি যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে, এত স্পষ্ট মনে আছে এখনও।

এক জায়গায় কুমার বলছে, অর্থাৎ গাইছে—সখি সাধ করে যাহা দিবে

তাই লইবে—

সখীরা ব্যঙ্গভরে উত্তরে বলছে—আহা মরি মরি ! সাধের ভিখারী, তুমি
মনে মনে চাহ প্রাণ মন—
আর এক জায়গায় অশোক—মন দাও, দাও, দাও সখি দাও পরের হাতে—
প্রমোদা ও সখীরা ঘাড় নেড়ে দৃঢ়তার সুরে—না, না, না, মোরা ভুলিনে
এ ছলনাতে সখা, ভুলিনে
এ ছলনাতে—
অমর—সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে সে কি ফিরাতে পারে সখী—
সখিগণ বিরক্তি সহকারে—তুমি কে গো, সখি রে কেন জানাও বাসনা—
কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালো বাস না—

এই দৃশ্যগুলিতে, কোনটিতে ব্যঙ্গ, কোনটিতে দৃপ্ত তেজ, কোনটিতে বিরক্তি—সব নানা ভাবভঙ্গীর অভিনয়দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সুর-যোজনার অসাধারণ নৈপুণ্যের নিদর্শন এই 'মায়ার খেলা'। কত বড় শিল্পীই যে ছিলেন ! একটি জায়গায় দেখতে পাই, প্রমোদা ও সখীরা একই গানের একই লাইন পর পর দুই সুরে গেয়ে দুই রকম মনোভাব ব্যক্ত করে একই সঙ্গে দুটি বিভিন্ন রস পরিবেশন করে চলেছে ! গানটি হচ্ছে—

সুখে আছি সুখে আছি সখা আপন মনে,
কিছু চেও না, দূরে যেও না, শুধু চেয়ে থাকো
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি—

প্রমোদা গাইছে নিজের ভাবে বিভোর হয়ে, আনন্দিত কোমল সুরে স্নিগ্ধ মাধুর্য-রসসিঞ্চিত করে, ভাবে ও ভঙ্গীতে ফুটে উঠছে তারই প্রকাশ, তারই ব্যঞ্জনা। পরক্ষণে সখীরা সেই লাইনটিই গাইছে কঠিন হয়ে, ঝাঁঝালো সুরে, যেন কোথায় কি একটা আপত্তির আছে, ঠিক মনে ধরছে না—তাদের ভাব ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে একটা বিশেষ ঝাঁজ, একটা বিশেষ অপছন্দের ভাব। সত্যই এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি কবির। একই কথায়, একই লাইনে ভিন্ন সুরে পর পর দুটি বিভিন্ন মনোভাব, ভিন্ন রস কী অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠছে দেখবার বিষয়। তাঁর সুর দেবার এদিকটা যেন নতুন করে চোখে পড়ল, নতুন করে উপলব্ধি করলাম তার মূল্য।

'কালমৃগয়া'তে মাসিমা অমাকে অন্ধমুনিপুত্র ঋষিকুমারের ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন আট বছরও হয়নি। ঋষিকুমারের খেলার সাথী 'লীলা'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিল টুলী (শান্তা সেন, ভূপতি সেনের পত্নী, সার

নীলরতনে তৃতীয়া কন্যা)। তখন তারও বয়স বোধকরি নয়-এর বেশি নয়। সকলেই আমরা প্রথম অভিনয় করছি। ভারি সুন্দর করেছিল টুনী। একটি দৃশ্যে কোঁচড়ে একগোছা ফুল নিয়ে গাইতে গাইতে তার দ্রুত প্রবেশ—

'ও ভাই দেখে যা কত ফুল তুলেছি'—

এত স্বাভাবিক হয়েছিল। আর একটি জায়গায়, খেলার সাথী ঋষিকুমারকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে এসে ঋষিকুমারের পিতা অন্ধমুনিকে জিজ্ঞেস করা—

'বল বল পিতা কোথা সে গিয়েছে
কোথা সে ভাইটি মম কোন্ কাননে'—

সকলের মনে বেশ একটা ছাপ রেখে গিয়েছিল। দশরথরাজা হয়েছিল টুনী—শান্তিলতা (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা, সুকুমার রায়ের সহোদরা), খুব মানিয়েছিল তাকে। 'কালমৃগয়া'তে যারা ভালো অভিনয় করেছিল টুনী তাদের মধ্যে একজন। তবে এক জায়গায় একটি মজার ব্যাপার বলার আছে। দশরথরাজা শিকার করতে গিয়ে মৃগশিশু ভ্রমে অন্ধমুনির পুত্র ঋষিকুমারকে বাণবিদ্ধ করেন। সেইখানে মৃত্যুর পূর্বে সে অনুরোধ করে যায় তার দেহ যেন তার পিতার কাছে নিয়ে দেওয়া হয়। দেহটি কোলে নিয়ে এসে অন্ধমুনির পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে দিয়ে দশরথরাজার হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে গান আছে—

'অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা
তাত, ধরি চরণে কেমনে কহিব শিহরি আতঙ্কে'—

এইখানে আমাদের দশরথরাজা করেছেন কি মৃতদেহটি পায়ের কাছে নামিয়ে রাখবার সময় মাটি পর্যন্ত নামাবার আগেই দেহটিকে রাখতে গিয়ে একটু উঁচু থেকেই ছেড়ে দেন। আমি পড়লাম ধপ্ করে। ঋষিকুমার ত মরে গেছে, কিন্তু আমি যে জলজ্যান্ত বেঁচে, রীতিমত লেগেছিল। টুনী তখনি বুঝতে পেরেছিল সে একটা কাণ্ড করেছে। মঞ্চ থেকে বাইরে আসতেই ছুটে আমার কাছে এসে বেচারী ভীষণ অপ্রস্তুত মুখে জিজ্ঞেস করে—'ঝুনু, তোমার নিশ্চয় খুব লেগেছে?'

এইখানে যিনি অন্ধমুনি সেজেছিলেন তাঁর কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁর ভালোনামটি মনে নেই, ডাকতাম 'লটিদি' বলে। পার্বতীমোহন দাশের কন্যা ছিলেন 'লটিদি'। দশরথরাজার মুখে ঋষিকুমারের মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র নিমেষে বেগে দাঁড়িয়ে উঠে জোরের সঙ্গে বলা—'কি বলিলি, কি শুনিলাম, একি কভু হয়'—অদ্ভুত মর্মস্পর্শী হয়েছিল।

এই সূত্রে এই অভিনয়ে আমার একটি উপস্থিত বুদ্ধির কথা বলাই যাক। একটি দৃশ্যে আছে অন্ধমুনি পিপাসায় কাতর হয়ে পুত্রকে জল এনে দিতে বললেন। আবার পরক্ষণেই মেঘের গর্জন ও তার সঙ্গে বিজলী চমকাচ্ছে শুনে ভীত হয়ে তাকে নিরস্ত করছেন। ঋষিকুমার পিতাকে বুঝিয়ে বলছেন—

'আমা তরে অকারণে ওগো পিতা ভেব না,
অদূরে সরযূ বহে দূরে যাব না'—

কথা ছিল গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়ে যাবে। গানটি শেষ হয়ে এল, আমি দেখছি পর্দা পড়ছে না। বুঝলাম একটা কিছু হয়েছে। ভিতর থেকে পর্দার দড়ি টানাটানির চেষ্টার একটা শব্দ একটু একটু ভেসে আসছে কানে। আমি গানটি পুনর্বার গাইলাম, তখনও দেখছি পর্দা পড়ার বিশেষ লক্ষণ নেই। তখন অন্ধমুনিকে ধীরে ধীরে তুলে তাঁর হাত ধরে নিয়ে গাইতে গাইতে মঞ্চের এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম। কেউ কিছু ধরতে পারল না ব্যাপারটি। আসতেই মাসিমার কি আদর! উদ্ভাসিত মুখে বার বারই বলতে লাগলেন, 'তুই আজ আমার মান রাখলি এতগুলি লোকের সামনে।'

আমার ওইটুকু বয়সের এই উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে সগৌরবে তাঁকে জনে জনের কাছে এই গল্প করতে শুনেছি কতবার যে!

অন্তিম সময়ে দশরথরাজাকে ঋষিকুমার বলছে—

'কি দোষ করেছি তোমার কেন গো হানিল বাণ
একই বাণে ধরিলে যে দুটি অভাগার প্রাণ।
জন্মান্ধ জনক মম তৃষ্ণায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও, এ দেহ তাঁর কোলে দিও
দেখো দেখো ভুলনাকো কোর তাঁর বারি দান
মার্জনা করিবেন পিতা তাঁর যে দয়ার প্রাণ।'

এই গানটি মঞ্চে শায়িত অবস্থায় অতি ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে বার বার থেমে, হাঁপ ধরে যাচ্ছে তবু কষ্ট করে কথাগুলি বলতে চাইছে—এইভাবে ঋষি-কুমার গানটি যখন গাইছে, চারিদিক থেকে কানে ভেসে আসছে হাপুস নয়নে কান্নার নানা রকম আওয়াজ! কি কান্নার ধুম!

এই অভিনয় দেখতে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। অভিনয়ের পরে অনেকেই আমাকে দেখতে চান। মাসিমা ওই বেশেই আমায় নিয়ে বসে সকলকে দেখিয়েছিলেন। মহীশূরের মহারানীর কথা বিশেষ করে মনে আছে।

কেননা, তাঁর কাছে মাসিমা আমায় নিয়ে যেতেই তিনি খুব আদর করেছিলেন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে। অভিনয়ের দিন সকাল থেকেই আমার খুব জ্বর। সকলেই বিশেষ ভাবিত। মনে আছে ঋষিকুমারের বেশে সাজিয়ে দিয়ে সাজঘরে আমায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল এবং ডাক্তার বার বার এসে দেখে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিনয়ের সময় কিন্তু অসুখের কোনও কথাই আর আমার মনে ছিল না।

যাই হোক, মাসিমার শিক্ষায় দুটি অভিনয়ই বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

আমার মেজমামিমা (পি. আর. দাশের পত্নী) এবং মেজমাসিমা ও মেসো-মশায়ের সঙ্গে একবার দার্জিলিঙে গিয়ে চার নম্বর 'ম্যালভিলা' বাড়িতে ছিলাম। আমাদের বাড়ির একটু উপরে ছিল তিন নম্বরের বাড়ি, সেখানে আমার ছোটপিসিমারা এসে ছিলেন। আর তারও উপরে ছিল দু নম্বরের বাড়ি, সেই বাড়ির উপর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে 'ম্যাল'-এ যাবার। সেই রাস্তার উপর হচ্ছে 'স্টেপ্ এসাইড' বাড়ি। বাড়িটি দোতলা। এই বাড়িতে এসে তখন রয়েছেন ভাওয়ালের মধ্যমকুমার সস্ত্রীক। আমরা যখন বেড়াতে যেতাম আসতাম, প্রায়ই দেখতাম উপরের বারান্দায় ভাওয়ালের কুমারকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে রাস্তার দিকে একটু ঝুঁকে। ফর্সা রং, চেহারা ভালো, চুল চোখ ছিল কটা মতন। হঠাৎ একদিন শুনলাম কুমার মারা গেছেন। আমার ছোটপিসে-মশায় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যকে একবার তারা ডাকতে এসেছিল এবং তিনি গিয়ে দেখে এসেছিলেন। মনে আছে, সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা মৃতদেহ নিচে নামিয়ে এনে বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এই ভাওয়ালের মধ্যম কুমারের মৃত্যু ব্যাপার নিয়ে যে এত বড় মামলা হবে, এত কাণ্ড হবে, তা তখন কে-ই বা জেনেছিল।

আমরা দার্জিলিং থাকতেই সেবার পি. এন. বোসের ছেলেমেয়েরা—রাজা বোস, মধু বোস, উমা বোস (জ্ঞানাঙ্কুর দে'র পত্নী ও মঞ্জু দে'র জননী), চিনিমা বোস (অমূল্য বোসের স্ত্রী ও দিলীপ বোসের জননী) মিলে 'ধ্রুব চরিত্র' অভিনয় করেন। আমাকে ধ্রুবর সাথীর ছোট্ট একটা ভূমিকা দেওয়া হয়।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য 'ধ্রুব চরিত্র' রিহার্সাল দিতে গিয়ে তার সবটাই আমার শেখা হয়ে যায়। কলকাতা ফিরে গিয়েই ঝোঁক হল, মা, মামাবাবু ওঁদের ধ্রুবচরিত্র অভিনয় করে দেখাতে হবে। মামাবাবু বরাবরই এসব জিনিসে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। দোতলার বারান্দায় একটুখানি জায়গা চারিদিকে সাধারণ কাপড় দিয়ে পর্দা টাঙিয়ে ঘিরে নিয়ে আমি একাই সকলের ভূমিকা অভিনয় করে 'ধ্রুবচরিত্র' মামাবাবুদের দেখলাম। মা, মামাবাবু, মামিমা, মাসিমারা, পিসিমা, আত্মীয়-স্বজন যাঁরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ডেকে এনে সামনে বসিয়ে দেওয়া গেল। এই অভিনয় করে আমি পুরস্কার পাই। মামাবাবু কিনে দিয়েছিলেন ভালো একটি অর্গ্যান, মামিমা গড়িয়ে দিলেন আটগাছা সোনার চুড়ি, আর পিসিমা দিয়েছিলেন গলার সোনার হার।

আমাদের আর একটা অভিনয়ের মজার গল্প বলি। তখন বেশ বড় হয়েছি, 'লরেটো কনভেন্ট'এ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছি। কলকাতা রসা রোডের বাড়িতে রয়েছি। স্থির হল আমাদের বন্ধুরা ও দাদাদের বন্ধুরা আলাদা করে দুটি অভিনয় করে মামাবাবুকে দেখাবে। যাদেরটা ভালো হবে তাদের মামাবাবু পুরস্কার দেবেন। দু'দলের মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব। দাদারা বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী', আর আমরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। আমাদের সুবিধা ছিল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে সবই মেয়ে, ছেলের পার্ট নেই। দাদা নিজে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বোধহয় সামনে পরীক্ষা কি ওই রকম কিছু ছিল। 'মালিনী'তে সুধীরঞ্জনমামু 'সুপ্রিয়'র ভূমিকায় নেমেছিলেন। মামাতো ভাই ভোম্বলেরও ছোট মতন একটা কি অংশ ছিল। আমাদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে আমার বন্ধু বুবু (শশিভূষণ মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা, সুধীরঞ্জনের পত্নী) হয়েছিলেন 'ক্ষীরো', মোনা হয়েছিল 'রানী কল্যাণী', সার নীলরতনের কনিষ্ঠা কন্যা টুনী (অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী) হয়েছিল 'লক্ষ্মী', মামাতো ছোটবোন বেবী হয়েছিল 'মোতি' আর আমি 'মালতী'।

দাদা রোজ এসে আমাদের রিহার্সাল দেখে যেতেন। তারপর দেখলাম, প্রায়ই বলতে শুরু করেছেন—'আমার বন্ধুরা যা অভিনয় করেছে, তোরা তাদের কাছে কিছুই না।' ক্রমাগত এইরকম শুনতে শুনতে আমরা কিরকম দমে গেলাম। ভাবনা হল সত্যিই যদি না পারি, কি লজ্জা, তার থেকে কেলেঙ্কারি করে দরকার নেই, মামাবাবুকে বলে কয়ে পুরস্কার দেওয়াটা না হয় বন্ধ করে দেওয়া যাক। মামাবাবু শুধু মত প্রকাশ করবেন কাদেরটা বেশি ভালো হয়েছে, তাহলেই হবে। শেষপর্যন্ত মামাবাবুকে গিয়ে বললামও তাই।

যাই হোক, দেখা গেল বেশভূষা সবই আমাদের অপরির্যাপ্ত, সকলেই যে যার বাড়ি থেকে সুন্দর সুন্দর গয়নাপত্র, পোশাকপরিচ্ছদ সব আনছে। কাজেই, সবই যেমন চাইছি সে রকমই পাচ্ছি। আমাদের যা লাগবে না, সেই সব দাদাদের দিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা আবার ভাড়াকরা সাজ-পোশাকও এনেছিলেন। মামাবাড়ির নিচে মস্ত খাবারঘরে মঞ্চ ইত্যাদি করা হল। ঠিক হল আগে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' হবে, পরে 'মালিনী'। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সব এলে শুরু হল আমাদের অভিনয়। আমাদের রূপসজ্জা সব এত সুন্দর হয়েছিল, যেমন দেখাচ্ছিল রানী কল্যাণীকে, তেমন দেখাচ্ছিল লক্ষ্মীকে এবং রানীবেশে ক্ষীরোকে। অভিনয়ও প্রত্যেকে এতই ভালো করল যে, মামাবাবুরা সকলেই মহাখুশী 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' দেখে। আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমাদের অত ভালো হয়েছে দেখে। তবু দম আটকে বসে রইলাম দাদার বন্ধুদেরটা কেমন হয় তাই দেখবার জন্যে।

শুরু হল দাদাদের 'মালিনী'। পর্দা ওঠার সঙ্গেই প্রথমে প্রবেশ করলেন যে সন্ন্যাসী—'ত্যাগ কর, বৎসে ত্যাগ কর সুখ আশা, দূর কর বিষয় পিপাসা, ছিন্ন কর সংসার-বন্ধন'—বলতে বলতে যেই অগ্রসর হয়ে আসছেন তাঁর গৈরিক বসনের নিচ থেকে ঝল্‌মলিয়ে উঠল জরির পোশাক, তাই দেখে প্রথমে খুব হাসাহাসি হল। মামাতো ভাই ভোম্বলের জন্যে এমন মাপের পোশাক ভাড়া করে আনা হয়েছিল যে, সে পোশাক তার আঁট হওয়ায় সে সামনে ফিরে অভিনয় করতে না পেরে পিছন ফিরে কোনও রকমে দু'কথা বলে সরে পড়ল! হাসাহাসি আরও চরমে উঠল। যাই হোক, 'সুপ্রিয়' এবং 'ক্ষেমঙ্কর' এদের দুজনের অভিনয় সত্যিই খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি, সবসুদ্ধ জিনিসটা একেবারে দাঁড়ায়নি। আমাদের জয়-জয়কার। মামাবাবু বললেন, 'তোরা এত বোকা কেন রে? পুরস্কার ছেড়ে দিতে গেলি কি জন্যে? না হয় তোরা না-ই পেতিস?'

কি আর বলব, এত মন খারাপ হয়ে গেল! দাদাই ত ওই রকম করে বলে বলে আমাদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দাদাকে দেখতে পেয়েই ধরলাম, এবং যেই বললাম, 'এই বুঝি তোমার বন্ধুদের ভালো অভিনয় করা, দাদা?' অম্লানবদনে দাদা বললেন. 'তোদের ধাপ্পা দিতেই তো ওই সব বলতাম, যাতে তোরা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেরাই মামাবাবুকে বলে পুরস্কারের ব্যাপারটা অন্তত বন্ধ করিস।' শুনে অবাক! খুব রাগ হয়েছিল দাদার উপর।

আমরা ভাইবোনেরা সকলেই গাইতে পারতাম। বিশেষ করে আমার

সেজদির (নলিনা ঘোষের) গলা ছিল পাখীর মত, এত মিষ্টি। কণ্ঠে যেন মধু ঝরত। তানও সুন্দর পরিষ্কার ছিল। তবে গান গাওয়াতে হলে সেজদিকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে সাধতে হত। রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি বেছে বেছে সেজদিকে গাইতে অনুরোধ করা হত—

'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'
'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে—'
'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'
'মোরে বারে বারে ফিরালে।'

গানগুলি যেন সব তার কণ্ঠের জন্যেই তৈরী। দাদা হাসির গানই বেশি গাইতেন। কথাবার্তা সবেতেই দাদার এমন একটা ধরন আছে যে, কিছুতেই হাসি চেপে রাখা যায় না। না হাসিয়ে দাদা কথাই বলতে পারেন না। রসিকতা ঠাট্টা হাসি তামাশা দাদার কথায় কথায়, আর তারও বেশ একটি নিজস্ব ঢং, একটি ভঙ্গী আছে। দাদা কিছু বলার আগেই হাসি পেয়ে যায়, পরে ত কথাই নেই। এ সমস্ত ছাড়া দাদাকে ভাবাই যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—

'প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম বাহা বাহারে
কি রকম যে হয়ে গেলাম বলব তাহা কাহারে?'

'তোমারি তুলনা তুমি কাঁদ অকস্মার ধাড়ি
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি!'

এবং রজনী সেনের 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত পানতুয়া শত শত'—এই গানগুলি দাদা খুব জমিয়ে গাইতেন। 'যদি কুমড়োর মত' গানটির এক জায়গায় কোথায় যেন আঁখর আছে—'নেমে যে যেতাম, গামছা পরে নেমে যে যেতাম'—এমন ভাব আর ভঙ্গী করে গাইতেন যে, হেসে প্রায় সব গড়িয়ে পড়ত। মামাতো ভাই ভোম্বল গলা ছেড়ে, গা ছেড়ে দিয়ে সুরে বেসুরে গেয়ে চলত দ্বিজেন্দ্রলালের —'সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি'—গলার সুর যেন টলতে টলতে চলত, কোথায় কখন টলে পড়ে তার ঠিক নেই। বিশেষ করে 'মালাটি গেঁথেছি', এই 'গেঁথেছি'র জায়গায় সুরটি কড়িমধ্যম ছুঁয়ে পঞ্চমে না লেগে পঞ্চম ছাড়িয়ে চলে গিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়াত যে, সেটা সুরের পর্যায়েই আর থাকত না। হেসে মরে যাবার মতন অবস্থা হত। শুনেছি, মামাবাবু

গাইতে গেলেই মা মাসিমা নাকি তাঁকে থামিয়ে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনেছি—'দিদি আর অমলার জন্যে আমার গান হল না, আমি গাইতে গেলেই ওরা আমায় কেবল থামিয়ে দিত।'

মোনার মুখে মামাবাবু গোবিন্দদাসের 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়'—এই গানটি শুনতে খুব ভালোবোসতেন। প্রায়ই তাকে এ গানটি গাইতে বলতেন। এই সময় থেকেই বোধকরি মামাবাবুর জীবনে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এই সময় মনে আছে রসা রোডের বাড়িতে খুব কীর্তন হত। বহু কীর্তনিয়ার কীর্তন সেই সময় শুনেছি। পান্নাময়ীর কীর্তন খুব ভালো লাগত।

তারপরে, দাদাবাবু মারা যাবার পরে, নবদ্বীপের বিখ্যাত কীর্তনীয়া গণেশ দাসের কীর্তন দিয়েছিলেন মামাবাবু পনেরো দিন ধরে। অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল গণেশের সেই প্রাণমাতানো গানে। এই সময় বুঝতে পারি গণেশ দাসের কীর্তন কত উচ্চাঙ্গের। কী কণ্ঠ, আর কি ভক্তির সঙ্গেই গাইতেন। অমন আর শুনিনি। কীর্তনের প্রায় সব পালাই সে-সময়ে তাঁর মুখে আমাদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সত্যিই কত বড় সৌভাগ্য যে, সেই কথাই ভাবি। তার মধ্যে 'দান', 'চিত্রপটে মিলন', 'নৌকাবিহার', 'কুঞ্জভঙ্গ', 'গোষ্ঠবিহার' এই সব পালাগুলি শুনে আমরা একেবারে মুগ্ধ। তাঁর মুখেই এই পালাগুলি নতুন শুনি। তার আগে 'মাথুর', 'মান' এই সবই শুনেছি একাধিক-বার। তখন আমরা প্রায় কীর্তনে পাগল, মেতে আছি এমন যে, একবার শুনে মনে হচ্ছে আবার কখন গিয়ে শুনব—সে এক অবস্থা! অপূর্ব যে জিনিস। কীর্তন যে কোথায় উঠতে পারে তা হয়ত বুঝতে পারতাম না গণেশের কীর্তন না শুনলে। তাছাড়া, কীর্তনের সুর-সম্পদ সম্বন্ধেও এ ধারণা হত না। আঁখর দেবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। এমন আঁখরও আর শুনলাম না। সে জিনিস না শুনলে বোঝা যায় না, বোঝানো যায় না। পরে আরো কতজনের কত কীর্তনই ত শুনেছি, এমন মনও ভরেনি, এমন রসও আর পাইনি। সুর, লয়, ভাব, রস - সবেরই অতলে এমন তলিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা আমার আর কারো কীর্তন শুনে হয় নি।

মামাবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে ভোম্বল (চিররঞ্জন) পালাকীর্তনের ব্যবস্থা করেছিল। তিন জায়গায় তিনটি বড় বড় সামিয়ানার তলে একমাস ধরে চলেছিল কীর্তন গান। সে সময়ও গণেশ দাস এসেছিলেন। আমরা তাঁর কীর্তনের আসরে গিয়েই বসতাম। মামাবাবুর মৃত্যুর পরে মোনা কীর্তন গানে নিজেকে উৎসর্গ

করে পালাকীর্তনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। বহু বৃহৎ সভায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে পদাবলী কীর্তন গেয়ে সে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত শুনেছি। আমি তখন পণ্ডিচেরীতে চলে এসেছি, তাই তার কীর্তন আমার শোনা হয়নি। ভদ্রসমাজে মহিলাদের মধ্যে মোনার আগে এ হেন কাজে আর কেউ অগ্রসর হয়নি। তাকে এ পথের পথপ্রদর্শক বলা যায়। কীর্তন জগতে অপর্ণা দেবী সুপরিচিতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা।

আমাদের ছোটবোনটি লীনা, তারও গানের ভারি মধুর গলা ছিল। এই বোনটি আমাদের বেশ একটু অসাধারণ রকমের ছিল। কিছু শিখতে হলে কারও সাহায্য ছাড়া 'নিজে নিজে শিখব' এই দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। সবে তার তখন সাড়েতিন কি চার বছর বয়স। আমাদের বড়বোনের একটি টেবিল-হারমোনিয়ম ছিল। চেয়ারে বসে বাজাতে গেলে তার পা 'প্যাডেল'-এ পৌছাত না। তাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক পা দিয়ে বেলো করে গুন্ গুন্ করে গেয়ে সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হারমোনিয়মে তুলত। ভুল হলে নিজেই 'উঁহু' বলে মাথাটি নেড়ে শুধরে নিয়ে আবার ঠিক করে বাজাতে চেষ্টা করত। পুরুলিয়াতে, বছর ছয়েক বয়স তখন, মামিমার একটি পিয়ানো ছিল সেই পিয়ানোও এমনি করেই বাজাতে শিখেছিল। কখনও ভুল হচ্ছে দেখলে আমরা যদি কেউ দেখিয়ে দিতে যেতাম, দিত না, বলত—'সর সর, আমি নিজে নিজে করব।' বেহালাও বাজাত। মাসিমা ছোট্ট একটি বেহালা কিনে দিয়েছিলেন, কি যে খুশি একটি নিজস্ব জিনিস পেয়ে। মাথাটি কাত করে ঘাড়ের উপর বেহালা চেপে ধরে ঘন ঘন ছড় টেনে ছ'বছরের ওইটুকু মেয়ের বাজানোর দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি।

আমাদের বাড়িতে প্রথম যখন ক্রোশের লেস্ বোনা শুরু হয়, আমরা সকলেই তাই নিয়ে মেতে আছি। মা নিজে বুনছেন, আর দেখিয়েও দিচ্ছেন, আমরা শিখছি। আমাদের ছোটবোনটির ঝোঁক হল সে কারও কাছে শিখবে না, নিজে নিজে করবে। মনে আছে তার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা। সারাদিন না খেয়েদেয়ে একটা উঁচু খাটের নিচে বসে বসে নিবিষ্টচিত্তে ক্রোশের 'চেন্‌ষ্টিচ' যেটা না জানলে ক্রোশে বোনা যায় না, মাথা থেকে বার করবার চেষ্টা করছে। মা যতবার গিয়ে বলেন—'আয়, আমি দেখিয়ে দি'—ততবারই সে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। শেষপর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর সে সত্যই নিজে নিজেই বার করে তবে ছাড়ল। অদ্ভুত ক্ষমতা আর অধ্যবসায় ছিল তার। ছবিও কি চমৎকার আঁকত। সম্বল ছিল শুধু একটি পেন্সিল। ওই পেন্সিল দিয়ে একবার দুটী কুকুরের বাচ্চার মুখ যে কী সুন্দর এঁকেছিল আজও সে বাচ্চা

ছুটির মুখ আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার ছোট সেতারটি নিয়ে নিজের মনে বাজাত। আমাকে ওস্তাদ যে রকম করে বাজাতে শেখাত, তাই দেখে দেখে নিজে চেষ্টা করে সেতারেও বেশ সুর তুলতে শিখেছিল।

সুরেন ওস্তাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করার পরে যে-গানটি সে শিখতে আরম্ভ করত তার শেখা শেষ হবার আগেই আমি গানটি শিখে ফেলতাম বলে সেটা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। কারো একবার শেখা হয়ে গেছে যে-গান সে-গান শিখতে তার মোটেই ভালো লাগত না। সে চাইত আমরা জানি না এমন কোনও গান শিখে আমাদের আগে সর্বপ্রথম সে-ই সে-গানটি গাইবে। কিন্তু বেচারীর ভাগ্যে তা হত না। আমি তার সে ইচ্ছেয় বাদ সাধতাম।

সুরেন ওস্তাদকে গিয়ে বলত, 'ওস্তাদবাবু, ওরা কেউ জানে না এই রকম নতুন গান আমি শিখতে চাই।'

ওস্তাদবাবুও বেছে বেছে তাকে সেই রকম গানই একটা শেখাতে শুরু করতেন, কিন্তু হলে হবে কি, সে যখন শিখত আমি গিয়ে শুনতাম এবং তার শেখার আগেই শিখে নিয়ে গেয়ে গানটি পুরানো করে দিতাম। সে এত দুঃখ পেত। নতুন গান আর নতুন থাকত না। এই বোনটি মাত্র বারো বছর বয়সেই জীবনের খেলা সাঙ্গ করে চলে যায়। অকালে কুসুম ঝরে গেল! দুরারোগ্য টাইফয়েড জ্বরে তার মৃত্যু হয়। বিকারের ঘোরে তাকে গাইতে শুনতাম—

'জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

আর

'এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে
আমার যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে
তবু তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই,
বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'

তার জীবনে মা-ই ছিলেন সব। তার মৃত্যুতে মাকে দেখেছিলাম কী শান্ত স্থির মূর্তি। চোখে জল নেই। দুটি হাত জোড় করে বসে আছেন চোখ

মুটি বুজে। শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে বোনটিকে লাল বেনারসী পরিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে সুন্দর করে যখন সাজিয়ে দেওয়া হল, নিয়ে যাবার ঠিক আগে আস্তে আস্তে মা তার শিরশ্চুম্বন করে শান্ত স্বরে বললেন, 'নিয়ে যাও'। পরে উঠে গিয়ে বসলেন অন্য ঘরে। আমার একটি বোন খুবই কাতর হয়ে কান্নাকাটি করেছিল দেখে তার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন—'কেঁদো না, কাঁদতে নেই। বরঞ্চ, ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হও যে, এমন সুন্দর জিনিস এতদিন তিনি আমাদের কাছে রেখেছিলেন।'

শোকে দুঃখে মাকে আমরা কাঁদতে দেখিনি। ভগবানে ছিল তার অটল বিশ্বাস। দুঃখশোক সবই তিনি গ্রহণ করতেন ভগবানের করুণা, তাঁর আশীর্বাদরূপে। পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীমাকে যখন মায়ের ছবি দেখাই, তখন শ্রীমা তাঁর বিষয়ে খুবই ভালো বলেছিলেন।

॥ ছয় ॥

মনে পড়ে দেশব্যাপী সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা। কি তুমুল কাণ্ড! ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কর্জন কর্তৃক 'বেঙ্গল পার্টিশন অ্যাক্ট' নামক কুকীর্তির ফলে সারা বাংলা উঠল ক্ষেপে। দাঁড়াল তার বিপক্ষে সব শক্তি নিয়ে। চারিদিকে বিক্ষোভের অনল জ্বলে উঠল, জেগে উঠল বাংলার প্রাণ, বাঙালীর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ। আনল দেশে জনজাগরণের সাড়া। সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলার ছোটবড় জ্ঞানীগুণী কত লোক যে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রমুখ দিকপালেরা। জোরগলায় আরম্ভ হল বক্তৃতা। মাঠে মাঠে সভাসমিতিতে লোকে লোকারণ্য। সে-সব জনসমুদ্রে আলাদা করে মানুষ আর দেখা যেত না, তাদের কালোমাথাগুলি সব এক হয়ে দেখাত একটা প্রকাণ্ড কালো আস্তরণের মত। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল এঁদের বক্তৃতার কথা এতই শুনতাম, সকলেই এঁদের বাগ্মিতায় মুগ্ধ চমৎকৃত। এঁদের পৌরুষোদ্দীপ্ত উদাত্ত তেজস্বী কণ্ঠের প্রতিটি বাণী মূর্ত হয়ে উঠত। জ্বলে উঠত প্রেরণার অগ্নিমন্ত্রে, বেজে উঠত আহ্বান গভীর জলদমন্ত্রে,—জনগণমন উদ্বুদ্ধ করে টেনে নিয়ে যেত, ভরে দিত সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়।

সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, 'Uncrowned King of Bengal'। যখন তিনি শুনলেন—'Bengal Partition Act is almost a settled

fact', তখন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন 'I shall unsettle the settled fact'—এমনই আত্মবিশ্বাসে তখন এঁরা ভরপুর। সকলের ভিতর যেন বারুদ জমে আছে, শুধু ফাটার অপেক্ষা। আমাদের মধ্যেও সর্বদাই 'কখন কি হয়' এই রকম একটা বুকভরা উত্তেজনা। আমরা তখন ছোট হলে হবে কি, আমাদের বুকেও এই সবের ঢেউ এসে লাগত। আন্দোলনের বিপুল টান আমাদের ছোট প্রাণকেও টানত। মামাবাড়ির দৌলতে বলতে গেলে আমরা এইসব পরিবেশের মধ্যেই মানুষ। সেখানে সকলকে এসব নিয়ে এত উৎসুক, এত মগ্ন থাকতে দেখতাম, এতই আলোচনা শুনতাম সদাসর্বদাই যে আমাদের মন তখন অনেকটা গড়ে উঠেছে, তখনই সে বেশ ইংরেজবিদ্বেষী। ইংরেজ যে আমাদের পরমশত্রু এবং তাকে হটানোর জন্যেই এত সব কাণ্ড চলেছে, এ বোধ তখন ভালোভাবেই জেগেছে। দেশের প্রতি টান, তার পরাধীনতার জন্যে কষ্ট—দুই-ই জন্মেছে যথেষ্ট পরিমাণে। আমরা তখন—

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুবজ্ঞান'

গাইতাম বেশ মানে বুঝে। আর হেমচন্দ্রের—

'বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

খুব উত্তেজনার সঙ্গে আবৃত্তি করতাম এবং নিজেরাও উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

বাংলার ঘরে ঘরে তখন কী উন্মাদনা। কেবল এই সব কথা এই সব ব্যাপারকে ঘিরে রয়েছে মানুষের মন। যে নির্ভরতা, যে দৃঢ়তা, যে অটল সঙ্কল্প তখন দেখেছি আমাদের ছেলেদের মধ্যে সে-সব মনের ছাপ কোনও কালেও মুছে যাবার নয়। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে, প্রহারে জর্জরিত, রক্তাক্ত, মৃতপ্রায় অবস্থায়ও, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে, তবুও সঙ্কল্প থেকে তাদের কেউ একতিলও টলাতে বা বিচ্যুত করতে পারেনি।—'জীবনমৃত্যু পায়ের

ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—এই মহাভাবে প্রণোদিত তখন তাদের মন।—'যায় যাবে জীবন চলে'—কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, পরোয়া নেই, তোয়াক্কা রাখে না কোনও কিছুর। যুবকেরা, ছেলেরা সব স্বেচ্ছায় ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বের হয়ে আসছে। রাশি রাশি বিলিতি কাপড় পোড়ানো হচ্ছে। বিলিতি লবণ খাব না, বিলিতি জিনিস ছোঁব না, বিলিতি বসন পরব না, এই হল সকলের পণ। স্বদেশী সঙ্গীতে মুখরিত পথঘাট। এই গানটি শুনে শুনে শিখে নিয়ে আমরাও গাইতাম কণ্ঠ ছেড়ে—

দীনের দীন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।

সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে
পূর্ব গব সর্ব খর্ব হল ক্রমে
চন্দ্রসূর্যবংশ অগৌরবে ভ্রমে
লজ্জা রাহু মুখে লীন।

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেহ না জানিল কেমনে হরিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো, রাজা কি কঠিন!

সূচ সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দেশলাইকাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার
সুতো জাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হল দেশের কি দুর্দিন।

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর কোপীন! —মনোমোহন বসু

ঋষি বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে উদ্বেলিত করে কাঁপিয়ে তুলছে চারিদিক। আজো কানে বাজে মেদিনীকম্পিত সেই 'বন্দেমাতরম্' রব। মনে হত প্রাণমন ভেদ করে চলে গিয়ে ভিতরে কোথায় যেন ধাক্কা মারত, ভাবতে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। সেই 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রে মায়ের শক্তি যেন জেগে উঠল। সেই মন্ত্রে হল মায়ের অভিষেক। 'মা' ডাকের এই নতুন আস্বাদে নতুন রসে অনুপ্রাণিত বাঙালী মাতৃপূজার বেদীমূলে দাঁড়াল এসে আপন জীবন অঞ্জলি হস্তে। প্রবল উদ্যমে চলল উৎসর্গের পালা।

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

শুনতে শুনতে মনে হত দেশমাতা বঙ্গজননীকে দেখছি যেন দুর্গাপ্রতিমার মূর্তিতে।

বাঙালীর মত সমস্ত অন্তর ঢেলে অমন প্রাণভরে প্রাণমাতিয়ে বন্দেমাতরম্ বলতে আমি আর কখনও কোনও জাতিকে শুনিনি। 'বন্দেমাতরম্' গান, শুরুতে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর ছাড়াও অন্য সুরে গাইতে শুনেছি। সে সুরের কিছুটা এখনও আমার মনে আছে। কংগ্রেসাদিতে রবীন্দ্রনাথের সুরেই গাইতে শুনেছি, আমরাও গেয়েছি ওই সুরেই। তারপর কবে থেকে যেন রবীন্দ্রনাথের সুরেই 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার প্রচলন হয়।

এই আলোড়নের অঙ্গবিশেষে 'রাখিবন্ধন' এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। যখন প্রচার করা হল যে, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সাল (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) আইনের সাহায্যে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হবে, তখন রবীন্দ্রনাথ ওই ৩০শে আশ্বিন দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করবার জন্যে ওই দিনেই—

'ভাই ভাই এক ঠাঁই

ভেদ নাই ভেদ নাই'—

এই মহামন্ত্রে 'রাখিবন্ধন' প্রচলিত করেন। রাখিবন্ধনের উদ্দেশ্য এই যে, আইনের সহায়তায় বাংলাদেশকে ভাগ করলেও বিধির বিধান মতে বাংলাদেশ এক, অবিচ্ছিন্ন,—এইটেই বিশেষ করে মনে রাখা ও প্রচার করা।

'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান

মোদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান'

গানটি কবির এই সময়ের রচনা।

গানটি গাইতে তখন খুব শোনা যেত। রাখিবন্ধনের ব্যবস্থা দিয়েই শুধু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। নিজে ছিলেন তার মধ্যে। শুনেছিলাম সকালের কোনও শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি স্বয়ং ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত উপস্থিত থেকে জাতিধর্ম নির্বিচারে প্রত্যেকের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই বিশেষ দিনেই সায়াহ্নে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে যে বিরাট সভা হয় সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। শেষমুহূর্তে আনন্দমোহন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে স্ট্রেচারে করে সেই সভায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর অভিভাষণ বাংলা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সভাপতির মূল ইংরেজী লেখাটি তাঁর হয়ে অন্য কেউ পড়েছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে শুনেছিলাম যে, সেই সভাশেষে সেখান থেকেও রবীন্দ্রনাথ আবার সান্ধ্যমিছিলের সঙ্গে বের হন। রাখিবন্ধনের সেই দিনটির কথা কখনও ভুলব না। চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এবং থাকবে চিরকাল। সব গৃহে সেদিন অরন্ধন পালন করা হয়। আমরাও ফলার করেছিলাম দৈ চিঁড়ে ইত্যাদি খেয়ে। কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে একত্রে এই জিনিসটি পালন করার মধ্যে। রাখিবন্ধনের আগের দিন আমরা আমাদের ছোটপিসিমাদের (ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী) কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে রাত্রে ছিলাম। এই বাড়ির সামনেই রাস্তার উপর খোলা প্রকাণ্ড ঝুলানো বারান্দা ছিল—যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। এইখান থেকে দেখেছিলাম, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে রাখি হাতে দলে দলে ছেলেরা শোভাযাত্রা করে গাইতে গাইতে চলেছে, কণ্ঠে তাদের ভাবাবেগের উষ্ণতা। কোথাও শোনা যাচ্ছে তারা গাইছে—

'বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,

এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।' —রবীন্দ্রনাথ

কোথাও শোনা যাচ্ছে—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে,
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।' —রবীন্দ্রনাথ

কোথাও দূর থেকে ভেসে আসছে—

'আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই
পরের জিনিস কিনব না
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।' —রজনী সেন

বীরদর্পে সব গেয়ে চলেছে। এমনতর কত গান কত শোভাযাত্রা কত মিছিল যাচ্ছে আসছে। আমাদের সে-সব দেখার কি আগ্রহ! বার বার দৌড়ে যাচ্ছি আর আসছি। আমাদের রক্তই কি কম গরম হয়ে উঠেছিল! দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে দেশমাতৃকার বন্দনাসঙ্গীত নানা সম্মিলিত কণ্ঠে, সুরে। তাদের আকুল-করা গানে আমাদের পাগল করে দিচ্ছে। ইচ্ছে হত ছুটে চলে যাই ভিড়ের মাঝে, তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে গাইতে পথে নেমে পড়ি। কিসের একটা অসম্ভব টানে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, ঘরে থাকা যেন দায়—

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়,
আমার ঘরে থাকাই দায়।'

রবীন্দ্রনাথের এই লাইনদুটির মত ঠিক অবিকল মনের অবস্থা। সকলের হাতেই রাখির সূত্র। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে রাখি বেঁধে দিচ্ছে—আমরাও যাকে সামনে দেখছি তাকেই রাখি পরিয়ে দিচ্ছি। সকলের মন প্রাণ যেন একই সুরে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা, একই ভাবে বিভোর,—কি যে অভাবনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, না দেখলে বোঝানো যায় না। আমার মন কেবলই ঘুরে বেড়াতে লাগল গানের দলের পিছনে। যেন নেশার মত কী একটা পেয়ে বসেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সেই সব গান কতবার যে গাইছি। কখনও কণ্ঠ ছেড়ে, কখনও আপন মনে। উৎসাহের যেন শেষ নেই। বাংলার নগরে নগরেই শুধু নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে, সর্বত্র সবখানে এই সর্বজনীন মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। পরেও কয়েক বছর ধরে প্রতি বছরই বাংলার ঘরে ঘরে রাখিবন্ধন পালন করা

হত। রবীন্দ্রনাথের কত নবরচিত গানই সে-সময় শোনা যেত; সবই প্রায় আমরা শিখে ফেলেছিলাম। তার মধ্যে বিশেষ করে এই গানগুলি খুব বেশি গাইতাম—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি'
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'
'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা'
'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'
'আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে'
'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক'

কার লেখা জানি না, এই গানটি—

'চল্ চল্ চল্ রে ও ভাই জীবন-আহবে চল্
বাজবে সেথায় রণভেরী আসবে প্রাণে বল—চল চল চল।'

এবং 'চল্‌রে চল্ সবে ভারত সন্তান'—এই গানটি প্রায়ই গাওয়া হত। সরলা দেবীর এই গানটিও খুব চলত। আমরাও গাইতাম—

'বন্দি তোমায় ভারতজননী বিদ্যামুকুটধারিণী,
বরপুত্রের তপ-অর্জিত গৌরবমণিমালিনী'

রাখিবন্ধনের, আগেই কি পরে ঠিক মনে নেই, আমরা তখন পুরুলিয়ায় রয়েছি। বঙ্গদেশের নানা জায়গায় সভা-সমিতি ও সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় মার-ধর সব বেশ পুরোদমেই চলছে। এ সময়ে মনে আছে একদিন আমাকে কোলে করে নিয়ে এক বিরাট সভার মাঝখানে একটি টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমি গাইলাম—

'আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট,
তবু আছি সাতকোটি ভাই জেগে ওঠো।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই গোলায়ি ধান,
মোটা খাব ভাই রে পরব মোটা
মাখব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে
আমরা রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে!

হায়াসনে ভাইরে এমন সুদিন
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে আমরা পরের মেঙ্গে
কিনব না ঠুনকো কাঁচ যায় যে ভেঙ্গে,
শোন্ বিদেশী, আমরা বুঝেছি সব
তোমরা খেল্না দিয়ে মোদের সোনা লোটো।'

—রজনী সেন

আমার বয়েস তখন আট বছর, ফ্রক পরি। সভাসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছিল ফ্রকপরা মেয়ের টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ওইরকম সপ্রতিভভাবে গান গাওয়া। সভাশেষে অনেকেই এগিয়ে এল পরিচয় জানবার জন্যে। যিনি কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই কি-সব বললেন।

১৯০৫ সালের এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। মামাবাবু, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, দানবীর রাজা সুবোধ মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পি. মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তিরা অনেকেই ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ দৃশ্যত না থাকলেও শুনেছি ভিতরে ভিতরে তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন পুরোভাগে কর্ণধাররূপে কলম ধরে। স্বদেশী যুগের ইতিহাসে স্বাদেশিকতার স্তম্ভরূপে যাঁর নাম খোদিত হয়ে থাকবে, তিনি হচ্ছেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ব্রিটিশ-শক্তি যাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি, পারেনি স্পর্শ করতে। যিনি ব্রিটিশ রাজের সমূহ শক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়েছিলেন নিজের অসামান্য আত্মবলে। কত শুনতাম তখন এই ব্রহ্মবান্ধবের কথা, কি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি। কি তেজস্বিতায়, কি বলিষ্ঠতায়, কি নির্ভীকতায় এঁর তুলনা ছিল না। জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে, সকল বিষয়েই এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির তল কেউ যেন আর খুঁজে পেত না। নিজে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে লণ্ডনে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন। আর এই সবের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রকৃতিগত, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যেত।

ব্রহ্মবান্ধবের প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' কাগজ তখন খুব সমাদৃত, খুব প্রভাব বিস্তার করেছে চারিদিকে। এই কাগজে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ তিনি অকুণ্ঠে অকপটে চালিয়ে যেতেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় ছাঁকা ছাঁকা বাক্যপ্রয়োগ ইংরেজের গাত্রদাহের কারণ হত। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আইনের ব্যাপার তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ

চালাতে লাগলেন লেখার ছত্রে ছত্রে আগুন ঢেলে দিয়ে, সেই অগ্নিস্রাবের সহায়তায় জনসাধারণের ভিতর আগুন জলে উঠতে দেরি হল না। 'সন্ধ্যা' পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দিকে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী বড় কম করেনি। জননী জন্মভূমির মুক্তিপূজায় তিনিও অন্যতম পুরোধা। দৃপ্ততেজে তিনি বলেছিলেন যে, রাজশক্তির ক্ষমতা নেই তাঁকে কিছু করতে পারে। পরে যখন রাজদ্রোহী বলে রাজদ্বারে তিনি অভিযুক্ত হন তখনও তেমনি জোরের সঙ্গে. তেমনি নিশ্চিত সুরেই আবারও তাঁর মুখে নিঃসৃত হয় এই বাণী—'ইরেজের সাধ্য নেই আমায় জেল দেয়।'—চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মামলা তিনি শুরুই কেবল করেছিলেন, শেষ আর তাঁকে করতে হল না! এই বাক্‌সিদ্ধ মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ক্যাম্পবেল্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেইখানেই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। ইংরেজের আইন তাঁকে কিছুই করতে পারল না। প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশরাজের সকল গর্ব খর্ব করে তাদেরই সামনে দিয়ে জয়ডঙ্কা বাড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলেন তাদের নাগালের বাইরে এই বার্তা ঘোষণা করে—

'তোর হাতের ফাঁসি রইলো হাতে
আমায় ধরতে পারলি না।'

অদ্ভুত জীবন! অদ্ভুত মৃত্যু! শ্রীঅরবিন্দ কথা প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি নীরদবরণের লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা-বার্তা' বইটি থেকে :

'তখন বাংলায় তিনটি কাগজ চলতি ছিল : যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সন্ধ্যার সম্পাদক, ইনি আর একজন মহৎ লোক। এমন বিচক্ষণ লোক ছিলেন যে, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খুঁজে পেত না।'

আমাদের মামারবাড়িতে তাঁর যাওয়া আসা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দাদামশায়, মামাবাবু, মামিমা, মা, মাসিমা ওঁদের সবাইকে কি অগাধ শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মবান্ধবের সম্বন্ধে কথা কইতে শুনতাম। বেশ মনে আছে আমাদের রসা রোডের বাড়িতে নানা আলোচনার মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত।

শ্রীঅরবিন্দ যেদিন বরোদার অতবড় সম্মানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু নাম-মাত্র বেতনে কলকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় 'ন্যাশানাল কলেজ'-এর

প্রিন্সিপাল হয়ে এলেন, সেদিন তাঁর এতবড় ত্যাগের মহত্ত্বে বিস্ময়ে স্তম্ভিত সমস্ত দেশবাসী সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় তাঁর কাছে শির নত করল। এই বিরাট, মহান ত্যাগের ভিতর দিয়ে হল তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর পরিচয়। শ্রীঅরবিন্দের নাম সেই থেকে আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইল। তিনি যে সম্পূর্ণ অন্য জগতের, অন্য পর্যায়ের, অন্য জাতের মানুষ, তা ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে এসেছি ও সেই চোখেই তাঁকে দেখতে শিখেছি। রাজা সুবোধ মল্লিকের অনুরোধে, পরে তিনি 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বিপিন পালও তাঁর সঙ্গে একত্রে এই কাজ পরিচালনা করেন। এই 'বন্দেমাতরম্' কাগজে যখন শ্রীঅরবিন্দের লেখার পর লেখা বের হতে লাগল তখন তাঁর সম্বন্ধে সকলের বিস্ময় বেড়েই চলল। সকলের মুখে মুখে তাঁর নাম, তাঁর লেখার কথা—কি তার ভাব, কি তার গভীরতা, কি ওজস্বিনী ভাষা, যুক্তি, সবকিছু সম্বন্ধে কি অদ্ভুত জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি। সকল বিষয়েই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা, শক্তি ক্ষমতা সকলের সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল। প্রকাশ পেল এমন একটি মানুষ যার মত আর 'লাখে না মিলে এক।'

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর 'সন্ধ্যা' কাগজে যা লিখেছিলেন এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই থেকে ব্রহ্মবান্ধবের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরও নানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

"মানস সরোবরে অরবিন্দ" —ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারতমানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে পাঁদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে—নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার! কেবল বর্ণবিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর!! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎদুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্বিকতার দিব্য শ্রী! বৃহৎ ও মহৎ!! হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ! হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ!! এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল পর্ণের ন্যায় কান্তপেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গীর সভ্যতার মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের-ছেলে-অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।

তোমরা ঐ ঢ্যাপঢেপে, প্যানপেনে, ফিরিঙ্গীর পোঁ-ধরা মদরতদের কাগজ-গুলা আর ছুঁইয়ো না। ঐ অরবিন্দ ভাব-বিন্যাস বুকে স্বদেশপ্রীতির বান ডাকাইয়া দিবে। মাতৃসেবার উত্তেজনা জাগাইবে। বন্দেমাতরমের কথা শুনিলে ভয় ঘুচিবে। বাহুতে বজ্রবল আসিবে। শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বহিবে। আর মরণকে মনে হইবে বসন্তবিলাস। সাপের ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া যেমন বিষ ঝাড়ায়, বন্দেমাতরমের মন্ত্রে তেমনি ফিরিঙ্গীয়ানার বিষজর্জরতা ঘুচিয়া যাইবে। বুঝিবে ঐ কামান বন্দুক, ঐ জেল কারাগার, ঐ আইন আদালত, ঐ লাট-বেলাট সব ফক্কিকার! ফিরিঙ্গির হুড়ুম দুড়ুম দুদিনেই অক্কা পাইবে।

বিলেতে লেখাপড়া শিখিলেও বিলিতি অবিদ্যার পুতনা-মায়া অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অরবিন্দ শরতের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আপনার স্বদেশের স্বধর্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া জননী-জন্মভূমির শ্রীচরণপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্যের মত শোভা পাইতেছেন! আহা! এমন কি আর হয়? অরবিন্দ ফিরিঙ্গীর আঁস্তাকুড়ের বাবু নহেন। তাই তিনি খাঁটি মায়ের ছেলে হইয়া ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐখানে বন্দেমাতরম মন্ত্রে মাকে প্রণাম কর। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব নাই।" (সন্ধ্যা পত্রিকা হইতে)

শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব শুধু বাঙালী জাতির জীবনে নয়, সারা ভারতবর্ষে শিকড় বিস্তার করেছিল। দেশের চিত্ত জয় করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। 'বন্দেমাতরম্' কাগজে তাঁর লেখা পড়বার জন্যে মানুষ পাগল। বাংলাদেশবাসীর বিশেষ করে যুবকমণ্ডলীর দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতে চাইলেন শক্তিসাধনার দিকে,—শক্তি চাই, দেশোদ্ধারের প্রকৃত আদর্শের দিকে, মুক্তিসাধনার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দিকে। তিনিই প্রথম বলেন—শুধু স্বাধীনতা নয়, চাই ইংরেজের অধীনতাবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা। বহু জায়গায় তিনি বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও অনেক জায়গায়। সেসব অসাধারণ সারগর্ভ বক্তৃতায় যেসব বস্তু তিনি বিতরণ করতে লাগলেন তা সর্বদেশে সর্বকালেই সুদুর্লভ, এবং সর্বদেশের সর্বকালের অক্ষয় সম্পদ। শ্রীঅরবিন্দ শুধু নেতা ছিলেন না, ছিলেন দ্রষ্টা, যোগী। তাঁর নির্দিষ্ট পথে ভারতবাসী যদি চলতে পারত, তবে ভারতমাতাকে এমন অঙ্গহীন অবস্থায় আজ আমাদের দেখতে হত না।

'বন্দেমাতরম্' কাগজে রাজদ্রোহিতামূলক কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হন (বোধ হচ্ছে ১৯০৭ সালেই কোনও মাসে)। কিন্তু তিনিই যে সম্পাদক তার কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁকে

ছেড়ে দিতে হল। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিজের উক্তি নীরদবরণের পুস্তকটি থেকে তুলে দিচ্ছি—

'নীরদ : সরকার আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেনি ?

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে করবে ? তেমন কোন আইন ছিল না। প্রেসেরও বেশি স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়া, অভিযোগ আনার মত কাগজে কোন লেখা থাকত না। Statesman বলত যে, কাগজ রাজদ্রোহসূচক লেখায় ভর্তি অথচ এমন কৌশলে লেখা যে. সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার উপায় নেই। সম্পাদকের নামও ত ছাপান হত না ; কাজেই, শুধু প্রিণ্টারদের গ্রেপ্তার করতে পারত, কিন্তু একজন গেলে অন্যরা তার স্থান নিত।

পরে সহকারী সম্পাদক, উপেন ব্যানার্জি কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করে, তার জন্যে রাজদ্রোহে আমি অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হই, কিন্তু প্রমাণের অভাবে খালাস পাই।'

যাই হোক, এই ব্যাপারে আদালতে বিপিনচন্দ্র পালের ডাক পড়ে। উদ্দেশ্য, সম্পাদক সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়। বিপিন পাল চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁকে তিনটি প্রস্তাব দিয়ে বলেন, (১) 'হয় আপনাকে পরিষ্কার বলতে হবে যে, অরবিন্দই সম্পাদক, বলা বাহুল্য তাহলে অরবিন্দের জেল হয়ে যাবে, বন্দেমাতরম্ কাগজও তাহলে উঠে যাবার সম্ভাবনা ষোলআনা এবং দেশের যে কাজ শুরু হয়েছে তা যে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই ; (২) নয়ত আপনাকে বলতে হয় অরবিন্দ সম্পাদক নন, সেটা হবে মিথ্যে কথা বলা'—ব'লে একটু ইতস্তত করে শেষে সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—(৩) 'আর এক হতে পারে আপনি যদি এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আদালতে একেবারে অস্বীকার করেন, জেনে রাখা ভালো যে. এর ফলে আপনার কিন্তু জেল হবে।' বিপিনবাবু যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হলেন। তাঁকে জেরা করতেই তিনি তাঁর জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, 'এই বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করি।' প্রশ্নকর্তারা তাঁর এই উত্তর বোধহয় আশা করেন নি। বিপিনচন্দ্রের ছয়মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন তাও এইখানে লিপিবদ্ধ করছি নীরদবরণের সেই বইটি থেকে।—

'বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা। সে-সময় তাঁর বক্তৃতায় আগুন জ্বলত। তাকে এক ধরণের অবতরণই বলতে পার। পরে তাঁর সেই বাক্‌শক্তি হ্রাস পায়।'

১৯০৮ সালের সেদিন ছিল ১লা মে। হঠাৎ বারুদের আগুনের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে—মজঃফরপুরে বোমা পড়েছে, দুজন ইংরেজ মহিলা নিহত। এই হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরাম বসু ধৃত। জানা গেল প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম দুজনে ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন, সে গাড়িতে আরোহী ছিলেন নিরীহ দুটি ইংরেজ মহিলা, মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা। ফলে তাঁদের মৃত্যু ঘটে। সংবাদ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল—ক্ষুদিরাম বোস ধরা পড়েছে—সে যে কি উত্তেজনা, উন্মত্ত অবস্থা। বাঙালী ক্ষেপে আগুন, ইংরেজ-বিদ্বেষে যেন ফেটে পড়বার মত। উষ্ণতার সীমা হারিয়ে বার বার 'বন্দেমাতরম্'-এর উদাত্ত ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত যেন তারই প্রতিবাদ ঘোষণা করে বেড়াতে লাগল।

ক্ষুদিরাম বসু মেদিনীপুরের ছেলে। বয়েস মাত্র সতেরো বছর। বয়েস শুনে আমরা যেন কেমন হয়ে গেলাম—এত ছোট ছেলে! এই বয়সেই তৈরী হয়ে এগিয়ে এসেছে মরণের মুখোমুখি হতে! জীবন দিয়ে জীবন নেবার কঠিন ব্রতে এমন অদম্য উৎসাহে কৃতসঙ্কল্প এই বয়সের এইসব ছেলেরা!

ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। দেশের জন্যে এরা করতে না পারে হেন কাজ নেই ; এই দেশের জন্যেই এরা গৃহসুখ সব জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরকে করেছে পর, আর পথকে করেছে ঘর। ধন্য এরা, এরাই দেশের রত্ন, দেশের গৌরব। চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, প্রাণের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে যতবার শুনছি ছেলেটির ফাঁসি হয়ে যাবে। ইংরেজের আইন ওকে রেহাই দেবে না। মনের মধ্যে এই সব কত কথাই তোলপাড় করছে।

পরের দিন সকলের বিস্ময়কে অভিভূত করে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে স্তব্ধ করে, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত খবর এল—বোমা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার প্রায় তিরিশজন সহকর্মীসহ। এই খবর দেশবাসীর কাছে বোমা ফাটার মতই সাংঘাতিক। জানা গেল, পুলিশপ্রবরেরা নাকি শ্রীঅরবিন্দের গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তাঁকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর মত মানুষকে হাতকড়া পরাবার খবরে সকলে যত ক্ষুণ্ণ তত চটে লাল। সভ্যজগতে, সভ্যসমাজে, সভ্যতার যুগে, সভ্যতাগর্বে এত গর্বিত ব্রিটিশ জাতির এ হেন মার্জিতরুচির এবং ভদ্রতার মাত্রাজ্ঞানের কথা ঘৃণা ও তিক্ততার সঙ্গে বিষ বর্ষণ করে সকলের মুখে মুখে ফিরে বেড়াতে লাগল।

শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, সুশীল সেন, হেমচন্দ্র দাস, শৈলেন বসু, ইন্দুভূষণ দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য আরো যাঁরা এই সঙ্গে ধরা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে বত্রিশ নম্বর মুরারিপুকুর লেনের বাগান থেকে, এবং কাউকে কাউকে 'নবশক্তি' কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সমস্ত শহরের মন ঝুঁকে পড়ল এই দারুণ ব্যাপারের উপর। দফে দফে কতরকম কত কথা ভেসে আসছে, খবরাখবরের জন্যে সব লালায়িত, পাগল যেন। চলাফেরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাদের উদ্‌ভ্রান্ততা, তা যেন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাড়িতে কিন্তু একটা বিশেষ থমথমে ভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই, মামাবাবু যেন নির্বাক-বেদনার পাষাণমূর্তি। সকলেরই চোখেমুখে ফুটে আছে অপার বিস্ময়। আর দীর্ঘশ্বাসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ব্যথাভরা ম্রিয়মাণ অন্তরের অন্তহীন উদ্বেগের চাপ। এমন সব সংবাদের জোর ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে তার পরের দিনই আবার আরেক সংবাদ ঘোষিত হল—

মোকামাঘাট স্টেশনে ধরা পড়বার উপক্রম হতেই প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে নিজেকে খতম করে দিয়েছে।

এ খবরও দেশবাসীকে টেনে নিয়ে গেল আরেক উত্তেজনার স্রোতের মুখে। সকলের চিত্ত আলোড়িত করে চলতে লাগল তুমুলভাবে উত্তেজনার পর উত্তেজনা। শুনেছি বিপ্লবীদের নিয়ম, ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দেওয়া। প্রফুল্ল চাকীর এই কাজে প্রকাশ পেল বিপ্লবীরা যথেষ্ট সুপরিচালিত। কাজেই, ইংরেজের আতঙ্ক বেড়ে যাবারই কথা। যাই হোক, মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যে এমন সব কাণ্ড ঘটে যাবার আকস্মিকতায় মনে হল একটা মহাপ্রলয় হয়ে গেল যেন,—এই রকমের আবহাওয়া তখন চারিদিক ঘিরে রয়েছে।

'আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল'-এ হল বোমা ষড়যন্ত্রের বিচারাধীন আসামীদের সকলের স্থান। শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে! মনে পড়ে যায় কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের কথা। কবিদের বলা হয়ে থাকে দ্রষ্টা। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> 'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
> সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন রাজা কবে
> পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার

চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

লিখলেন—

'বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।'

মজঃফরপুরের বিচারের পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল। অন্তর যে কি কান্নায় কেঁদে বেড়াতে লাগল ওই ছেলেটিকে ঘিরে। মনে আছে গভীর রাতের নীরব অন্ধকারে বসে তার ভালোর জন্যে ভগবানকে কতই ডেকেছিলাম। মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারিনি তার জীবনের ওই নিষ্ঠুর সমাপ্তির কথা।

স্বদেশের মুক্তিপূজায় এই হল প্রথম বলি ফাঁসীর যূপকাষ্ঠে। ছেলেটি নাকি হাসতে হাসতে গেয়ে উঠেছিল ফাঁসির মঞ্চে। কবি নজরুলের গানটি মনে পড়ে যাচ্ছে—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'—তাঁদের মধ্যে এই সতেরো বছরের বালক ক্ষুদিরাম হলেন অগ্রণী। 'প্রবাসী' পত্রিকায় যখন তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়, তখন দেখেছিলাম সরলতামাখা ওই মুখে স্বর্গীয় পবিত্রতার শুভ্রজ্যোতি। কতদিন পর্যন্ত ওই মুখখানি চোখের সামনে কেবল ভেসে উঠত। আজো ভুলিনি তাঁকে, ভোলা কি যায়!

আরম্ভ হল আলিপুরের বিখ্যাত বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার 'Alipore Bomb Case' নামে। এই মামলা বোধকরি প্রায় একবছর ধরে চলেছিল। প্রথমে জজকোর্টে, পরে আলিপুর সেশন-কোর্টে এবং তার পরে হাইকোর্টে। আমরা শুনলাম আলিপুরে যে বিচারপতির এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয় তিনি বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। নাম বিচক্রফ্‌ট (Beachcroft)। শুরুতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী কিছুকাল শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ নিয়ে এই মামলায় অগ্রসর হন। পরে মামাবাবুর হাতে আসে এই মামলা পরিচালনার গুরুভার। তিনি সানন্দে সে-ভার মাথা পেতে নিলেন। আইন ব্যবসায়ে তখনও তাঁর তেমন নাম হয়নি। তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন যথেষ্ট নামকরা সরকার-পক্ষের আইনজীবী নর্টন।

এ মকদ্দমার পিছনে তখন মামাবাবুকে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। দিন নেই রাত্রি নেই, আরাম নেই, বিশ্রাম নেই, আহার-নিদ্রা ভুলে একমনে তিনি আইনের গাদা গাদা পুস্তকের তলে তলিয়ে, কী যেন খুঁজে ফিরতেন—'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর'—মামাবাবুকে দেখলে মনে হত আইনের সেই পরশপাথর খুঁজে বার করবার চেষ্টায় তিনি বদ্ধপরিকর। যার স্পর্শে শ্রীঅরবিন্দ এঁদের মুক্তি হবে অনিবার্য। সে-সময়ে আমরা দেখেছি কত রাত্রি ভোর হয়ে গেছে একইভাবে বসে তিনি কাজ করে চলেছেন, খেতে বা শুতে আসবার কথাও তাঁর মনে নেই। এই মকদ্দমা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অনেক সময় দেখতাম উপরের টানা বারন্দায় বহুক্ষণ ধরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, সময়ের জ্ঞান নেই, চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি, মুখের ভাব দেখে মনে হত তিনি এ রাজ্যে নেই। চোখের সেই দৃষ্টি আর মুখের সেই ভাব আজও যেন দেখতে পাই।

এই সময়ে আদালতে তাঁর সওয়াল যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই একবাক্যে বলেছেন যে, যে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে, অদ্ভুত দক্ষতা বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি আইনের সব কূট জটিল যুক্তিতর্কজাল একে একে খণ্ডন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলতেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এক-আধদিন নয় দীর্ঘ দশমাস ধরে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ে এই অসাধ্যসাধনের তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। আদালতের ইতিহাসে আইন-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মদর্শিতার সে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। আইনে তাঁর এ-হেন জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সে-সময় আদালতের কোনও বিচারপতি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন 'Maker of Criminal Law'।

নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা'য় লিখেছেন—"আমরা সব প্রত্যহের মত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করে বসেছি—এমন সময় হঠাৎ কোর্টকক্ষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে ধীরে ধীরে উঠে চলল গমকে গমকে যেন—আমরা সব দাঁড়িয়ে উঠলাম, উদগ্রীব উৎকর্ণ নিবাত নিষ্কম্প—শুনলাম চিত্তরঞ্জন দেবাদিষ্ট হয়ে যেন বলে চলেছেন—

'He stands not only before the bar of this Court, but stands before the bar of the High Court of History. Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as a poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands'—

বিনা শর্তে সসম্মানে শ্রীঅরবিন্দদের তিনি মুক্ত করে নিয়ে এলেন। আমার মনে আছে আমরা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলাম পর পর কতগুলি ঠিকাগাড়ি ঢুকল ফটকের ভিতরে। বুঝলাম, শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা মুক্তি পেলেন, তাঁরা সব এলেন। বাড়ির ভিতরে মামিমা, মা-মাসিমাদের সব ব্যস্তভাবে চলাফেরা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই মকদ্দমার অনেক খবর আমাদের ছোটমামা সরবরাহ করতেন, কেননা, তিনিও সবে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন ও আদালতে যেতে শুরু করেছেন। যেদিন মকদ্দমার রায় বের হবার কথা, মনে আছে সেদিন বাড়িসুদ্ধ সকলের কি অবস্থা। উৎকণ্ঠা যেন চরমে উঠেছে, সব শক্ত হয়ে বসে আছেন। ছোটমামাই প্রথমে শুভসংবাদ যেই দিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বিনাশর্তে মুক্তি পেয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সে কি আনন্দের সাড়া পড়ে গেল, সকলেই উল্লসিত, আনন্দে অধীর, আত্মহারা। রসা রোডের বাড়ি যেন উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ, মুখরিত হয়ে উঠল। আমরাও সেই বিজয়োল্লাসে মেতে হৈ হৈ করে সারাটা বাড়ি মাথায় করলাম।

এই মামলা যখন চলছে তখন হঠাৎ আলিপুর জেলে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। সত্যেন এবং কানাই দুজন গুলি করে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে। এই নরেন গোঁসাই সরকারের সাক্ষী হয়। তাই বিশ্বাসঘাতককে শুধু চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যেই নয়, শুনেছি যাতে সে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে না পারে তাই জন্যে তাকে তাড়াতাড়ি সরাবার এই ব্যবস্থা। কেননা, কোর্টে জেরা করতে না পারলে নাকি সাক্ষ্যের কোন মূল্য থাকে না। জেলে এত সতর্ক পাহারার মধ্যেও এমন অসম্ভব কাণ্ড কি করে সম্ভব হল, জেলাকর্তৃপক্ষরা সকলেই থরহরি কম্প। সকলের মনেই এই প্রশ্ন, মুখে এই কথা। ওই রুগ্ণ রোগা ছেলেদুটির ভিতর কেমন করে এমন বজ্রের আগুন যে থাকতে পারে তাই দেখে ইংরেজশাসকদের ধারাল বুদ্ধি যেন বোকা বনে গেল। কত ফিকির, কত ফন্দি করেও পুলিশের লোকেরা এদের কাছ থেকে বার করতে সক্ষম হয়নি রিভলভার এরা কোথায় পেল, কে দিল। আজও অবধি এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে। আমরা শুনেছিলাম কাঁঠালের মধ্যে ভরে কেউ পার করেছিল। নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা' বইটিতে এ বিষয়ে সব বেশ পরিষ্কার খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন, রিভলবার ওঁরা কেমন করে ও কোথায় পেয়েছিলেন। তাঁর 'স্মৃতির পাতা' থেকে আর একটুখানি তুলে দিচ্ছি —"পুলিশের বড়কর্তা থাকতে না পেরে শেষটা কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন— কানাইয়ের ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছে, দিন গুণছে তখন—'এখন ত সব শেষ,

এখন বললে আর দোষ কি? দেখাও না তোমার সৎসাহস, বল ত কোথায় পেলে পিস্তলটা'—কানাই গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে বললে—

'It is the spirit of Khudiram who gave me the revolver.'

এইসব ছেলেরা সত্যিই কত যে ভিন্ন প্রকৃতির, আর কত অন্য ধরনেরই যে ছিল। তাই ভাবি, আমাদের দিনে তারা যে এসেছিল, আমাদের এত কাছে স্পর্শের মধ্যে ছিল, তাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের জীবনকে কতভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, ধন্য করেছে, তাদের মরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করেছে, সম্মানিত করেছে, শ্রদ্ধান্বিত করেছে। আমাদের তারা ডাক দিয়েছে উঠবার, জাগবার, চেয়ে দেখবার জন্য—এ যে জীবনের কত লাভ, কত সৌভাগ্য সেই কথা স্মরণ করে আজ গভীর আনন্দ অনুভব করি।

এই পর্বের শেষ কানাই এবং সত্যেন দুজনের ফাঁসির সঙ্গে। কানাইয়ের ফাঁসি হয় আগে, সত্যেনের তার কিছুদিন পরে। শুনেছি কানাইয়ের ওজন বেড়ে গিয়েছিল ফাঁসির আগে। আর, তাকে নাকি ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসি দেবার জন্যে।

এদের জীবনের কথা ভাবলে একদিকে যেমন চোখে জল ঝরে, আর একদিকে তেমন বুক ভরে ওঠে, শিরা-উপশিরায় যেন কিসের চলাচল শুরু হয়ে যায়। কী যে দেখেছি তখন এই চোখে!

আমি সেই গান গেয়ে এঁদের কথা আজ শেষ করি যে-গান শুনেছিলাম তখনকার দিনে দেশবাসীর কম্বুকণ্ঠে—

'ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিতে জীবন দান
পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই, সত্যেন ধন্য করিল দেশ।'

শ্রীঅরবিন্দ জেল থেকে বের হয়ে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা বের করেন, কেননা তিনি জেলে থাকতেই 'বন্দেমাতরম্' কাগজটি উঠে যায়। শুনেছি, 'কর্মযোগিন্' অফিসে গিয়ে সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে জানান যে, আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, সব ঠিক। অতএব তিনি যেন অবিলম্বে কলকাতা পরিত্যাগ করে কোথাও চলে যান। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলছেন (যা বলছেন তা নীরদবরণের 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' পুস্তকটি থেকে তুলে দিচ্ছি নিয়ে):

'আমাদের বন্দেমাতরমের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ ছিল। তবুও কয়েক বছর ধরে আমরা কাগজ চালিয়েছি। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলিপুর জেলে বন্দী ছিলাম, আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কাগজ চালান দুঃসাধ্য দেখে তারা কড়া লেখা বের করে, তাতেই কাগজ বন্ধ হয়, পরে খালাসের পরে

কর্মযোগিন বের করি। সেবারও যখন নিবেদিতার কাছে আমার গ্রেপ্তারের গুজব শুনলাম, "দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি, এবং গোপনে চন্দননগর চলে যাই। সেখানে বন্ধুরা যখন আমায় ফ্রান্সে পাঠাবার কথা ভাবছিল, আমি আদেশ শুনলাম—"পণ্ডিচেরী চলে যাও।"

মণিলাল : (বরোদার ডাক্তার। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য) পণ্ডিচেরী কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : সে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ! মানতেই হবে। পরে বুঝতে পেরেছি যে, আমার যোগের কাজের উদ্দেশ্যে এ আদেশ।"

আর এক জায়গায় পুরানী (শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ও আশ্রমের বহু পুরাতন বিশিষ্ট সাধক) নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করছেন ('শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' নীরদবরণের লিখিত পুস্তক হতে উদ্ধৃত) :

'আজ পুরানী কথা শুরু করল ; বলল যে, হার্বার্টের স্ত্রী নিবেদিতার পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করছেন ছাপাবার জন্যে। একটা চিঠিতে নাকি নিবেদিতা বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা ত্যাগকালে নিবেদিতাকে বন্দেমাতরমের ভার দিয়ে যান।

শ্রীঅরবিন্দ : বন্দেমাতরম্ ত নয়, কর্মযোগিন্। তুমি তাকে সেটা বলো, এখন এসব খবর প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নেই। চন্দননগর যাবার পূর্বে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়, এবং তাঁকে আমি ভার নিতে বললে তিনি রাজী হন তাঁর কাছ থেকেই আমাকে গ্রেপ্তার করবার অভিসন্ধিটা জানতে পাই, সরকার-মহলে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। তখন আমি "আমার রাজনৈতিক উইল" প্রবন্ধটা লিখি। তাতে গ্রেপ্তারের মতলবটা স্থগিত হয়।"

আত্মোৎসর্গের মহিমায় উজ্জ্বল আর একটি আদর্শ দেশভক্তের কথা একটু বলি, যিনি বালেশ্বরে দুই হাতে গুলি চালাতে চালাতে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদলের বিপক্ষে একা লড়েছিলেন। শত্রুর গুলিবিদ্ধ হয়ে একটি হাত যখন অচল হয়ে যায়, তখন শুধু অপর হাতটি দিয়েই শেষপর্যন্ত গুলি চালিয়ে যেতে থাকেন যতক্ষণে না অনাহারে ক্লিষ্টদেহ ঢলে পড়ে মাটির উপর। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীরশ্রেষ্ঠ, বীরত্বের নিদর্শন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঘাযতীন নামে খ্যাত। পূর্বেও একবার বিনা অস্ত্রে ইনি বাঘের সঙ্গে লড়েছিলেন, যেজন্যে এঁর নাম হয় 'বাঘা যতীন'। এঁর বিক্রম, তেজ, শক্তি, সাহস—কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। এঁর একটি শিষ্য, বীরেন দত্তগুপ্তের রিভলভারের গুলিতে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট, দেশের পরম শত্রু সামসুল আলম, হাইকোর্টের মধ্যে

ভবলীলা সাঙ্গ করেন। ছেলেটি ধরা পড়ে যায় এবং পুলিশের তাড়নায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ করে ফেলে। ফলে, তাঁকে আলিপুর জেলে বিচারাধীন আসামী হয়ে বেশ কিছু কাল থাকতে হয়েছিল। 'Howrah Conspiracy Case' নামে এই মামলা বহুদিন ধরে চলে। পুলিশ এঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে না পারায় ইনি খালাস পান দীর্ঘ দেড়বছর পরে।

আমার মামার মনে একটা গভীর দুঃখ ছিল যে, এমন মানুষটিকে দেশের মানুষ তেমন চিনল না। তিনি একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'শালগ্রাম-শিলা দিয়ে আমরা বাটনা বেটেছি!' মামাবাবু নিজে এঁর মৃত্যুতে অশৌচ পালন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে দিয়ে সেই মহানচেতা মানুষটির কথা শেষ করি—

'He was one of my most trusted lieutenants, a wonderful man who would belong to the front rank of humanity, such beauty and strength combined in one I have not seen. His stature was like that of a warrior'. Sri Aurobindo by Nirodbaran.—

এই যতীন্দ্রনাথেরই একটি শিষ্য নাম চারু বসু, আলিপুর আদালতে যখন বোমার মামলার শুনানী চলছিল তখন একদিন আদালত-কক্ষে প্রবেশ করে ঘরভর্তি লোকের সামনে পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ও সেই গুলিতেই আশু বিশ্বাসের জীবনান্ত ঘটে। অসমসাহসিকতার প্রতিমূর্তি এই ছেলেটি পালাবার কোনও চেষ্টাই করেনি। যে-কাজ করতে এসেছিল তারই সাফল্যের তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল মৃত্যুভয়লেশহীন ওই মুখে। এই ছেলেটিও শুনেছি গিয়েছিল—'হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিতে জীবনদান।' তলে তলে খবর পাওয়া গিয়েছিল, আশু বিশ্বাস নাকি সবিশেষ চেষ্টায় ছিলেন যে, যাতে বোমা ষড়যন্ত্রের আসামী সকলের মোক্ষম সোজা হয়।

অগ্নিযুগের রক্তরাঙা বুকে এই সব ছেলেরা যেসব জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, নিজেদের রক্ত দিয়ে যে-দাগ এঁকে দিয়ে গেছে দেশের মাটির উপর, সে-দাগ কে মুছতে পারে! দেশের মাটি যদি আজ ফেটেও যায়, তবে সে ফাটা মাটির দাগে দাগে তাদের অঙ্কিত রেখা থাকবে অক্ষয় অমর হয়ে। সাক্ষ্য দেবে কালের বুকে চিরোজ্জ্বল হয়ে।

॥ সাত ॥

আদালতে যোগদান করার কয়েক বছরের মধ্যেই মামাবাবু পিতার ঋণের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন আদালতে দেউলিয়া নাম লিখিয়ে। এর ফলে তাঁকে আদালতে প্র্যাকটিস করা নিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রাণপণ পরিশ্রম ও চেষ্টায় বাবার সেই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলে নিজের পসার জমিয়ে তুললেন। বোমা ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁর খুব নাম হল। সেইখান থেকে তাঁর যশের শুরু। তারপর উঠলেন তার শিখরে, 'ডুমরাওন কেস্' নামক মামলায় জয়ী হয়ে কেশোপ্রসাদ সিংকে ডুমরাওনের গদিতে বসিয়ে। তখন কলকাতার আদালতের প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়ালেন। এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী বলে গণ্য হলেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

এই 'ডুমরাওন কেস্' করতে যখন মামাবাবু আরা যান, তখন বাড়িসুদ্ধ প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে আরা যান। দিদিমা, দাদাবাবু, মামিমা, মামাতো ভাইবোনেরা এবং মাসিমারাও কেউ কেউ ছিলেন। মা এবং আমরাও সেই সঙ্গে ছিলাম। আরাতে যে-বাড়িতে আমরা ছিলাম তার নাম ছিল 'Nanda-babu's Bungalow', স্টেশনের ঠিক পিছন দিকে ছিল বাড়িটি। কিছুদিন ওখানে থেকে আমাদের নিয়ে মা ঢাকায় আসেন আমাদের এক পিসিমার (সত্যজিৎ রায়ের মাতামহী) কাছে, সেখানে তাদের সঙ্গে কয়দিন থেকে পিসিমা ও টুলুদিকে (সত্যজিৎ-এর জননী) নিয়ে আমাদের পিতামহের জমিদারী কাছারি 'কাওরাইদ' এলেন।

এই প্রথম আমরা গ্রামে এলাম। ঠাকুরদা তখন বেঁচে নেই। ঢাকা ও ময়মনসিং-এর মাঝে অবস্থিত কাওরাইদ। কাওরাইদের এলাকা যেখানে শেষ সেখান থেকে ভাওয়ালের এলাকা শুরু। এইখানে এসে ঠাকুরদার শিল্পী মনের কত পরিচয়, কত নিদর্শন যে পেলাম। কতবড় শিল্পী তিনি ছিলেন তা বুঝতে বিলম্ব হল না তাঁর হাতের নানা কারুকার্য দেখে। মোমবাতির মোম দিয়ে কি অপূর্ব ছোট্ট একটি নৌকা করেছিলেন শুধু সামান্য নরুন দিয়ে খোদাই করে। সত্যই দেখবার মতন জিনিষ। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, মোমবাতি দিয়ে এমন জিনিস হতে পারে। তাছাড়া খড়ির উপর খোদাই করা কত মূর্তি কত ছোট ছোট অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর জিনিস সব যে দেখতে পেলাম, সবের মধ্যে ঠাকুরদার স্পর্শ যেন লেগে আছে। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম

দেখে। ঠাকুরদার কাছারিবাড়িটি ছিল কাঠের বাড়ি। আমরা সেই বাড়িতে ছিলাম। এই জায়গাটি তাঁর প্রিয় ছিল।

ঠাকুরদার সময়কার তাঁর ভক্তবৃন্দদের মধ্যে কেউ কেউ দেখলাম তখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছে রোজ সন্ধ্যাবেলা বসে ঠাকুরদার কত কথা শুনতাম মুগ্ধচিত্তে। যত শুনতাম তত আরও শুনতে ইচ্ছে করত। সত্যকারের একজন সাধু মহান্ ব্যক্তি ছিলেন। মনটা কেবলি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। জমিদারির কাজে ঠাকুরদাকে প্রায়ই কাওরাইদ এসে থাকতে হত। এই কাছারিবাড়িতেই থাকতেন।

বাড়িটির চারদিক খোলা। নানা রকম ছোটবড় গাছপালায় ভরা, ভারি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা এখানকার। সামনে দিয়ে বয়ে গেছে ছোট নদী। লম্বা লম্বা এক-একটি তালগাছে যে কতগুলি করে বাবুই পাখীর বাসা ঝুলছে দেখা যেত। বাবুই পাখীর কি অদ্ভুত বাসা সব যে দেখলাম। এরকম পাখীর বাসা আগে কখনও দেখিনি। সারাদিন কত রকমের পাখীর ডাকই শোনা যাচ্ছে। চারদিকে প্রকৃতির এত রকমের হাতছানি যে, মন যেন তারই সুরে সুর মেলাতে চাইত। গাছপালা সবই যেন আপনজন, মনে হত কী যেন একটা সম্বন্ধ আছে এদের সঙ্গে। গাছের যে-সব ডালে হাত পৌঁছয় সে-সব ডালের পাতাগুলির গায়ে গায়ে হাত বুলিয়ে কেবল দেখতাম, কেন জানি না খুব ভালো লাগত। পাতাবাহার গাছগুলির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতাম বুলবুলি পাখীর বাসার খোঁজে। গাছের ডালে বসে দোয়েল বুলবুলির শিস্, ভরা দুপুরে কোকিলের ডেকেই যাওয়া, যখন তখন এসে কোথাও কোন গাছে বসে 'বৌ কথা কও' পাখীর সুর করে বার বার বলা, তারপর পাপিয়ার সেই মধুর ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সুর—সব এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করত, মনে যেন কিসের ছোঁওয়া লাগত।

কাছারিবাড়িতে অদূরে আশেপাশে সব নায়েব-গোমস্তাদের খড়ের চালের কুটির। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কত বর্ণনা পড়েছি, শুনেছি কত কথা। এত ভালো লাগল এখানে এসে সব দেখে। [illegible]াই মিলে নদীতে স্নান করতে যেতাম। সাঁতরে এপার-ওপার করতাম, তবে বেশ ভয়ে ভয়ে, কেননা নদীতে কুমীর আছে, কিম্বা কখনও কখনও আসে এই রকমই শুনেছিলাম। নদীটি ছোট হলে কি হবে, খুব স্রোতস্বিনী। মনে আছে একদিন কলাগাছের গুঁড়ি নিয়ে ভাসতে ভাসতে এমন টানের মুখে গিয়ে পড়েছিলাম যে, ফিরে আসতে পারব কিনা রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল।

নৌকায় করেও আমরা বেড়াতে যেতাম, বহু দূরে যে-সব জমিদারী অঞ্চল আছে সেই সব দেখতে। কাছারিবাড়ির একদিকে ছিল ছোট একটি উপাসনা-মন্দির, ঠাকুরদাই করিয়েছিলেন। তারি পাশের জমিতে পরিবারের যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের সারি সারি শ্বেতপাথরের সমাধি রয়েছে। প্রতিটি সমাধির উপর মার্বেল পাথরের ফলকে তাঁদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং কোনও গানের দুচারটি করে লাইন লিখিত। ঠাকুরদা, ঠান্দি ও আমাদের বাবা এঁদের সমাধি দেখলাম। বাবার সমাধির গায়ে লেখা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনগুলি—

"সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে কতদিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার এত আপনার এবার সে কথা বোঝালে।
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে এনেছ তোমারি দুয়ারে"—

মায়ের কাছে শুনেছি এ-গানটি নাকি বাবার ভারি প্রিয় ছিল। ঠাকুরদা পোষ্যপুত্র ছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা অঞ্চলে তিনি 'ভক্ত কালী-নারায়ণ গুপ্ত' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ঠাকুরদা ছিলেন অতি সাধারণ সাধা-সিধে ধরনের সহজ সরল নিরহঙ্কার মানুষ. ভগবত্‌ভাবে সর্বদা ভরপুর হয়ে থাকতেন। সংসারে সকলের সঙ্গে সকলের মাঝে থাকলেও প্রায়ই তাঁকে শ্মশানে ধ্যানস্থ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেত। 'ভাবসঙ্গীত ও ভাবকথা' নামক তাঁর উচ্চাঙ্গের সাধনসঙ্গীত ও সাধনার কথার একটি বই আছে। গ্রাম্যভাষা ও গ্রাম্যসুরে রচিত গানগুলি। সেইসব গান শুনলে বা পড়লে বোঝা যায় তিনি কোন্ রসে বিভোর হয়ে ছিলেন। আমি তাঁর কয়েকটি গানের কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

'মরি! দেখলে সেরূপ আর কি ভোলা যায়।
ভুলি ভুলি ভুলতে নারি শয়নে স্বপনে জাগায়।
নয়নজলে নয়ন অন্ধ প্রায়, দেখি দেখি আর দেখি না জলে ভরে যায়—
সে যে লুকোচুরি খেলা করে, [illegible] দিয়ে আবার লুকায়,
এগো দরদী, আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
(তুমি) ডাকো গো নাহি, হাঁকো গো নাহি, আপ্‌নে আপ্‌নে চলে যায়।
এগো এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়
যে উদাসে সংসার ছেড়ে বাইরে লয়ে যায়।—
এ যে সংসার ধর্ম, ধর্ম আর সংসার দুইয়ে এক করে ফেলায়।'

'পরশে রস রসেতে বশ, বশ বিনা সকলি নীরস,
যেই রসে হয় সকল সরস এমন মধুর চাক্ রে।'—

'নাই-এর ঘরে নাই কিছু নাই, আছের ঘরে সব আছে রে
থাকলেই সে হাস্যবদন, না থাকলে কে হাসতে পারে।'—

'তুমি সুন্দর অতি সুন্দর, তুমি সুন্দরের খনি
পরশে তোমার হই হে সুন্দর পরশি' পরশমণি।'

'এ নাম যোগীজনার যোগসাধনের ধন
যে যোগে বিয়োগ পালায় দূরে
যোগী নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ হয়ে
ও তার আনন্দ কে বারণ করে।'—

'নামে শুক্নো তরু মুঞ্জরিবে
মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে
এসব প্রেমের খেলা দেখে শুনে হইবি অবাক রে।
হৃদে পরশ নলে হাজার ক'লে
কেবল ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে,
ফলে এই রসে না রসিক হলে মানব জীবন ফাঁক্ রে।'

'দেল্‌গাড়ি দেখলি না হায় হায়
সদা তোর মধ্য দিয়ে আসে যায়।
গার্ড তার আপনি ভগবান সদা সঙ্গে সঙ্গে যান
বাঁকা তেরি ঘুর ফির নাই, সিধাসিধি টান
নাই লাল কি সাদা সব্‌জে নিশান, দিশায় দিশায় দিশা পায়।'

ঠাকুরদা যেমন প্রজাবৎসল ছিলেন তারাও তেমনি তাঁকে ঠিক দেবতার মতন পুজো করত। এত ভক্তি-বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুরদার নামে তারা বীজ বপন করত। শুনেছিলাম বালক বয়সে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে একবার একটি আমবাগানে আম পাড়তে গিয়ে দেখেন নানা গাছে নানা রকম আম ফলে আছে। দেখে নাকি সঙ্গীদের বলেন, 'দেখ্ ঈশ্বর বেটার কি স্মরণশক্তি রে! গেল বার যে-গাছে যে-নমুনায় আম ঝুলাইয়াছিলেন এবছরও ঠিক ওই গাছে ওই নমুনার আম ঝুলাইয়াছেন!'—

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে বহুপ্রকার উৎপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে

হয়। ব্রাহ্মধর্ম ছিল তাঁর প্রাণ এবং ব্রহ্মনাম ছিল তাঁর সাধনার মন্ত্র। একদিকে যেমন এই ধর্মপ্রচারকল্পে, বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তিনি গ্রামে গ্রামে দলবল নিয়ে নগর-সংকীর্তন করে বেড়াতেন, দূর-দূরান্তরে চলে যেতেন পায়ে হেঁটে, অন্যদিকে আবার সকলের সঙ্গে বসে ঠাট্টা-তামাশা রঙ্গ-রসিকতা খুব করতেন।

একবার একটি নিমন্ত্রণসভায় ঠাকুরদাও ছিলেন। বেগুনভাজা পাতে দিতে তিনি বলে ওঠেন, 'বাইগুনগুলার ত দেখি বড় বীচি।'

শুনে এক ভদ্রলোক তাঁকে সংশোধন করে বলেন—'রায়মশায়ের (ঠাকুরদাকে সকলে 'রায়মশায়' বলত, কেননা ওঁদের জমিদারী উপাধি ছিল 'রায়') আর বাঙাল কথা গেল না। 'বেগুন' বললে যত মিষ্টি শোনায় 'বাইগুন' বললে কি তা হয়?'

ঠাকুরদা হেসে উত্তর দিলেন—'মিষ্টি শোনানই যদি উদ্দেশ্য হয় বেগুন কেন প্রাণনাথ বললে তা আরও মিষ্টি শোনায়!'—

ঠাকুরদা যতদিন বেঁচে ছিলেন মা প্রতিবছরই আমাদের নিয়ে একবার তাঁর কাছে ঢাকায় যেতেন। শুনেছি, আমাদের বাবার যখন অকালে মৃত্যু হয় তখন ঠাকুরদা তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃতদেহের সামনে শান্ত অবিচলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলেছিলেন—'হে ভগবান, তুমি যে দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে এজন্য কৃতজ্ঞতা ভরে তোমাকে প্রণাম করিতেছি।'—বন্ধুবান্ধব যাঁরা ভাবিত হয়েছিলেন এতবড় পুত্রশোক তিনি কেমন করে সহ্য করবেন ইত্যাদি, তাঁরা তাঁর ওই ভাব দেখে বুঝেছিলেন সত্যই তিনি ভগবানের পথে কতটা অগ্রসর হয়েছেন। পিসিমাদের কাছে আর একটা গল্প শুনেছিলাম, এতই ভালো লেগেছিল। এই গল্পটির মধ্যে তাঁর কি সুন্দর নম্র অমায়িক দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঠাকুরদা নাকি একবার কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিলেন আমাদের জ্যাঠামশায়ের কাছে। ট্রেনের কামরায় বন্ধুসহ একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁরাও কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন। ভৃত্যের সঙ্গে আমাদের ঠাকুরদাকে কথা বলতে শুনে বুঝতে পারেন যে, ঠাকুরদা বাঙাল। তখন ভদ্রলোকটি তাঁর বন্ধুকে বললেন যে, একটি বাঙাল পাওয়া গেছে, সমস্ত পথ বেশ আমোদে কাটানো যাবে।

ভদ্রলোকটি ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করেন—'আপনি কোথায় যাবেন?'

ঠাকুরদা—'কৃষ্ণনগর যাইতেছি।'

প্রশ্ন—'কেন কৃষ্ণনগরে যাচ্ছেন?'

উত্তর—'আমার পোলার কাছে যাইতেছি।'—

প্রশ্ন—'আপনার পোলা কি করেন ?'

উত্তর—'কালেক্টরিতে কাজ করেন।'

প্রশ্ন—'নাম কি তাঁর ?'

উত্তর—'কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।'

প্রশ্ন—'মশায় আমরা ত কালেক্টরের কাছারিতে ঐ নামে কাউকে জানি না।

উত্তর—'না, মান্‌সে তারে কে.জি. গুপ্ত কয়।'

তখন ভদ্রলোকটি ঠাকুরদার সামান্য কয়টি কথায় তাঁর পরিচয় পেয়ে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চান। এবং স্টেশনে যখন কালেক্টর সাহেবের গাড়ি ও চাপরাশী আসে তখন ঠাকুরদাকে গিয়ে সানুনয় অনুরোধ করেন যে, আমার বাড়ি পদধূলি না দিয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।—ঠাকুরদার স্বভাবই এমনি শিশুর মত সরল ছিল।

তাঁর বিষয় কিছু লিখব ভেবে লিখিনি, লিখতে লিখতে আপনি কেমন ওই দিকে চলে গেল লেখার ধারা। ঠাকুরদার বিষয় শুধু একটু ছুঁয়ে যেতে পারলাম। কেননা, দু'চার কথায় তাঁর মত ঋষিতুল্য জীবনের কিছুই বলা যায় না, বলা হয়ও না। তাঁর জীবন ছিল একটি জীবনের মত জীবন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন সাধক, ভগবৎপ্রেমিক। তাঁর ধর্ম ছিল ভগবানের ধ্যান। কর্ম ছিল ভগবানের নাম, রূপ ছিল ভগবানের ভক্তি।

আমাদের বংশ-পরিচয় :

পিতামহ—ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত। দেশ ঢাকা, গ্রাম ভাটপাড়া।

পিতামহী—অন্নদাসুন্দরী দেবী।

জ্যাঠামশায়—সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (সার কে. জি. গুপ্ত), আই. সি. এস।

পিতৃদেব—ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত, সিভিল সার্জেন।

বড়কাকা—গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

ছোটকাকা—বিনয়চন্দ্র গুপ্ত, শিল্পী।

বড়পিসিমা—হেমন্তশশী, ডাক্তার রামপ্রসাদ সেনের পত্নী
(অতুলপ্রসাদ সেনের জননী)।

মেজপিসিমা—চপলা, প্রফেসর শশিভূষণ দত্তের পত্নী।

সেজপিসিমা—সৌদামিনী, জগৎমোহন দাশের প্রথমা পত্নী।
(চারুচন্দ্র দাশ ব্যারিস্টারের জননী)

ধনপিসিমা—সরলা, জগৎমোহন দাসের দ্বিতীয়া পত্নী
(সত্যজিৎ রায়ের মাতামহী)

সোনাপিসিমা—বিমলা, সত্যরঞ্জন দাশের (ব্যারিস্টার ও Empire of India Life Assurance Company-র প্রতিষ্ঠাতার) পত্নী।

ছোটপিসিমা—সুবালা, বিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী (ডাক্তার অজয়কৃষ্ণ আচার্য গাইনকলজিস্ট ও বিজয়কৃষ্ণ আচার্য আই. সি. এস., এঁদের জননী)

বহুদিন বাদে, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে আর একবার এই কাওরাইদ আসি। দাদা বিলাত থেকে ফিরে এলে দাদার বিয়ে মা এইখান থেকে দেন। আমরা সকলে মিলে সেবার যা আনন্দ করেছিলাম। তাতাবাবুরা (সুকুমার রায়) সব অনেকে ছিলেন, হাসিয়ে হাসিয়ে মারতেন সবাইকে। কলকাতায় এলে মামাবাবু, মামিমা, নিজের পুত্রবধূকে যেমন দিয়েছিলেন, আমাদের দাদার বৌকেও সেরকম হীরের নেক্‌লেস ব্রেসলেট দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

১৯১৩ সালের ১৪ই মে মামাবাবু পিতৃঋণ শোধ করে স্বনামধন্য হলেন। মা তখন আমাদের দুই বোন ও দাদাকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়িতে ছিলেন। ঋণমুক্ত হয়ে মামাবাবু মামিমাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। এসে মাকে প্রণাম করলেন। ভাইবোনের সেদিনের এই মিলনে ফুটে উঠেছিল যে জিনিস, যে চিত্র, তা সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি রইল কথার অতীত হয়ে। দিদিমা দাদাবাবু বেঁচে থাকতেই মামাবাবু পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।

সনাতন হিন্দুধর্মেই ছিল মামাবাবুর প্রকৃত আস্থা। তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তাঁকে ব্রাহ্মসমাজে থাকতে হলেও আসলে মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একটি সত্যকারের হিন্দু। হিন্দুধর্মের যেটি প্রাণ সেইটি তিনি বুঝেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তার ডালপালাকে আশ্রয় না করে একেবারে মূলকেই আশ্রয় করেছিলেন। প্রকাশ্যে যখন নিজেকে হিন্দু বলতে আরম্ভ করেন তখন ব্রাহ্মসমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ একজন তাঁকে এসে বলেন—'তুমি তাহলে তোমার পিতার ধর্ম রাখলে না!'

উত্তরে মামাবাবু তাঁকে বলেন, 'পিতার ধর্ম রাখাই যদি পুত্রের ধর্ম হয় তবে আমার পিতা কখনও তাঁর পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করতেন না।'

মামাবাবু বড়মেয়ে সোনার বিয়ে যখন হিন্দুমতে দেবেন স্থির করেন, তখন চারিদিক কালো করে তাঁর নিন্দা-অপবাদের তুমুল ঝড় ওঠে। বিপক্ষদলেরা সব দল-বেঁধে লেগে গেলেন বিরোধিতা করতে। হিন্দুসমাজের গোঁড়া মতাবলম্বী

যাঁরা তাঁরা এই অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে যত পারলেন বিষ ছড়াতে ছাড়লেন না। আর ব্রাহ্মসমাজের সমাজপতিরা উঠে দাঁড়ালেন ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত বিচারে তাঁদের রায় দিতে। সে-সব একটা ব্যাপার। কি তিক্ততারই যে সৃষ্টি হয়েছিল!

মামাবাবু ভয়ে পিছু হটবার পাত্র নন। যা করতে চাইতেন তা নির্ভয়েই করতেন। তাই এতসব বাধাবিঘ্নের সম্মুখে ঘোর বিরোধিতার উঁচিয়ে থাকা খাঁড়ার নিচে মহাসমারোহে শালগ্রামশিলার সামনে হিন্দু শাস্ত্রমতে মেয়ের বিয়ে দিলেন। সোনার বিয়েতে কি বাড়ি-সাজানোই হয়েছিল। ওবাড়ির কারো বিয়েতেই আর অমন হয়নি। বরফের উঁচু উঁচু পাহাড় কি সুন্দর যে লাগছিল। খরচের আদি-অন্ত ছিল না। হিসেবের কথা মনে হবার মতন কথাই যেন নয়। খরচের স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা ভেসে চলেছিলাম আনন্দের হিল্লোল তুলে।

কোন রকম গোঁড়ামি, দেখেছি মামাবাবু একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার উনি দারুণ বিপক্ষে ছিলেন। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিকে সমাজে যা করে একঘরে, কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে তা তাঁর বুকে কাঁটার মত বিঁধত। মানুষের প্রতি মানুষের এই মনোভাব, এই অবিচার কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, মন তাঁর বিদ্রোহ করে বসত, প্রতিকারের জন্যে ব্যাকুল হত, উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত। জাতিগত অধিকারে তাদের মধ্যে কেউ উচ্চ, কেউ নীচ, কেউ নমস্য, কেউ অস্পৃশ্য—শ্রেণীবিভাগের এই পার্থক্যকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। বলতেন, মনুষ্যত্বের এতবড় অপমান ভাবা যায় না। তাই ঠিক কবে থেকে,—কোথা থেকে—কেন, কি কারণে, এই জাতিভেদের উদ্ভব, সূচনা, তাই খুঁজে বার করার জন্যে তাঁর পরিশ্রম ও চেষ্টার শেষ ছিল না। এই সব পতিত অস্পৃশ্য পদানত জাতিদের কি করে উদ্ধার করা যায়, টেনে তোলা যায়, এ যেন তাঁর একটা ব্রতর মত ছিল। তাদের জন্যে তাঁর প্রাণ কত যে কাঁদত, কতই কাতর হত, সে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তাছাড়া গ্রামের গরীব চাষীসম্প্রদায়, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আমাদের অন্ন জোগায় তাদের নিজেদের যে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না, অঙ্গের বস্ত্র জোটে না, এই জন্যেও তাঁর দুঃখের অবধি ছিল না। কিভাবে, কেমন করে এদের অভাব মোচন করা যায়, মনুষ্যসমাজে এরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, এই সমস্যার সমাধান নিয়ে তাঁকে ভেবে আকুল হতে দেখেছি। এই সম্বন্ধে যখন কারও সঙ্গে আলোচনা করতেন, দেখতাম অশ্রুসজল হয়ে উঠত গভীর চোখ দুটি। মনে হত যারা শুনছে তাদেরও

চোখ জলে ভরে আসত। তাই ভাবি, এমন করে দুঃখীর দুঃখ কজনের বুকে বাজে, কজন পারে পরের দুঃখ এইভাবে অনুভব করতে। বলতেন—'আমি যদি মরি, তবে চণ্ডালের ঘরে জন্মগ্রহণ করব, ছোটজাতকে তুলব, বড় করব।'—

আজ মনে পড়ছে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে গাওয়া রামকমলের গানের এই লাইনটি—

'শতকোটির বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।'

কোনও জিনিস কিনবার সময় আমরা দরদস্তুর করছি দেখলে ভারি অপছন্দের সুরে বলতেন—'গরীবের দু'চার আনা পয়সা মেরে তোদের কী এত লাভ!'—এই ছিল তাঁর মনোভাব। এইভাবে ছোটখাটো জিনিসে ধরা পড়ত এই সব শ্রেণীর লোকেদের প্রতি কতখানি অনুকম্পা, কতখানি দরদভরা সহানুভূতি ছিল তাঁর অন্তরটি জুড়ে। প্রকাশ হয়ে পড়ত তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনের অনেক কথা, মনের গহনে কোথায় রয়েছে কোন্ ক্ষত, কোন্ ব্যথা। দরিদ্র 'নারায়ণ', দরিদ্র-সেবা 'নারায়ণ-সেবা'—এই আমরা শুনতাম তাঁর মুখে। দিদিমা-দাদাবাবুর শ্রাদ্ধে মামাবাবু দরিদ্রসেবার আয়োজন করেছিলেন। কাঙালী-ভোজন হয়েছিল। এতবড় কাঙালী-ভোজনের ব্যাপার আগে আর দেখিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছিল খাবার আয়োজন। দিদিমার শ্রাদ্ধ হয়েছিল পুরুলিয়ার বাড়িতে; দাদাবাবুর কলকাতায়, রসা রোডের বাড়িতে। মনে হচ্ছে চোখে দেখছি যেন সেই দৃশ্য—সেই দলে দলে ভিখারীদের ক্রমাগত যাওয়া আসা। যে যত পারছে খাচ্ছে এবং বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। দাদাবাবুর শ্রাদ্ধে প্রত্যেককে ল্যাংড়া আম দেওয়া হয়েছিল।

আমরা সব পরিবেশন করছিলাম, যত চেয়েছে তত দিয়েছি। মামাবাবু নিজে ঘুরে ঘুরে ভোজনরত কাঙালীদের দেখে বেড়াচ্ছিলেন। দরিদ্রসেবার মহানন্দে তাঁর মুখ সেদিন উদ্ভাসিত দেখেছিলাম। আজ ভাবি বাল্যকাল থেকে কাছে ছিলাম বলে কত ছোটোখাটো দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর কত দিক এবং কত দিক থেকে তাঁকে দেখবার ভাগ্য ও সুযোগ লাভ করেছিলাম। চিনেছিলাম কতটুকু তা জানি না শুধু জানি তাঁর কথা ভাবতে আজো মন ভরে ওঠে। অন্তরে জমা হয় কী এক অনুভূতি যেন। যবে থেকে তাঁকে দেখেছি—সেই যখন ছোটটি ছিলাম তখন থেকেই তাঁর হাসিতে দৃষ্টিতে মনে হত কী যেন আছে, কী যেন আছে, কী যেন পেতাম, কী যেন দেখতাম। তাঁদের সংসারে যখন এলাম,—তখন তিনি চলেছেন অভাবের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে, তখনই প্রথম দেখি তাঁর মুখে সেই হাসি, চোখে সেই চাহনি—অদ্ভুত সে অনুভূতি, আজো

স্পষ্ট রয়েছে তার স্মৃতি। তারপরে যখন উঠলেন ধন মান ও যশের উচ্চশিখরে তখনও দেখেছি সেই হাসিই, সেই চাহনিই। আবার যখন সর্বত্যাগী হয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে দেশে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তখনও দেখেছি একই হাসি, একই দৃষ্টি। কোনও অবস্থায় তার ব্যতিক্রম দেখিনি। কী সে জিনিস বুঝিনি, মন সেদিক দিয়ে যায়ওনি, শুধু এইটুকু মাত্র বুঝতে পেরেছিলাম যে, তা এমন কিছু যা জীবনে ভোলা যায় না, যার স্পর্শ লেগে থাকে, ছেয়ে থাকে অন্তর। যেদিন সেই হাসি সেই দৃষ্টি চিরতরে নিভে গেল, সেদিন মনে হয়েছিল অন্ধকার পৃথিবী। মনে হয়েছিল—পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল—দাঁড়াবার কিছু পাচ্ছি না—এরপরে বুঝবার অসুবিধা রইল না ওই হাসি ওই দৃষ্টির তলে কী ছিল, কোন্ জিনিস আমাকে ঘিরে থাকত ঘিরে রাখত।

ভাঙার দিকে যেমন গড়ার দিকেও তেমন নিজের অক্লান্ত কর্মক্ষমতাকে মামাবাবু ঢেলে দিয়েছিলেন। দেশের মঙ্গল, তার উন্নতি করতে হলে আগে চাই পল্লী-জীবনের আমূল সংস্কার, চাই অর্ধমৃত প্রায় তার জীবনটিকে পুনর্জীবিত করে প্রাণধর্মী করে তোলা। তিনি বলতেন দেশের প্রাণ এরাই, এরা জাগলে দেশ জাগবে। দেখতাম পদানত জাতির মুমূর্ষু প্রাণকে কেমন করে মামাবাবু তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণশক্তির দ্বারা বাঁচার মত বাঁচতে পারার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন। চোখে জ্বলে উঠত জ্যোতি, কণ্ঠে ধ্বনিত হত ডাকার মত ডাকতে পারার প্রাণঢালা সেই স্বর যখন আহ্বান করে বলতেন—'ওঠো তোমরা, তোমাদের পায়েই ত রয়েছে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি—জাগো, —আপনাকে জাগাও'—

উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত--

বিবেকানন্দের মত তাঁর কণ্ঠেও কতবার এই বাণী উত্থিত হয়েছে সাধারণে মাঝে উত্থানের অদ্ভুত শক্তি জাগরিত করে, সঞ্চারিত করে। আশ্চর্য ছিল তাঁ বলবার ক্ষমতা, আর অসাধারণ ছিল তাঁর আকর্ষণী শক্তি।

॥ আট ॥

মামাবাবু শুধু কর্মীই ছিলেন না। কবি এবং সাহিত্যিক দুই-ই ছিলেন কাব্যসাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তাঁর মু

শুনেছি শৈশব থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। এবং অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এ দুটি জিনিস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তবে বড় সাধের এই সাহিত্যসাধনা তাঁর ইচ্ছেমত তিনি করতে পারেননি। কেননা, তা করতে হলে যে অবকাশের দরকার তা তাঁর জীবনে কতটুকুই বা মিলেছিল। তবু সাহিত্যসেবা তিনি কোনও দিনই একেবারে বাদ দেননি।

মামাবাবুর 'সাগরসঙ্গীত' যখন প্রথম বের হল, আমাদের সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার প্রথম কবিতাটি, আজো দেখছি মুখস্থ আছে—

'আজিকে পাতিয়া কান
শুনেছি তোমারি গান
হে অর্ণব, আলোঘেয়া প্রভাতের মাঝে,
একি কথা একি সুর
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে।

বই ছাপাবার আগে মামাবাবুর মুখে 'সাগরসঙ্গীত-এর অনেক কবিতাই শুনেছি। শুধু নিজের কবিতা নয়, কবিতা পড়তেও তিনি খুব ভালোবাসতেন, আর পড়তেনও ভারি চমৎকার। বড় বড় ইংরেজ কবিদের কবিতা, বাংলা নামকরা কবিদের অনেক কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী. এসব আমরা মামাবাবুর মুখে কত যে শুনেছি। এখানে পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের 'সাগরসঙ্গীত'-এর ইংরেজী অনুবাদ 'The Songs of the Sea' পড়ে মনে হল 'সাগরসঙ্গীত' নতুন করে শুনলাম! আমার এই ছোট্ট 'স্মৃতির খেয়া'য় সাগরসঙ্গীতের দোলা দিয়ে যাব, এই হল মনের সাধ। তাই তাঁর কয়েকটা মূল বাংলা কবিতা ইংরেজী অনুবাদ-সহ তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কি অপূর্ব অনুবাদই করেছেন শ্রীঅরবিন্দ! কেই বা পড়ে এসব, কজনই বা খোঁজ রাখে।

'হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ি,
দাঁড়াও ক্ষণেক, তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্রকরে
করিতেছে টলমল্ কি যে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ যদি, হে রহস্যময়ি,
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।

দাঁড়াও ক্ষণেক, আমি অর্ণবের গানে
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব,
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব।
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা,
ছন্দোবদ্ধ পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা।'

O thou unhoped-for elusive wonder of the skies,
Stand still one moment ! I will lead thee and bind
With music to the chambers of my mind
Behold how calm today this sea before me lies
And quiverieg with what tremulous heart of dreams
In the pale glimmer of the faint moonbeams.
If thou at last art come indeed, O mystery, stay
Woven by song into my heart-beats from this day,
Stand, goddess, yet ! Into this anthem of the seas
With the pure strain of my full voiceless heart
Some rhythm of the rhythmless, some part
Of thee I would weave today, with living harmonies
Peopling the solitude I am within.
Will thou not here abide on that vast scene,
Thou whose vague raiment edged with dream haunts us and flees,
Fulfilled in an eternal quiet like this sea's ?

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর তাল লয় মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়াভরা আমার পরাণ!
সাড়া পাই আমি তারি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলোমাঝে, সাঁঝের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনার,
অপূর্ব এ মিলনের গোটা কত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে।

I have no art of speech, no charm of song,
Rhythm nor measure nor the lyric pace.
No words alluring to my skill belong.
Now in me thought's free termless heavens efface
Limit and mark ; upon my spirit is thrown
(The shadow of infinity alone.)

I at thy voice in brilliant dawn or eve
Have felt strange formless words within my mind
Then my heart's door wide to the cry I leave
And in thy chant I seek myself and find.
How some few hymns of the dim union sweet
Have filled my soul, I bring them to thy feet.

—Songs of the Sea—VIII

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ !
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় ।
ওগো যন্ত্রি, আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে !

All day within me only one music rings.
I have become a lyre of helpless strings,
And I am but a horn for thee to wind,
O vast musician ! Take me, all thy mind
In height, in gloom, by day, by night express.
On solitary shores, in lonely skies,
In night huge sieges when the winds blow wild,
In many a lovely land of mysteries,
In many a shadowy realm, or where a child
Dawn, bright and young, sweet unripe thought conceives.
Or through the indifferent calm desireless eves,

In magic night and magic light of thee,
Play on the instrument, O Soul, O Sea.

—Songs of the Sea—IX.

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে !
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে !
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী ।

What is this play thou playest with my life ?
How hast thou parted lids mind held so stiff
Against the vision, that like a bud shut long
My mind has opened only to the song,
And all my life like a yearning flower
Hued perfumed, quivering in the murmurous power,
And all my days are grown an infinite strain
Of music sung by thee, O shoreless main !

—Songs of the Sea—X.

রাখ, রাখ রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই ।
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে ।
রাখ রাখ, শান্ত হও, ওগো রণশ্রান্ত,
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত ।
আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি ত আপনা হতে দিতেছিনু ধরা ।
জেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে,
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে ।
পাতিনু তোমার তরে শয্যা সুশীতল,
তোমার চরণতলে রবে শান্তিজল ।

আমার পরাণ লয়ে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হতে দিতেছিনু ধরা।

O loud blind conqueror, stay the furious car,
Lay down thy arrow. Evening from afar
Comes pacing with her smooth and noiseless step
* And dusk pale light of quiet in heavens of sleep.
Stay then thy chariot, rest! O tired with strife!
O wearied soul of death! Conqueror of life!
Vain was thy war O Lord, my soul to win;
Myself was giving myself without that pain.
Now I will light the evening lamps for thee,
My soul with vesper hymns thy fane shall be,
And I will spread a cool conch for thy sleep
What need to conquer me, hadst thou to strive,
Who only long'd unasked myself to give?

—Songs of the Sea—XIX

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি,
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণমহিমায়।
বাহিরের গীত রবে বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে।—
দিও মোরে ল'য়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে!
হে সিন্ধু, হে বন্ধু, ওগো তাই আসিয়াছি
সে গীত বাজিবে বলে আমি জাগিয়াছি।

None is awake in all the world but I,
While the sun hesitated, I upstood
And met thee in a grandiose secrecy
To leave my soul in thy majestic flood.

Be outword songs be outward nature's part!
These are for all and their tones may hear.
There is a strain that fills the secret heart.
Reveal that music to my listening ear.

Therefore, O sea, O friend, I came alone,
That I might hear that rapture or that moon.
—Songs of the Sea—XXV

এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই,
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই!
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার,
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার।
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল।
খুঁজেছি তোমারে কত রঙের মাঝে
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে,
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

This shore and that shore,—I am tired, they pall.
Where thou art shoreless, take me from it all.
My spirit goes floating and can find opperessed
In the unbanked immensity only rest.
Thick darkness falls upon my outer part,
A lonely stillness grips the labouring heart,
Dumb weeping with no tears to ease the eyes.
I am mad for thee, O king of mysteries.
Have I not sought thee on a million streams,
And wheresoever the voice of music dreams,
In wondrous lights and sealing shadows caught,
And every night and every day have sought!
Pilot eternal, friend unknown embraced,
O, take me to thy shoreless self atlast.'—
—Song of the Sea—XL

'সাগরসঙ্গীত' সেই অনাদি অনন্ত যিনি তাঁরই সঙ্গীত। তাঁরই গান গেয়েছেন কবি, বাঁধতে চেয়েছেন তাঁকেই ছন্দে। তাঁরই চরণে জানিয়েছেন

প্রাণের প্রণাম, জানিয়েছেন প্রার্থনা, দিতে চেয়েছেন আপনাকে। কাছে থেকে, দূরে থেকে আপন অন্তরে বাহিরে, রূপে রসে বর্ণে গন্ধে স্পর্শে কবি কিভাবে দেখেছেন সেই অপ্রকাশের নানা প্রকাশ, উপলব্ধি করেছেন সেই ভাগবত সত্তাকে, সেইসব অনুভূতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিটি কবিতায়। বুঝতে পারা যায় সাগরের বুকে কোন্ সঙ্গীত তিনি উন্মুখ হয়ে শুনছেন, কোন সঙ্গীত তাঁকে মুগ্ধ করছে, কোন সঙ্গীতের আকুল টানে নোঙর ছিঁড়ে পাগল হিয়া তাঁর ভেসে চলে যেতে চাইছে, মানা মানছে না। শেষে দেখা যাচ্ছে—এপার-ওপার। এই দোটানার মাঝে আর তিনি পারছেন না। অন্তরাত্মা তাঁর অধীর হয়ে উঠেছে এপার-ওপারের অতীত সেই অপার অনন্তের জন্যে। সেই সুরই আমরা শুনতে পাই এই লাইনগুলির মাঝে—

'এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।'—

এই প্রার্থনাই 'সাগরসঙ্গীতে' কবির শেষ প্রার্থনা এবং শেষ কবিতা। সারা জীবনই তিনি ভগবানকে খুঁজেছেন। অন্তরে তাঁর ডাক শুনেছেন। সুখে দুঃখে জীবনের সব কিছুর মধ্যে তাঁকে চেয়েছেন। অনুভব করেছেন তাঁর স্পর্শ, তাঁর অস্তিত্ব। লাভ, ক্ষতি, সবই ছিল তাঁর কাছে, ভগবানের অশেষ করুণা, আশীর্বাদ। তাঁর কাব্যে আমরা দেখতে পাই জীবনের পাতায় পাতায় ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কত চিত্র, শুনতে পাই তাঁকে চাওয়ার কত সুর। কত ব্যাকুল আকৃতি। আর দেখতে পাই ভগবানকে কতখানি আশ্রয় করে আছে তাঁর সত্তা। 'অন্তর্যামী'র কবিতাগুলি তাঁর সবই সেই ভগবদ্‌মুখী ভাবের অভিব্যক্তি। দু'একটা তুলে দেখছি—

'সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই
তুমি জানো দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারেই শুধু……'

'যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাব
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই।'

'যখনি দেখিতে নারি অন্ধকার আসে
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তারই চারিপাশে,
কোথা হতে জলে দীপ সম্মুখে তাহার।
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার।

যখনি হৃদয়যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হতে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর,
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।'

'যেখানেই থাকো নাথ, আছ তুমি, আছ তুমি
সকল পরাণ মম তোমার চরণভূমি।
ভাবনা ছাড়িনু তবে এই দাঁড়াইনু আমি
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী।'

শেষের কবিতাটির শেষ দুটি লাইনে ভগবানে আত্মসমর্পণের সুর খুবই সুস্পষ্ট। ভগবানের জন্যে যে তাঁর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়তে থাকে তা আমরা জানি। কেননা, শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি এসেছিলেন যোগসাধনার জন্যে। তখন তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেন যে, রাজনীতি ও যোগসাধনা দুটো একসঙ্গে করা সম্ভব নয়। শুনেছি, পরে তিনি পাবনার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার কিছুকালের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন।

রসা রোডের বাড়িতে সে-সময় খুব পালাকীর্তন হত, সেই সময় দেখা যেত মামাবাবুর ভক্তিভাব। সেই সময়ই তাঁর এতবড় দিকটি আমাদের চোখের একেবারে সামনে চলে আসে। তখন থেকে তাঁকে ভক্তিরসে ডুবে যেতে দেখা যায়। পদাবলী কীর্তন শুনতে শুনতে দেখেছি কেমন যেন হয়ে যেতেন—ভাবে বিভোর, দুই চোখে ধারা বইছে,—একটা অভিভূত অবস্থা। মনে হত তাঁর অন্তর ভরে আছে কান্নায় কান্নায়। অনেক সময় মুখে এমন ভাব প্রকাশ পেত যে, তিনি এজগতে আছেন তা বোধ হত না। কোন্ এক রসসাগরে ভেসে চলেছেন সেই রসের রসিক হয়ে। তৃপ্তিতে, আনন্দে কখনও মুখে হাসি, কখনও চোখে জল। ঐসব আত্মহারা ভাবের মাঝে ফুটে উঠত তাঁর ভক্তিরূপটি। ভক্তিমার্গে হয়ত বা তিনি তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। কত সময় এমনও দেখেছি যে, কারও সঙ্গে কথাবার্তায় বা গল্পে লিপ্ত আছেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে কেউ একজন কিছু না ভেবেচিন্তে কথার ছলে কীর্তনের এক লাইন হয়ত গেয়ে উঠেছে, মামাবাবুর কানে সে সুর যাওয়া মাত্র অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, মনে হত সেখানে আর তিনি নেই, ডুব দিয়েছেন গভীরে কোথাও। কীর্তন তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করত, পরশমণির মত ছুঁতে-না-ছুঁতেই ভিতরটি সোনা হয়ে যেত। বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'— গানটি আমি

বহুবার মামাবাবুর কাছে গেয়েছি। শুনে ওঁর যেন আর আশ মিটত না। সেটা যে আমার গাওয়ার জন্যে তা নয়। গানটিই উনি খুব ভালোবাসতেন। বিশেষ করে এই লাইনটি—'গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার।' —বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ছিলেন মামাবাবুর সবচেয়ে প্রিয় কবি। শ্রেষ্ঠ কবি বলে তাঁকেই স্থান দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের কথা বলতে আরম্ভ করলে যেন আর শেষ হত না। বলতেন তাঁর কবিতা যে স্তরে পৌঁছেছে। সে স্তরে আর কোনও কবির কবিতা পৌঁছতে পারেনি। চণ্ডীদাসের কত গানের কথা, কত গানের কত লাইনের কথা তাঁর মুখে একবার নয় বহুবার শুনেছি। তার মধ্যে কতগুলি আমাদের জানা হয়ে গেছে। তাছাড়া সেইসব গানের মধ্যে অনেক গান আবার কীর্তনেও গাইতে শুনেছি, তাই মনে আছে। মামাবাবুর সেইসব প্রিয় গানগুলির কয়েকটা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি। তাঁরই কাছে শুনে শুনে এসব গান আমাদেরও খুব প্রিয়, খুব পরিচিত হয়ে ওঠে এবং আমরাও বেশ রস পাচ্ছি বুঝতে পারি।

(১)

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।' —চণ্ডীদাস

(২)

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।' —চণ্ডীদাস

(৩)

'মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা

কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহিরে দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা
এ দেশের কথা ও দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা।' —চণ্ডীদাস

(৪) 'চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।'

(৫) 'পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ।' —চণ্ডীদাস

(৬) 'জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপতি ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
না বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল।' —বিদ্যাপতি

(৭) 'আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরাশিশু কতদিন গেলা

নিধুবন রমণী রঙ্গরসে মাতল

তোহে ভজব কোন বেলা।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি অবসান

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত

সাগর লহরি সমান।' —বিদ্যাপতি

(৮) 'নব রে নব নিতুই নব

যখনি হেরি তখনি নব।' —চণ্ডীদাস

(৯) 'কভু না জানিনু কভু না শুনিনু

শ্যাম কাল কি গোরা।' —চণ্ডীদাস

এই সবের এক-একটি লাইন ধরে মামাবাবু চলে যেতেন গভীরে ডুবুরীর মতন, যখন সেই গভীরের বস্তুর বিষয় কখনও অল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও বিশদ করে বলতেন, তখন পেতাম নতুন আলো, দেখতে পেতাম একটা নতুন দিক। মনে হত নতুন কিছুর মধ্যে যেন জেগে উঠলাম। বৈষ্ণব মহাকবিদের কাব্য-সম্পদের কথা বলবার সময় মামাবাবুকে দেখতে হত, এমন অভিভূত হয়ে বলতেন, চোখে ভাসে তাঁর মুখ-চোখের সে ঔজ্জ্বল্য। তিনি যেন এসবের তুলনা খুঁজে পেতেন না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বড় বড় কবিদের কথাই যে শুধু বলতেন, তা নয়, সব বৈষ্ণব কবিদের কবিতা নিয়েই তিনি তন্ময় হয়ে আলোচনা করতেন। তবে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কাউকেই মনে করতেন না। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের কোথায় পার্থক্য এবং চণ্ডীদাস কেন এত বড়, সেইসব এত সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতেন, যখনি শুনতাম তখনই মনে হত নতুন কিছু শুনছি, এত ভালো লাগত।

॥ নয় ॥

বাংলার গীতিকাব্যে বৈষ্ণব গীতিকবিতাকেই মামাবাবু যথার্থ গীতিকাব্য মনে করতেন এবং শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্য, বাংলার গীতি-কবিতা এবং তার মাঝে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর স্থান কোথায় এইসব সম্বন্ধে

তিনি অনেক লিখেছেন এবং অনেক কথাই বলেছেন। 'নারায়ণ' নামে যে মাসিকপত্রখানি বের করেছিলেন এবং নিজে যার সম্পাদক ছিলেন, সেই 'নারায়ণ'-এ এইসব অনেক লেখা তাঁর বের হয়েছিল। সেইসব অনেক লেখা 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'কবিতার কথা', 'বাংলার গীতিকবিতা', 'রূপান্তরের কথা' ও 'দেশের কথা' থেকে আমি তাঁর কিছু কিছু লেখা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি যাতে তাঁর বক্তব্যের মাঝে তিনি পরিষ্কার হয়ে ওঠেন। তাই তুলে দেবার সময় আমি অন্য কিছু ভাবছি না, তাঁর লেখার পেছনে তাঁকে দেখানোই আমার আসল উদ্দেশ্য।

এইসব লেখা এখন আর কারও হাতের সামনে আছে বা থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। এবং খুঁজলে পাওয়া যাবেই এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কি না তাও জানি না। ভাবলে দুঃখ বোধ করি যে, এমন সব জিনিস এরই মধ্যে মুছে যেতে বসেছে! অবশ্য সবই জানা কথা যে, কালের গর্ভে এমন কতই চলে গেছে, কতই যাবে—তবু কোথায় যেন বাজে। বহুদিন বাদে তাঁর লেখাগুলি সব পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়ে এই কথাই ভাবছিলাম, কত দিকই যে তাঁর দেখতে পাইনি, বুঝতে পারিনি, ধরতে পারিনি, সে সবই চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরল, তুলে ধরল—অবাক হয়ে দেখলাম সমস্তই যেদিক দিয়ে দেখি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন দেখতে পেলাম আধ্যাত্মিকতা তাঁর সত্তার কতখানি জুড়ে আছে, আর তা কিভাবে তাঁর জীবনের মূলে রসসঞ্চার করে চলেছে, যার ফলে সব কিছুই তিনি দেখছেন তারই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। কলাকলা ইত্যাদি সবেতেই দেখতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রসসৃষ্টি, এবং মূল্য নির্ধারণ করেছেন তারই স্তর হিসেবে। জ্ঞানাবধিই দেখেছি ভগবানে তাঁর একান্ত বিশ্বাস, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে যে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছেন, এইভাবে ধরেছেন, আধ্যাত্মিকতা যে তাঁর জীবনের এতখানি, এত বড় অবলম্বন, —এতটা ঠিক বুঝিনি, হয়ত বা বুঝবার সে ক্ষমতাও ছিল না। এইবার তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। এইসব লেখা বেশির ভাগ কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি কলাকলা সম্বন্ধে।—

"আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্তি। ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলনমাধুর্য্য।"

"এই মানবপ্রাণের অন্তরভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ

কল্পকলার রাজ্য। তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণজীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম। বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, এবং বিশ্লেষণ ভাঙিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমেই এই মিলনের মহামন্ত্র। ......কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ-চিন্তামণির 'মণিকোঠায়' মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সে অতল স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।"

"বাঙ্গালাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা, তাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেননা বাঙ্গালাদেশ সাধন-ধর্মের উপরই সকল কর্মের, সকল সৃষ্টির,—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।"

"বাঙ্গালাদেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনার রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে। তাই আমি সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাঙ্গালাদেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।...গীতিকবিতার প্রাণ কবির আত্মানুভূতিকে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে।"—

"কেহ কেহ বলেন যে, কল্পকলার সাধনা এ-জীবনে শুধু বিলাসের জিনিস, ইহার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্মজীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কল্পকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কল্পকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনাই সার্থক হইতে পারে না।"

"যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গালা আপনার আত্মবিকাশ আপনি আপনি করিবে। আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধিলাভ করিবে, আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।......চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা।"—

"এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।......মনস্তত্ত্ববিদ বলেন, এই

রূপতৃষা স্বভাব, সৃষ্টিরক্ষার জন্তে মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলেন, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার।"

"কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না! · কল্পকলা সেই দিব্যদৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।…জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প। এ-মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে আঁধারও আছে।…এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ।"

"চম্পক বরণী হরিণ নয়নী
চলে নীলশাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর"—

ইহাই বাঙলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে,— ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক আর নাই জানুক বুঝুক আর নাই বুঝুক আমার বাঙ্গালার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহা-মিলনমন্দিরে পূজা যে চলিতেছে ; বাঙ্গালার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গালার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গালার কবি চণ্ডীদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।"

"শুধু নায়ক নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনু-সন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়-মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

"তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করা অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সেদিন

হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া আছে। এ মিলন অপূর্ব, গভীর, অনন্ত। দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ব, অনন্ত। বুঝিলাম যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই শান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

"জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই, —যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ। এ জীবন লইয়াই কবিতা।"

বাংলাদেশকে মামাবাবু কত ভালোবাসতেন, বাংলাদেশ ছিল তাঁর গৌরবের বস্তু, প্রাণের প্রাণ। বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে তিনি কখনও শুধু 'বাঙ্গালা' বা 'বাংলাদেশ' বলতেন না, সমস্ত প্রাণের দরদ নিঙড়ে বলতেন 'আমার বাঙ্গালা'। নিজের প্রিয়পরিজনের মতই বাংলাদেশ তাঁর প্রিয় ছিল। তার থেকে একটুও কম নয়। এখানে তাঁর বাংলাদেশ সম্বন্ধে লেখা তুলে দিচ্ছি,— কি গভীর ভালবাসা আর কি গভীর প্রাণের টান!—

"বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেইসত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, অজ্ঞানে, অধর্মে স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গালার ঢেউখেলানো শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্র-কানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীরপ্রাঙ্গণ, বাঙ্গালার নদ-নদী, খাল বিল, বাঙ্গালার মাঠ, বাঙ্গালার ঘাট, তালগাছঘেরা বাংলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলেভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার তুলসীপত্র, বাঙ্গালার গঙ্গাজল, বাঙ্গালার নবদ্বীপ, বাঙ্গালার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গালার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, বাঙ্গালার কাশী, বাঙ্গালার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালার জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য,

সেই অখণ্ড অনন্ত প্রেরণারই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই সেই প্রাণ-ধারায় ফুটি
ভাসিতেছে, দুলিতেছে!"

"আমার বাঙ্গালার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর
কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গালার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামচেলাঞ্চল
ময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী যার বুকে অবিরা
নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্মি-বিস্ফুরিত সাগরের দিগন্ত-মুখরি
হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জটি, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা'র আমা
একহাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম
আকাশ-উজ্জ্বল তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্‌দিকে ছড়াইয়া দিতেছে! আশেপাশে
ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলন
আছে। সেই বাঙ্গালা মায়ের ছেলে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সে
বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে আ
চোখে জল আসে।"—

"বাঙ্গালীর যে জীবন্তপ্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালায় প্রাণে
প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি
বাঙ্গালায় যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি, বৌদ্ধের
বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে
প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল।······রামপ্রসাদের
সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম
কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি—

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে
পশিল।' বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়, বিবেকানন্দের
বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক,
খৃষ্টান হউক বাঙ্গালী বাঙ্গালী।···অনন্ত নীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি
বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি; আমার বাঙ্গালা
সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম; মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার
বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। সেরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ

বিশিষ্ট, সে অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, —আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।"—

"আত্মার অনন্তের পরতে পরতে যে দীপ জ্বলিয়া আলোক বিকিরণ করে, সে আলোকের ধর্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। .....সেই দীপ একদিন বাঙ্গালার কবি চিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোঠায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলো মুসলমান যুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল। সেই দীপ এই ফেরঙ্গ যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গালার গানের জন্ম।"

তাই ভাবি এমন করে যিনি বাঙ্গালাদেশকে ভালোবেসেছিলেন, বাংলার জন্যে বাঙ্গালীর জন্যে এতখানি বুক ভরা ভালোবাসা, দরদ নিয়ে আজীবন যিনি এমন করে ভেবেছেন, লড়েছেন, যে-দেশ যে-জাতিকে তুলবার জন্যে, বড় করবার জন্যে সকল দীনতা, অপমানের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবনকে এমন করে মরণের মুখে তুলে দিলেন, সেই বাঙ্গালাদেশ, সেই বাঙালী কেমন করে এত সহজেই এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেল। ভাবলে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠে।

॥ দশ ॥

মামাবাবু-মাসিমার শোবার ঘরের একদিকে বসবার আয়োজন ছিল। সেইখানে রাত্রে রোজ ঘরোয়া বৈঠক বসত। সব কাজকর্মের পর মামাবাবু অবসর হলে এসে ওইখানে বসতেন। সেই সময় চলত নানারকম কথাবার্তা, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তার মধ্যে কাব্য শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কিছুই বাদ যেত না। ভারি চিত্তাকর্ষক হত সেইসব কথাবার্তা। মাসিমারা সকলেই যোগ দিতেন। সভা বেশ জমে উঠত। শুধু যে আত্মীয়রা থাকতেন তা নয়, অন্তরঙ্গদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত থাকতেন। সে-সময় মামাবাবুর অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনবার সুযোগ পাই। বঙ্কিমসাহিত্য ছিল মামাবাবুর প্রাণ, এত অসম্ভব ভালোবাসতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মামাবাবু বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র

শুধু একজন ব্যক্তি নহেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ, বঙ্কিমসাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য।"

বঙ্কিমগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আনন্দমঠ' ছিল মামাবাবুর সবচেয়ে প্রিয় বই। মাসিমার (অমলা দাশ) মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের গান শুনতে মামাবাবু ভারি ভালোবাসতেন। আমরাও তাঁর কয়েকটি গান মাসিমার কাছে শিখেছিলাম। তার মধ্যে এখনও দেখছি—'এ জনমের সঙ্গে কি সেই জনমের সাধ ফুরাইবে', 'সাধের তরণী আমার', 'মেঘ দরশন আশে চাতকিনী ধায় রে', 'মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী' গানগুলি বেশ ভালোই মনে আছে। স্বদেশীযুগের বহু গান মামাবাবু যতবার শুনতেন ততবারই দেখতাম তাঁর চোখদুটি যেন জলে উঠত। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্'-এর 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম'—এই জায়গাটি শুনলেই উনি এত অভিভূত হয়ে পড়তেন, এতই ওঁকে নাড়া দিত—যেন থাকতে পারছেন না—এই রকম মনে হত। সে-সব সময় মামাবাবুর যে রূপ চোখে দেখেছি তা জীবনে ভুলবার নয়। মনে আছে রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার,' 'আমার সোনার বাংলা,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল',—এইসব গান মাসিমা যখন গাইতেন, মামাবাবুর চোখের পাতা কেবলই ভিজে উঠত। বাঙ্গালাদেশের কিছু হলেই ওঁর ভালো লাগত। এত নরম মানুষ ছিলেন মামাবাবু, অন্তরটি ছিল ভাবের ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া। বৈষ্ণবপদাবলী ছাড়াও অন্যান্য কীর্তন বা কীর্তনাঙ্গ কিছু, কিম্বা ভাবরসাত্মক অথবা ভক্তিমূলক গান হলেই তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। মুগ্ধ তন্ময় হয়ে শুনতেন। কত সময় ভাবান্তর হত দেখেছি।

আদালত থেকে ফিরে এসে প্রায়ই মামাবাবু 'টেনিস' খেলতেন। আমরাও খেলতাম। এইসময় মামাবাবুর জুনিয়র ব্যারিস্টাররাও কেউ কেউ খেলতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীরচন্দ্র রায়, যিনি পরে মামাবাবুর বড়মেয়ে মোনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুধীরকে নিয়ে মোনাকে সবাই কি ঠাট্টাই তখন করতেন। দাদাবাবু তখনও বেঁচে। মোনাকে দেখলেই রঙ্গ রসিকতা করতে ছাড়তেন না। মামাবাবুকেও দেখতাম মোনাকে ঠাট্টা করছেন। মামাবাবু খুব সুরসিক ছিলেন। ভালো রসিকতার তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সমঝদার। খুব হাসতে ও হাসাতে পারতেন নানারকম হাস্যরস সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঠাট্টা সম্পর্কীয় কাউকে কাছে পেলে মামাবাবু যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন—এত ঠাট্টা করতেন আর সে-সব এমনই ঠাট্টা যে, আমরা অনেক সময় পালাবার পথ খুঁজতাম। তিনি যে অমন সব ঠাট্টা-তামাশা করতে পারেন তা অন্য সময় তাকে দেখলে কে বলবে!

১৯১৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী (৬ই ফাল্গুন) রসা রোডের বাড়িতে আমার বিবাহ হয়। মামাবাবু বিয়ে দেন। সেই থেকে মামারবাড়িতে মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে সদাসর্বদা একসঙ্গে থাকায় সেই অনাবিল আনন্দের পর্বে ছেদ পড়ে। মামারবাড়ির সকলের সংসর্গ, মামাবাবুর সান্নিধ্য, সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এই সময় থেকেই মামাবাড়ির সংস্রব ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকে, তাদের সব কিছুর সঙ্গে আগের মত যোগাযোগ রাখাও আর যেন তেমন সম্ভব হত না। ফলে জীবন হয়ে আসে শূন্যময়। মামারবাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছুকেই বিসর্জন দিতে হয়েছিল, যার মূল্য আমার কাছে ছিল অমূল্য।

মনে আছে বিয়ের পরের দিন সকালে মামাবাড়ির সুবৃহৎ বৈঠকখানার ঘরে আমাদের পিসতুতো ভগ্নীপতি তাতাবাবু (সুকুমার রায়) কি রকম জমিয়েছিলেন তাঁর 'চলচিত্তচঞ্চরী'র পাণ্ডুলিপি আবৃত্তি করে এবং তাঁরই অন্যান্য লেখা থেকেও কিছু কিছু পাঠ করে। এখনও কানে বাজে সেই অসাধারণ একেবারে নিজস্ব ঢঙে এই লাইনগুলি তাঁর পড়া—

'কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে
হেসে হেসে কেশে কেশে
এত ভালো বেশে বেশে
টাকা মেরে পালালি শেষে'—

ঘরভরা লোক সেদিন কি হাসিটাই হেসেছিলেন। কি অদ্ভুত ঢঙই যে ছিল তাতাবাবুর এসব পড়ার! ওরকম আর শুনিনি। কবিতার যে লাইনগুলি আমি লিখলাম তার মধ্যে হয়ত ভুলত্রুটি থাকতেও পারে। কেননা সেই সেদিনে তাঁর মুখে যা শুনেছিলাম তারই যা মনে আছে তাই থেকে লিখলাম। তখনও তাতাবাবুর 'আবোল-তাবোল' বা 'হ-য-ব-র-ল' বের হয়নি। পরে 'আবোল-তাবোল' বাজারে বের করার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার রায় বাংলাদেশের মন কেড়ে নিলেন। অমন-প্রতিভা আর হল না।

কাশীতে গিয়ে দেখি হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলারা তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে বিয়ে-সাদিতে নিজেদের মধ্যে নিজেরা বেশ নাচগান করে থাকে। বাল্যাবধিই নাচের দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক। আমাদের সমাজে তখন এসব ইচ্ছে আমল পেত না, কাজেই মনের ইচ্ছে প্রকাশ করিনি। কাশীতে এসে এদের নাচ দেখে ইচ্ছে হল নাচ শিখবার। ভাবলাম আরম্ভ তো

করে দেওয়া যাক, পরে দেখা যাবে। অবশ্য এ-নাচ কোনও উচ্চাঙ্গের নাচ নয়, অতি সাধারণ ঘরোয়া নাচ, গান গেয়ে গেয়ে এরা নাচে।

আমার একটি অতি অন্তরঙ্গ বান্ধবী, বাঙালী হলেও তার শ্বশুরবাড়িতে এসব নাচগানের খুব চল ছিল, তাদের সঙ্গে নেচে নেচে সে বেশ নাচতে শিখেছিল। এই বান্ধবীটি ব্রাহ্মণকুলমহিলা, শ্বশুরবাড়ি আগ্রার কাছে এটাওয়ায়। কাশীতে পিত্রালয়, বোধহয় দু'তিন পুরুষ ধরে এঁরা কাশীবাসী। এঁরই কাছে নিভৃতে আমি নাচ শিক্ষা করি। কাশীতে জর্মনসিল্ভারের সুন্দর সুন্দর সব পায়ের অলঙ্কার পাওয়া যেত, আমি একজোড়া নূপুর কিনে নিলাম ঘুঙুরের কাজ চালাবার জন্যে। ঘুঙুরের একটু বেশি জোর হয়ে গেলেই স্বামী আপত্তি করতেন তাঁর প্র্যাকটিসের ক্ষতি হবার আশঙ্কায়। কাজেই একটু সতর্ক হয়েই সব সারতে হত।

কলকাতায় এসে মামাবাবুকে নাচ দেখালাম। মামাবাবু ত মহাখুশি। বিশেষ করে এমন সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে আমি যে বের হতে পেরেছি এইটেই মামাবাবুর মনকে খুব তৃপ্তি দিয়েছে বুঝলাম। সন্ধ্যার দিকে সময় পেলেই আমার নাচ দেখতে চাইতেন। মামিমা এক-একদিন আমায় সাজিয়ে দিতেন। বসবার ঘরে আমি নাচলাম সেই সব হিন্দী গান গেয়ে। একদিন অতুলদার (অতুলপ্রসাদ সেন) 'বঁধু ধর ধর মালা পর গলে'—গানটির সঙ্গে নাচ তৈরী করে নেচেছিলাম। গানটির কথা মনে হলেই মনে পড়ে মামাবাবুর খুশিতে উপচেপড়া সেই মুখটি। তাঁর কাছে কিছু করে খুব আনন্দ পাওয়া যেত। এত অল্পেতে খুশি হতেন, এবং এক খুশিমনে সে-সবে যোগ দিতেন, রাজীও হয়ে যেতেন ভারি সহজেই। আমার মা প্রথমে আমার নাচ দেখতে চাইতেন না, বোধকরি তাঁর সংস্কারের কোথাও বাধত। শেষে মামিমা একদিন জোর করে নিয়ে এসে মাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'দিদি, আপনি আগে দেখুন ত, তারপরে বলবেন,'—নাচ দেখার পর বোঝা গেল মায়ের ভালোই লেগেছে। তখন মামিমা খুব খুশিমনে মাকে বলতে লাগতেন—'দেখলেন ত দিদি, আপনার আপত্তি কত অবান্তর!'

তারপর নাচের সময় দেখা যেত মা-ও এসে বসেছেন, সংস্কার তাঁর ভেঙে গেছে। মামাবাবু খুব উৎসাহ দিতেন, বলতেন, 'সোনা বেবী'কে তুই শিখিয়ে নে।'

একসময় ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়া মতাবলম্বী কর্তৃপক্ষরা পেশাদার নটনটীদের অভিনয় দেখা, বিশেষ করে বাংলা রঙ্গালয়ে গিয়ে থিয়েটার দেখা, বাঈজী

প্রভৃতিদের গান শোনা বা নাচ দেখা—এসব অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মত প্রকাশ করতেন। এবং বাড়িতে এসব করাও যে খুব পছন্দ করতেন তা নয়,—ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় ইত্যাদি করা সম্বন্ধে ততোধিক আপত্তি তুলতেন। শুনে মামাবাবু একদিন হেসে বলেছিলেন, 'বাইরেও দেখতে পাবে না, বাড়িতেও করতে পাবে না, তাহলে ত দেখছি এত বড় একটি আর্টকেই একেবারে নাকচ করে দিতে হয়!'

মেজমামা প্রফুল্লরঞ্জন দাশ কোন্ সালে বিলাত গেলেন তা আমি ঠিক জানি না, কেননা আমি তখন খুব ছোট। তবে তাঁর নবপরিণীতা ইংরেজপত্নী যেদিন পুরুলিয়ায় এসে গাড়ি থেকে নামলেন সেই দিনটির কথা বিশেষ করে মনে আছে। আইন পড়তে মেজমামা বিলাত যান। পাস করে বিলাতেই এই মহিলাটিকে বিবাহ করেন। বিয়ের পরই স্ত্রীকে আগে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এসে পৌঁছান তারপরে।

এই বিদেশিনী নারী তাঁর ভারতীয় শ্বশুরকুলের সকলকে এত সহজেই আপন করে নিলেন, আর এমন অনায়াসে তাদের সঙ্গে নিজেকে এক করে মিশিয়ে দিলেন যে, কারুরই আর মনেও থাকত না যে, তিনি বিদেশিনী! পরিবারের সকলেরই হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে মেজমামিমা তাঁদের বেশ অন্তরঙ্গ আপনজন হয়ে রইলেন। খাওয়া, পরা, চালচলন সবই তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলের মতনই হয়ে গিয়েছিল। তফাত বিশেষ কিছু মনে হত না। তবে কথাবার্তা বরাবরই ইংরেজীতেই বলতেন।

মনে আছে পুরুলিয়ার বাড়িতে তাঁর এসে পৌঁছানোর কথা। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাকে দেখে এবং তাঁর ব্যবহারে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। নতুন মামিমাকে সাজিয়ে দেওয়া হল আমাদের বাঙালীদের মতন করে পিছনে খোঁপা বেঁধে, শাড়ি ও পায়ে আলতা পরিয়ে। হাতে লোহা ও সিঁথিতে সিঁদুর দিদিমা তার আগেই পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে—আমি যতদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখেছি বরাবর শাড়ি পরতেই দেখেছি। মেজমামিমার কথা ভাবতে গেলে তাঁর শাড়িপরা চেহারাটিই ভেসে ওঠে। শাশুড়ীকে তিনি খুব বেশিরকম ভালোবাসতেন ও ভক্তি করতেন। আমাদের দিদিমা ত লেখাপড়া জানতেন না। মেজমামিমাকে বলতে শুনেছি—'লেখাপড়া না শিখেও যদি আমার শাশুড়ীর মত এমন মানুষ হয় তবে আমার মেয়েদের আমি লেখাপড়া শেখাব

না।'—এতখানি শ্রদ্ধার চোখে শাশুড়ীকে দেখতেন।

দিদিমার আর মেজমামিমার কথাবার্তা বেশ হত, একজন বলে যেতেন বাংলাতে (খাস বাঙাল ভাষায়), আর একজন বলে যেতেন ইংরেজীতে, আশ্চর্য এই যে, দু'জনকে দু'জনের বুঝবার কোনও অসুবিধাই হত না। ভারি সুন্দর সম্বন্ধ ছিল এঁদের পরস্পরের।

ছেলেপিলে মাত্রই মেজমামিমা এতই ভালোবাসতেন যে, সচরাচর এরকম দেখা যায় না। তাদের কোনরকম অযত্ন অবহেলা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁর সেবা করবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ, ওটা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। পরের বাড়ি হলেও গিয়ে রোগীর সেবা করে আসতেন। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ও তাঁর দেখিনি, এবং রোগীর সেবা সম্বন্ধে আপন-পর ছিল না। শুনেছি, একটি বসন্তরোগীকে ওইভাবে পরের বাড়িতে গিয়ে সেবা করে আসতেন। আমারও একবার কাশীতে খুবই অসুখ হয়, সর্বক্ষণ অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। মেজমামিমা খবর পেয়েই চলে এলেন আমাদের কাশীর বাড়িতে এবং যা করলেন তার তুলনা নেই, মায়ের মতন করে সব ত করলেনই, খরচপত্রও যা করলেন তারও হিসেব হয় না। মাতৃত্ব দিয়ে গড়া ছিল হৃদয়টি তাঁর।

গরীব দুঃস্থদের প্রতি তাঁর যে সহৃদয়তা, যে মমতা দেখেছি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুনলে গল্পের মতন মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। অল্পহাতে মেজমামিমা কাউকে কিছু দিতে জানতেন না। তাঁর দেওয়ার কি রকম হাত ছিল তারই দু'-একটি ঘটনা বলছি। দার্জিলিং-এ অতি দূরসম্পর্কীয় একটি পরিবার বাস করতেন। অবস্থা তাঁদের সচ্ছল ছিল না। মেজমামিমা নিজের বাড়ির জন্যে রোজ তরিতরকারি মাছ-মাংস ইত্যাদি যা বাজার করতেন, এমন কি বিলিতি টিনের খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত ঠিক সেই রকম সব এবং ততখানি টুকরি বোঝাই করে তাঁদের বাড়ির জন্যেও প্রতিদিন কিনে পাঠাতেন। নিজেদের জন্যে যা-কিছু ওঁর প্রয়োজন হত, উনি ভাবতেন অন্যেরও বুঝি সেই সবই প্রয়োজন, সেইজন্যে নিজে যা কিনতেন অন্যকে দেবার সময়ও ঠিক সেই রকম সব কিনে দিতেন।

আমাদের একটি মাসতুতো বোনের স্বামী জাপানে রাজনৈতিক কোনও সন্দেহজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্যে বোনটিকে তিনটি শিশুসহ কলকাতায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়। মেজমামিমা বহু চেষ্টার পরে তার ঠিকানা জানতে পেরে তিনটি শিশুসহ তার যা-কিছু দরকার সব পাঠাতেন। ভারতীয়কে

বিবাহ করার জন্যে তাঁর পিতৃকুল কোনও দিন আর তাঁকে গ্রহণ করেননি। শেষজীবন তিনি প্রায়ই বিলাতে কাটাতেন, কিন্তু বাপেরবাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আর কখনও হয়নি। তাই ভাবি, জীবন থেকে পিতৃকুলকে এমন করে মুছে ফেলা বড় কম স্বার্থত্যাগের কথা নয়। বিলাত থেকে ফিরে এসে মেজমামা কিছুকাল সপরিবারে কলকাতায় রসা রোডের বাড়িতে ছিলেন। তখন কয়েক বছর ওঁদের সঙ্গে একসঙ্গে সব বেশ গুলজার করে থাকা গিয়েছিল। পরে আরো কিছুদিন হেষ্টিং স্ট্রীটের একটি বাড়িতে থেকে ওঁরা পাটনা চলে যান। মেজমামার তিনটি ছেলেমেয়েই কলকাতা থাকতেই জন্মায়।

পাটনায় যাবার পর মেজমামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী পি.আর.দাশ নামে সুপ্রসিদ্ধ হন। এই দিকে মেজমামা মামাবাবুর মতই কৃতী ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে তাঁর উপার্জন মামাবাবুর চাইতে বেশি ছাড়া কম ছিল না। আমরা জানি তাঁর দৈনন্দিন ফি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞানে মেজমামা ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মত আইনশাস্ত্রজ্ঞ তখন আর কেউ ছিল না। মেজমামার মৃত্যুর পর কাগজে বের হয় "He was the greatest jurist of our time."

উপায়ও যেমন প্রচুর করেছেন খরচও তেমন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুই হাতে করেছেন। দান-ধ্যান মেজমামারও যথেষ্টই ছিল। তবে তার দ্বারা দেশ যে কিভাবে কতদূর উপকৃত তা জানি না।

বৈষ্ণবসাহিত্যে মেজমামারও মামাবাবুর মত গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলা যায়। শেষজীবনে তিনি তাইতে মশগুল হয়ে থাকতেন। কণ্ঠিধারণ করেন ও প্রাণগোপাল গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। সে-সময় তাঁর বাড়িতে রোজ কীর্তন হত। মেজমামা খুব ভালো ইংরেজী কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতার বই 'The Moth and the Stars' ইংরেজী কাব্যরসিকদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

জীবদ্দশায় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উমা (রণজিৎ গুপ্ত, আই. সি. এস-এর পত্নী) অল্প বয়সেই দুটি ছেলে রেখে মারা যায়। এবং তারপরে তাঁর সহধর্মিণী আমাদের মেজমামিমা, ও এক বছরের মধ্যেই একমাত্র পুত্র শঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সব নিদারুণ শোক বহন করেও জীবনের শেষপর্যন্ত আইন-ব্যবসায়ের কাজ চালিয়ে যান। যখন অসুস্থ হতেন তখন যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণই বোঝা যেত যে, তিনি অসুস্থ, নইলে একবার কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালে মামলার কাজে এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে, বুঝতেও পারা যেত না

তিনি অসুস্থ। ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৮৪ বছর বয়সে পাটনার বাড়িতে জ্যেষ্ঠাকন্যা গৌরীকে (ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ডি. এম. ও-র পত্নী) রেখে পরলোকগমন করেন। মামাবাবুর অনেক গুণাবলী মেজমামার মধ্যেও ছিল। তিনিও ছিলেন খুবই অসাধারণ। তবে মামাবাবু মানুষ ছিলেন আলাদা, ভিন্ন স্তরের, ভিন্ন আধারের, ভিন্ন জগতের।

১৯১৭ সালে, আমার বিয়ের ঠিক পরের বছর, মামাবাবু রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্র্যাক্টিস অবশ্য তখনও ছাড়েননি। তখন থেকে তাঁর সান্নিধ্য বা সঙ্গ আমরা আর তেমন করে পেতাম না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে আমরা খানিকটা দূরে গিয়ে পড়লাম। যদিও দেখা হলেই হাসিতে স্নেহ ঢেলে দিতেন আগেরই মত।

রসা রোডের বাড়িতে তখন অন্য ধারা এসে গেছে। গেলে বোঝা যেত সেই পরিবেশ আর নেই। এঁদের জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন, আদর্শও অন্য, কাজেই জীবনধারা চলেছে সেই ছন্দে, পারিপার্শ্বিক পূর্ণ তারি প্রভাবে। সুখের নীড় ভেঙে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে এঁরা চলেছেন আরও মহান আরও মহত্তর প্রেরণাকে অনুধাবন করে। চলার ব্যাকুলতার চরণ এঁদের চঞ্চল, মনপ্রাণ সব উন্মুখ। চোখভরা তারই নেশা, তারই স্বপ্ন।

যখনই কলকাতা আসতাম তখনই দেখতাম মামাবাবু কাজের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। একে নিজের আইন-ব্যবসায়ের কাজ, তার উপর রাজনৈতিক কাজের অসম্ভব চাপ, কি করে যে তিনি এই দুই কূল মিলিয়ে চলতেন সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। নিত্য সভা-সমিতি, বক্তৃতাদি, ঘোরাঘুরি ছুটাছুটি হরদম্ লেগেই আছে। মামাবাবুর বক্তৃতা শুনে সে-সময় আমায় একজন বলেন —সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতায় মাতান, কিন্তু দেশবন্ধু বক্তৃতায় কাঁদান—কথাটি ভারি ভালো লেগেছিল।

রসা রোডের বাড়ির দ্বার তখন অবারিত উন্মুক্ত, জনস্রোতের বিরাম নেই। সর্বক্ষণ আবহাওয়ার মধ্যে কর্মকোলাহলপূর্ণ এমন এক চঞ্চলতা যে, মনে হত যেন ঝড় বইছে, আর তারি মাঝে মামাবাবু ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে চলেছেন উদ্দাম বেগে তার খুরের ধুলো উড়িয়ে—বুকে তাঁর থম্ থম্ করছে প্রচণ্ড শক্তি, প্রবল বেগ, আর চোখদুটি যেন দৃঢ়পণের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। মুখে কিছু না বললেও ওই চোখ, ওই অধরের রেখা ঘোষণা করছে—কোনও শর্তেই সন্ধি নয়, শুধু জয়, চাই জয়, পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বরাজ। সে-সময় মামাবাবুকে না দেখলে

বিশ্বাস করতে পারতাম না কোনও মানুষ এত পরিশ্রম করতে পারে। এত ব্যস্ততার ভিতরেও কিন্তু আমাদের কিছু হলে মামাবাবু সমান আগ্রহে এগিয়ে এসে যা করবার সব করতেন। কোনও কিছু তাঁর বাদ যেত না, কোনও কর্তব্য অবহেলা করতে পারতেন না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি যে, দায়সারাভাবে তাঁকে কখনও কোনও কিছু করতে দেখিনি, সব বিষয়েই ছিলেন পুরোপুরি আন্তরিক।

১৯২০ সালে, সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাতে সরলাদেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম্' এবং তাঁর রচিত 'অতীতগৌরব বাহিনী' সমবেত-সঙ্গীতে আমরা অনেকেই যোগদান করি ও কংগ্রেসমণ্ডপে বসে সেই আমি প্রথম গান করি। কংগ্রেস সম্বন্ধেও সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পরে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তারপরেই আমরা চরকা কাটতে আরম্ভ করি, ও সেই থেকে খদ্দর পরা শুরু হল।

মামাবাবুকে খদ্দর পরতে দেখে খুবই কষ্ট হত। ৬০ ইঞ্চি বহরের অর্ডার দেওয়া শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ছাড়া অন্য কিছু যিনি পরেননি তিনি যখন ৪৪ ইঞ্চি বহরের খদ্দর পরতে লাগলেন তখনই মনে আছে প্রায়ই দেখতাম হাঁটুর কাছে কেবলই ধুতিটিকে ধরে টেনে নামিয়ে দিতে চাইতেন। বুঝতাম মুখে কিছু না বললেও অত খাটো ধুতিতে ওঁর অস্বস্তি হচ্ছে।

এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য হাসিঠাট্টার কথা মনে পড়ছে। আমাদের এক পিসিমার বাড়িতে বিকেলের দিকে মামাবাবু বেড়াতে এসেছিলেন। এই পিসিমা দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ। মামাবাবুর পরিধানে খদ্দরের ধুতি-চাদর ইত্যাদি ছিল, কিন্তু পায়ে ছিল বিলিতি জুতো। দেখে পিসিমা ঠাট্টা করে দেওরকে বললেন—'এদিকে ত খদ্দর পরেছ, পায়ে ত দেখি বিলিতি জুতো!'

মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'বিলিতি বলেই ত পায়ের নিচে রাখতে ভালোবাসি!' যেমন মন্তব্যটি তেমনি বলার ভঙ্গীটিও হয়েছিল উপভোগ্য। আমি সে-সময় পিসিমার কাছে ছিলাম, তাই এমন উঁচুদরের পরিহাসটি শুনতে পেলাম।

মামিমাকেও খদ্দর পরা দেখে আমাদের ভীষণ খারাপ লাগত। মামিমা কোনও দিনই সাজগোজ করতেন না, তবে মোটা কাপড় একেবারেই পরতে

পারতেন না, কষ্ট হত। সদাসর্বদা ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়িই তাঁকে পরতে দেখেছি। মিলের শাড়ি পর্যন্ত পরতেন না, ভারি লাগত বলে। কংগ্রেসের অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে বোধহয় চার-পাঁচমাস মাত্র মামাবাবু প্র্যাকটিস করেছিলেন। তার পরেই ছাড়লেন, তাঁর বিপুল আয়ের আইন-ব্যবসায়। সঙ্গে ছেড়ে দিলেন বহুদিনের অভ্যস্ত ঐশ্বর্যময় জীবনের বিলাসিতা সব, এমন কি তামাক খাওয়া পর্যন্ত। কোনও অসুবিধা ও কষ্টের কথা তাঁর মুখে শোনা যায়নি। কি ত্যাগ! কেবলই চোখের জল মুছেছি, এবং যারাই শুনেছেন তাদের সকলেরই একই অবস্থা! চারদিকে তখন মুখে মুখে শুধু তাঁর এই মহান ত্যাগের কথা, আর ধন্য ধন্য রব। সকলের জীবন গৌরবদীপ্ত করে মামাবাবু বরণ করলেন ত্যাগীর জীবন। তাঁর এই দৃষ্টান্তে ছোটবড় বহুলোক কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে যোগ দেন।

১৯১৯ সালে দাদা বিলাত থেকে ফিরে এলে মা আমাদের নিয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে রইলেন। সেই থেকে আমরা কলকাতায় এলে মায়ের কাছেই উঠতাম। দেখা করতে যাওয়া ছাড়া মামারবাড়িতে গিয়ে থাকা আর বড একটা হত না। মামাবাবুর ছোটমেয়ে বেবীর (কল্যাণী) বিয়ের সময়েই বোধহয় শেষ সব একসঙ্গে থেকে আমোদ-আহ্লাদ করেছি। বেবীর বিয়ে হয় স্যার সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বেবীর বিয়েতে আমরা সব খদ্দরের শাড়ি পরেছিলাম। তার ফুলশয্যার প্রণামীও বেশির ভাগ সব খদ্দরের শাড়ি দেওয়া হয়।

রসা রোডের বাড়িতে গেলে মন কেমন করত! কতদিনের কত ছোটবড় ঘটনার, কত যাওয়া-আসা কান্না-হাসির স্মৃতি বক্ষে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়ি। এর প্রতিটি ঘরের কাছে গেলে মনে পড়ত তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে অতীত তারই সব কথা। মনে হত এরা আমাদের কত আপন, কতকালের সব সঙ্গীসাথী, কত থেকেছি এদের এক একটির কাছে। সুখে দুঃখে রোগে শোকে আনন্দে উৎসবে, এরা আমাদের বুকে করে রয়েছে, স্থান দিয়েছে কোলে। এই বাড়ি 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' হবার পরে আমি আর দেখিনি। দিদিমা দাদাবাবু, মামাবাবুদের পুণ্য স্মৃতিভরা আমাদের আনন্দনিকেতন, দেশজননীর কত সুসন্তানের, কত ঋষি কবি ভক্ত জ্ঞানী গুণী মহাজনের পদধূলায় রঞ্জিত তীর্থসম সেই বাড়ি আমার নয়ন ও মনের পটে তেমনি আঁকা আছে। তার পরিবর্তিত রূপ যে আমাকে দেখতে হয়নি আমি তাইতে খুশীই।

ডিসেম্বর মাসের শীতের সকাল। কাশীর দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় একটু রোদ এসেছে দেখে আরাম করে সবে বসেছি, আমার স্বামী খবরের কাগজ হাতে ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন—'ভোম্বলকে অ্যারেস্ট করেছে। খুব গোলমাল চলেছে কলকাতায়।'

গোলমাল চলেছে জানতাম, তবে ঠিক এমন খবরটা আশা করিনি। খবর শুনে আমার যেন দম্ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'ভোম্বলকে কেন ধরল? কি ব্যাপার?'

বললেন—'ব্যাপার খুবই গুরুতর—' বলে মামাবাবুর নতুন অভিযান—ভলানটিয়ার-তালিকাভুক্ত হয়ে দলে দলে খদ্দর বিক্রি ও হরতাল ঘোষণা করতে যাওয়া—ইত্যাদি সব খবর সবিস্তারে উত্তেজিত হয়ে বলে যেতে লাগলেন, এবং ভোম্বলও যে ভলানটিয়ার হয়ে ওই দলে ছিল সেকথাও বললেন।

মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। কোথাকার জল এখন কোথায় গড়ায় তাই ভাবছি। কাগজ পড়ে বুঝতে বাকি রইল না যে, ব্যাপারটি বেশ ঘনিয়ে উঠেছে এবং পুলিশের অত্যাচার কি আকার ধারণ করেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় সে-দিনটি কাটল। পরের দিন সকাল থেকে যাকে বলে পথ চেয়ে বসে থাকা, তাই আছি। কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল মামিমা (বাসন্তী দেবী), ন'মাসিমা (ঊর্মিলা দেবী) এঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এঁদের গ্রেপ্তার নিয়ে কলকাতায় হুলস্থূল ব্যাপার। আমার মনের অবস্থাও শোচনীয়। কলকাতায় এইসব কাণ্ড চলেছে আর আমি কাশীতে বসে এইসব খবরের ধাক্কা সামলাচ্ছি।

খবরের কাগজে যখন সে-সব বিবরণ পড়ছি, চোখের জলে বারবারই কাগজের লেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একদিকে গর্বে বুক ভরে উঠছে, অন্যদিকে মনে হচ্ছে বক্ষভেদ করে শেল চলে যাচ্ছে ভিতরে। ভোম্বল, মামিমা, ন'মাসিমা সব জেলে আর আমি এখানে এমনি করে পড়ে আছি—অসহ্য মনে হচ্ছে। মামাবাবুকেও যে ধরবেই তা বোঝা যাচ্ছে। কি বীরদর্পে সব এগিয়ে যাচ্ছে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে। ভীষণ পরিণামও জেনেও, দলে দলে ছেলেরা আসছে, যোগ দিচ্ছে, মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, এই সব খবরে কাগজ ভর্তি। তারপর যা ভেবেছিলাম তাই—খবর বের হল বিনা পরোয়ানায় মামাবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সমস্ত বাংলাদেশে আবার আগুন জলে উঠল। আবার সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অত্যাচার শুরু হল, সেই নৃসংশতা, সেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়া। ছেলেদের সেই নির্ভীকতা, দলে দলে জীবন দেওয়া, জেলে যাওয়া। মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে অনেকেই ধৃত হলেন। সুবিধা পেলে,

সুভাষবাবুকে যে ওরা ছেড়ে দেবে না এ ত জানা কথাই, কাজেই তিনিও বাদ পড়লেন না।

প্রায় ৩'মাস বাদে মামাবাবুর বিচার হয়। বলা বাহুল্য তিনি পক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারে তাঁর ছয়মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত হচ্ছে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত-ভ্রমণ বয়কট উপলক্ষে হরতাল করা নিয়ে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী সারা ভারতব্যাপী হরতাল পালন এমনই অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত হয় যে, তাই দেখে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে, কংগ্রেসের এই ক্ষমতাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত সব আইনকানুন প্রয়োগপন্থা অবলম্বন করে দেশের সব বড় বড় নেতাদের কারারুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। দেশময় বিক্ষোভ ও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

মামাবাবু জানতেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তার এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেই। কেননা, কংগ্রেসের সবকিছুকে প্রচণ্ড আঘাতে বাধা দিতে এই চণ্ডনীতিই হচ্ছে ওদের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। আইন না থাকলেও আইন ওরা করে নেবে, ক্ষমতা ওদের হাতে। সেই ক্ষমতাকে অস্বীকার এবং অগ্রাহ্য করতেই মামাবাবু তাঁর অস্ত্র ধারণ করলেন—শুরু করলেন তাঁর এই নতুন অভিযান। তাঁর মতন অমন করে ব্রিটিশ-শক্তির সঙ্গে যুঝতে, অমন করে তেজের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে পদে পদে তাকে অস্বীকার করে বাধা দিয়ে নাড়া দিয়ে, বিধ্বস্ত করে তোলপাড় করতে আর কোনও নেতাকে অগ্রসর হতে দেখা যায়নি। এই পুরুষসিংহের থাবাকেই ব্রিটিশরাজের সত্যকারের ভয়।

কারাবাসের অল্পদিনের ভিতরেই মামাবাবু জ্বরে কাবু হয়ে পড়লেন। সেই জ্বরে তাকে ক্রমে দুর্বল করে ফেলছে আমরা শুনতাম। এত কষ্ট তাঁর কথা ভেবে। কিছুই ভালো লাগত না। মন ব্যাকুল হত খবরের জন্যে। ওই জেলেই তাঁর শরীর ভাঙতে শুরু হয়। এবং ক্রমেই রোগা হয়ে যেতে থাকেন। দেখার জন্যে প্রাণ ছটফট করত। যেতে যে পারছি না, তার জন্যে মনে কম অশান্তি হচ্ছে না। তখন নারীজাতি নিজের গৃহে নিজে পরাধীন। বার বার মনে পড়ছে মামাবাবুর সেই কথাটি আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে যে বলেছিলেন—'তোরও পায়ে বেড়ি পড়ল!'

জেল থেকে বের হবার পরে তাঁর যে ছবি কাগজে বের হয়, দেখতে কি রকম যে দাদাবাবুর মতন লাগছিল। বোধহয় বড় বড় দাড়ি রাখার জন্যে। খালাস পেয়েই কোনও দিকে না তাকিয়ে ওই ভাঙা শরীর নিয়েই আবার উদয়াস্ত

পরিশ্রমে মেতে গেলেন। বেবীর বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় এসে তাঁর চেহারা দেখে নিজেকে চেপে রাখতে পারিনি।

॥ এগারো ॥

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মামাবাবু সভাপতি মনোনীত হন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গয়ায় যাই। কাশী ছেড়ে আমরা সবে কলকাতা এসেছি। গয়া কংগ্রেসযাত্রী বহুলোক আমরা সেবার কলকাতা থেকে একসঙ্গে গিয়েছিলাম হৈ-হল্লোড় করতে করতে। এতলোক একসঙ্গে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সুভাষবাবু ছিলেন সহযাত্রী, সর্বদাই তাঁকে মামাবাবু-মামিমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। মামাবাবুর মেয়েরা কেউ আসতে পারেনি, ছেলে ভোম্বল, তার স্ত্রী সুজাতা ও ছোট্ট মেয়ে মিনু সঙ্গে এসেছিল। মামিমার দাদা সুরেন হালদার ও পত্নী বেলা দেবী ছিলেন। মিলি (সুপ্রভা মুখার্জি), মামিমার ছোটবোন (আমার মাসতুতো ভাই চারুচন্দ্র দাশের পত্নী) মাধুরী। বৌঠান ও তাঁর মেয়েরা সতী (রুমা গুহঠাকুরতার জননী), বিজয়া (সত্যজিৎ রায়ের পত্নী) সকলে ছিলেন। আরও বহুলোক দেখতাম যাদের আমি চিনি না। প্রতি স্টেশনে কি ভিড় মামাবাবুকে দেখবার জন্যে। তাদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে রেলের কামরাগুলি কেঁপে উঠছে।

গয়ায় ট্রেন থেকে নেমে জনসমুদ্রে ভেসে চললাম. তারপর যে মোটরে আমায় উঠিয়ে দিল তাতে উঠে চেয়ে দেখি সুরেনমামা, বেলামামিমা ওই গাড়িতে রয়েছেন। মামাবাবুর জন্যে সুসজ্জিত একখানা মস্তবড় গাড়ি, তাইতে মামাবাবু-মামিমার সঙ্গে ভোম্বল সুজাতা ওরাও আছে। আস্তে আস্তে শহর ঘুরে সভাপতির শোভাযাত্রা চলতে লাগল। মামাবাবুর গাড়ির ঠিক পিছনেই আমাদের গাড়ি যাচ্ছিল। পর পর গাড়িগুলি চলেছে লম্বা লাইন ধরে। তার উপর রাস্তার দু'পাশে বিপুল জনতার স্রোত চলেছে পাশেপাশে সমানে 'বন্দেমাতরম্' রব তুলে।

প্রথমে আমাদের নিয়ে তোলা হয় একটি দোতলা বাড়িতে। সেখানে একরাত থাকার পরে নিয়ে যাওয়া হয় একটি প্রকাণ্ড একতলা বাড়িতে। সেই বাড়ির অর্ধেকাংশে মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর দলবল আমরা রইলাম। বাকী অংশে

রইলেন সরোজিনী নাইডু। বাড়িতে অনেক ঘর, যে যেখানে পেয়েছে জায়গা করে নিয়েছে। সুজাতা তার শিশুকন্যা ও আমি রইলাম একটি ঘরে। মস্ত বারান্দা, এবং খাবার বড় ঘর থাকা সত্ত্বেও খাওয়াদাওয়ার সময় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দফে দফে খেতে বসতে হত।

মামাবাবুকে দেখতাম প্রায়ই সুভাষবাবুর সঙ্গে সকালে বিকেলে বাড়ির ভিতর দিকের বাগানে বেড়াচ্ছেন। মামিমাও কখনও সঙ্গে থাকতেন। কি হৈ হৈ করে যে আমাদের দিন কাটত। এই গয়া কংগ্রেসে মামাবাবু কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। উদ্দেশ্য কাউন্সিলে প্রবেশ করে ভিতর থেকে সরকারের সব কাজে কেবল বাধা দিয়ে সব বিষয়ে তাকে অপরাগ করে ধ্বংস করা। সেই সময় দেখেছিলাম পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর পরিবারবর্গকে। কংগ্রেসের দৌলতে জওহরলালকে কদিনই খুব কাছে থেকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও পাঁচ বছরের সুন্দর টুকটুকে মেয়ে ইন্দিরাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। এই নাতনীটি ছিল মোতিলালের গলার মালা। ভোম্বলের মেয়ে মিনুও ছিল মামাবাবুর ঠিক এমনি আদরের। পণ্ডিত মোতিলাল ও মামাবাবু, যশস্বী এই দুই আইনজীবীই খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে এঁদের দু'জনকে প্রায়ই একসঙ্গে একই পক্ষে কাজ করতে দেখা যেত।

গয়া কংগ্রেসে আমি, সতী দেবী সহ, 'বন্দেমাতরম্' গান করি। তখন মাইক ছিল না। গান কিন্তু চতুর্দিক থেকে পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। এই কংগ্রেসমণ্ডপে প্রথম দিলীপকুমার রায়কে দেখি, তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে একটি গজল্ গান গেয়েছিলেন মঞ্চের ঠিক সামনেই যাতায়াতের জন্যে রাখা পথটিতে একটি টেবিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। যেমন অপূর্ব কণ্ঠ, তেমন গায়কী ঢং, আমাদের আকর্ষণ করেছিল। মনে হয়েছিল এ ঢং-এর গান পূর্বে আর কোথাও শুনিনি। যখন শুনলাম তিনি সুভাষবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমরা গিয়ে সুভাষবাবুকে ধরলাম তাঁর বন্ধুটির গান আর একদিন শোনাবার জন্যে। কিন্তু সুভাষবাবু তখন কংগ্রেসের ব্যাপারে মেতে আছেন। কাজেই বেশি বিরক্ত করা গেল না। সরোজিনী নাইডুর ভাষণও শুনি এইখানেই প্রথম, কি অদ্ভুত ভালো যে লেগেছিল। গয়া কংগ্রেসে মামাবাবুর কাউন্সিলে প্রবেশ-প্রস্তাব গৃহীত হল না। কিন্তু তিনি দমবার মানুষ ছিলেন না। পরাজিত হয়েও অকম্পিত কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—

"Although today I differ from the majortity of the

members, I have not given up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side."

একবছরও লাগল না তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ-প্রস্তাব গৃহীত হতে। অন্য মতাবলম্বীদের কেমন করে, মামাবাবু যে নিজের মতে নিয়ে আসতেন—সে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখেছি তাঁর।

গয়া কংগ্রেসের পর 'স্বরাজ্যদল' নামে একটি আলাদা নতুন দল মামাবাবু গঠন করেন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই এই দলটি তাদের কাজ সুরু করে। মামাবাবুকে চিরদিনই, কি সাংসারিক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, বাধার পর বাধার দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলতে হয়েছে। কোনও দিকেই পথ তাঁর সুগম ছিল না। বিপুলকায় দৈত্যের মতনই এক-একটি বাধা সম্মুখে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দৃঢ় পদক্ষেপে তাদের মূলে কুঠারাঘাত করতে করতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে গন্তব্যের দিকে। কোনও সংকল্প হতে কোনও বাধাই, তা যত বড়ই হোক না কেন, তাঁকে টলাতে পারেনি। জীবন বিপন্ন জেনেও যা করতে, যা বলতে চেয়েছেন তার সৎসাহসের অভাব কখনও তাঁর হয়নি। সত্য বলে যা জেনেছেন বা মনে করেছেন, উন্নত শিরে বুক ফুলিয়ে তা করে গেছেন। মামাবাবুর এই দলটি ক্রমে এতই প্রাধান্য লাভ করে যে, কংগ্রেসে সে একরকম সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এই দলে ছিলেন সুভাষবাবু, অনিলবাবু, সত্যেন মিত্র প্রমুখ মামাবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গরা। সে-সময় দেখেছি এঁরা সব কি যে অদম্য উৎসাহে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুভাষবাবু ছিলেন মামাবাবুর পরম প্রিয় শিষ্য—দক্ষিণহস্ত।

এই সময় 'ফরওয়ার্ড' নামক দৈনন্দিন একটি খবরের কাগজ মামাবাবু প্রকাশ করেন, ও নিজে তার সম্পাদনা করেন। এই কাগজে খুব জোর সব লেখা বের হতে থাকে, সে-সব লেখা থেকে স্বরাজ্যদলের অভিমত, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, পন্থা, এসব সম্বন্ধে অনেক আলো পাওয়া যায়। লোকমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই এ-কাগজ তিনি বার করেন এবং তাঁর সে-উদ্দেশ্য সফল হয়। স্বায়ত্ত-শাসনের আঁটঘাট বাঁধবার প্রচেষ্টায় স্বরাজ্যদল আপনাকে নিয়োজিত করে কাউন্সিলে প্রবেশ ও ধীরে ধীরে করপোরেশন প্রভৃতি অধিকার করে। সাফল্যের পর স্বরাজ্যপার্টির তখন চারদিকে এতই প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে, জনমত, এমন কি স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধবাদীরাও, ক্রমে তাঁদের সমর্থক হয়ে ওঠে ও তাঁদের জয়যুক্ত করতে সহায়তা করে।

১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে সুভাষবাবুকে আবার গ্রেপ্তার করার খবরে

মামাবাবু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সে-সময় কলকাতা করপোরেশনে উনি যে ভাষণ দেন তা যেমন একদিকে অগ্নুৎগারক, আর একদিকে তা যেন বজ্র-নির্ঘোষে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা, যেমন জোরালো তেমনি তেজোদীপ্ত। প্রতিটি কথায় অস্বীকারের আগুন জলছে—যারা শুনেছে, যারা পড়েছে সেই ভাষণ, তারা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে অনুভব করেছে একই জিনিস—সেই চ্যালেঞ্জের ভাব আমি তুলে দিচ্ছি সেই অগ্নিগর্ভ ভাষণের কিছু কিছু অংশ। এখনও পড়লে মনে হয় ভিতরে আগুন জলে ওঠে—

"If a bomb was thrown anywhere or a pistol fired, we are accustomed to cry out 'it is a dastardly outrage'. We cry out 'this is a dastardly outrage'. Because we feel it is a dastardly outrage. But the time has come now to condemn not only the violence of the people who are addicted to violent methods, but also to condemn the violence of the Government (hear, hear). This is a clear illustration of what I consider to be a violence on the part of the Government. They have passed a law which is lawless law".

"Subhas Chandra Bose was arrested under Regulation III on Oct. 25, 1924. One fine morning he went out to do his work as the Chief Executive Officer of the Corporation. He returned home and found the police force in his house. Not one charge was made against him. Not one explanation was asked of him. Not one reason was urged before him, but he was simply told we have got the physical—brutal force here and we will drag you to imprisonment (Cries of hear, hear). Is this not violence ? Is this law ? Is this justice ? If it was one, we would have expected the officer to say, 'Well, we charge you with this, you have done this, that, or other thing. What have you got to say for your explanation ?' No, not one charge was formulated. Not one explanation was taken. But they simply carried him by force from his house and lodged him in jail.

I really do not think that when a revolutionary, in the enthusiasm of his heart fires a pistol or throws a bomb he is guilty of more violence than what the Goverment is today (Cries of hear, hear),······

I tell them again that no amount of repression will ever

put a check to this revolutionary movement. You cannot wipe out a nation from the face of the earth! You cannot check a people who are bent upon attaining freedom!

I shall lay down my life for liberty. I am not a revolutionary so far as the methods are concerned, but I feel like that. Standing here today I proclaim that if it is necessary to lay down my life for my liberty, I am prepared to do it (Applause and loud cheers).

If I beleived in the revolutionary movement—if I believe it today that it will be a success—I shall join the revolutionary movement tomorrow. But my belief is that, it will not succeed, that is why I do not join it. So far as their enthusiasm for liberty is concerned I am with them. So far as their love of freedom is concerned I am with them. But if my suffering or struggle or every drop of my blood is necessary to achieve this freedom I am ready.

I was told at Simla that as soon as I got down at Howrah I should be arrested. I am not afraid of being arrested. I have done nothing wrong. I have done what every honest man in India is bound to do. (Loud applause and cries of hear, hear).

Every honest man in this country is bound to say, 'I love my country—I love my freedom. I will have the right —the birth right to manage my own affairs'.

If that is a crime, I plead guilty to be hanged for that rather than to shirk the duty which I feel to be the only duty of every Indian of the present day.

······All that I say is that Mr. Subhas Chandra Bose is no more a revolutionary that I am, why have they not arrested me? I should like to know why? If love of country is a crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is criminal I am a criminal—not only the Chief Executive Officer of this Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty (Cries of hear, hear and applause.)"

আজ যখন ভাবি প্রাণের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এখনও সেই সব ঘটনার ঢেউ এসে লাগে হৃদয়তটে, নাড়া পড়ে অন্তরে। চলে নানাভাবের আনাগোনা, নানা চিন্তার উদয়-অস্ত। কখনও মন স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তেরাঙা ইতিহাসের

পাতা খুলে বসে, কখনও ভাবতে শুরু করে আমাদের মহান দেশ এই ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা আর তার গৌরবোজ্জ্বল বর্তমানের কথা,—সেই যুগের আমাদের সব সোনার ছেলেদের বীরত্বের কথা, আর এই যুগের দেশের রত্ন আমাদের জওয়ানদের বীরত্বের কাহিনী। কখনও পেয়ে বসে তাদের কথা কখনও এদের। কখনও মন উড়ে বেড়ায়, মধুমক্ষিকার মতন একবার এখানে বসে একবার ওখানে। দেশের কথা ভাবতে ভাবতে যখন বুক ভরে ওঠে তখন ভেসে আসে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অমন লাইনগুলি—

"এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি"—

ভেসে আসে—

"ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবতপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধুলি মাখিয়া অঙ্গে"—

মন প্রাণ সব সমস্বরে গেয়ে ওঠে এই ত সেই দেশ, আমাদের এই ভারতবর্ষ, যুগে যুগে যেখানে অবতীর্ণ হয়েছেন ভগবান জীবকে উদ্ধার করতে, জগতের গ্লানি মুছে নিতে। এই ত সেই ভারতবর্ষ ভগবানের পদরজে-রঞ্জিত যে পুণ্যভূমি। এই সেই ভারত, আসমুদ্রহিমাচল যার ভগবতজ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, যে-জ্ঞানের আলো থেকে আলোকসমৃদ্ধ এ মহীতল।

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই মামাবাবু পূর্ণোদ্যমে তাঁর কাজ করে চললেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাউন্সিলে যাবার দৃঢ় পণের কথা বলি। দৃঢ় পণের চাইতেও মৃত্যুপণ বললে বোধহয় কথাটি আরও ভালো বোঝায়। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'অর্ডিনান্স বিল'-এর প্রস্তাব কাউন্সিলে উপস্থিত করার কথা। সে-বিল কিছুতেই যাতে পাস না হতে পারে তারই জন্যে কাউন্সিলে যাবার এই মরণপণ। যে-তারিখে এই বিল প্রস্তাব উপস্থিত করার কথা (৭ই জানুয়ারী, ১৯২৫ সাল) তার মাত্র কদিন আগে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মর্ফিয়া দিয়ে রাখা হয়। উত্থানশক্তি রহিত। শরীরের এই অবস্থা, কিন্তু তবু মুখে ওই এক কথা—'কাউন্সিলে আমাকে যেতেই হবে।'

ডাক্তারেরা জানতেন তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, মরে গেলেও যাবেনই। তাই ওঁরা আপত্তি করার দিক দিয়ে না গিয়ে কি করলে ওঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় তারই চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমনই দুর্বল অবস্থা যে, সভায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত কথা বলতেও হাঁপিয়ে পড়ছেন। বাড়িসুদ্ধ সবাই

চিন্তাকুল। শেষপর্যন্ত স্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। এবং সভাকক্ষেও শায়িত অবস্থায় রইলেন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ জে. এম্‌. দাশগুপ্ত সঙ্গে রইলেন ডাক্তার হিসেবে। এঁরাও কাউন্সিলের সদস্য, তাই সঙ্গে থাকার কোন আপত্তি ওঠেনি। বক্তৃতাদির পরে ভোট গণনা করে দেখা গেল গভর্নমেন্ট-পক্ষ পরাজিত হয়েছে, বিল্‌ পাস হয়নি। মামাবাবুর এইভাবে এই রুগ্‌ণ অবস্থায় কাউন্সিলে আসা—দেশের প্রতি তাঁর এহেন ভালোবাসা, কর্তব্যপরায়ণতার এই দৃষ্টান্ত কাউন্সিলের সদস্যদের এতই স্পর্শ করল যে, তাঁদের চক্রান্ত বানচাল হয়ে গেল, যাঁরা মামাবাবুর বিপক্ষে ভোট দেবেন স্থির করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মামাবাবুকে ভোট দিয়ে বসলেন। এই অসম্ভব সম্ভব হল শুধু তাঁর উপস্থিতির জন্যে। তাই ভাবি তাঁর ব্যক্তিত্বের কি জাদুকরী প্রভাব আর কি তার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি—অবাক না হয়েই পারা যায় না। মামাবাবু বাড়ি ফিরলেন জয়ী হয়ে।

এর পর একটু সুস্থ বোধ করলে মামিমাকে নিয়ে পাটনা গেলেন মেজমামার কাছে। আমিও সে-সময় মায়ের কাছে পাটনা গিয়েছি। অনেকদিন থেকেই মা ভুগছেন। দাদা তখন কলকাতা ছেড়ে পাটনা আদালতে প্র্যাকটিস করছেন। মামাবাবু-মামিমা রোজই মাকে দেখতে আসতেন। মেজমামাও কখনও সঙ্গে থাকতেন। এই সময় মামাবাবু একদিন মাকে বলেন—'দিদি মহাপ্রস্থানের ত সময় হয়ে এল, এখন কে আগে যায়।'—মায়ের মনে এই কথাটি গাঁথা হয়ে যায়। এর অল্পদিনের মধ্যেই মামাবাবু মহাপ্রস্থান করেন। তাঁর দেহাবসানের পরে মা প্রায়ই কথাটি বলতেন। মামাবাবু যাবার এগার মাস বাদে মা যান এবং তার একমাস পরেই আমাদের বড় আদরের ভাই ভোম্বল (চিররঞ্জন) শোকাতুরা জননী, তরুণী পত্নী সুজাতা ও তিনটি শিশুকন্যা রেখে মাত্র ২৮ বছর বয়সে জীবনের সাধ অপূর্ণ রেখে অকস্মাৎ চলে যায়। মনে পড়ে তার মৃত্যুর কদিনমাত্র আগেও, আমাদের মায়ের শ্রাদ্ধে, কত কাজই করেছিল।

মামাবাবু তাঁর রসা রোডের বিরাট বাড়িটি দান করে দিলেন দেশের কাজের জন্যে, নিজে দাঁড়ালেন পথে এসে। তাঁর বাল্যবন্ধু অ্যাটর্নী পন্টু কর তাঁর নিজের ৫নং বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ির একটি ফ্ল্যাট মামাবাবুদের থাকার জন্য ছেড়ে দেন। সেই বাড়িতে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে দু'চার দিনের বেশি আর সেখানে তাঁর থাকা হয়নি। এর পরেই প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি হয়ে ফরিদপুর যান। কিন্তু সেখান থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন বুকভরা ব্যথা নিয়ে। তাঁর নিজের দলের মধ্যেই

অনেকেই তাঁর মতের বিরুদ্ধে যায়, এই মর্মান্তিক ধাক্কা আর তিনি সামলে উঠতে পারলেন না। দেশবাসী তাঁকে বুঝল না এই ব্যথায় তাঁর ভাঙা শরীর আরও ভেঙে গেল। অবস্থা যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে ওঠায় মে মাসের মাঝামাঝি তাঁকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়। দার্জিলিং ছিল তাঁর বড় প্রিয় স্থান। মোনার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। বার বারই তাঁদের কাছে দার্জিলিং গিয়ে থাকবার জন্যে কতই বললেন। যাবো যাবো কতবারই ভাবলাম। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে পৌছবার আগেই তিনি চলে গেলেন এমন এক জায়গায় যেখানে গেলে কেউ আর দেখা পায় না। মামাবাবু ভুগছিলেন, তিনি যে খুবই অসুস্থ—সবই বুঝতাম, কিন্তু তিনি যে একেবারেই চলে যাবেন একথা একবারও মনে আসেনি। ১৬ই জুন, ১৯২৫, বিকাল ৫টার সময় দার্জিলিং-এ 'স্টেপ এসাইড্' নামক বাড়িতে, আপন-পর, ধনী-নির্ধন একাধারে সবাইকে কাঁদিয়ে মামাবাবু চলে গেলেন সেই অলোকধামে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নামেনি। আমার স্বামী দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বললেন—'খবর খুব খারাপ, মামাবাবু আর নেই। পাঁচটার সময় মারা গেছেন খবর এসেছে।'—মুখ তাঁর ম্লান, গম্ভীর। শুধু বললেন—'দেশের কি ক্ষতিই যে হল কল্পনা করা যায় না।'—সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে অন্ধকার নেমে এল। সন্ধ্যা হবার আগেই মনে হল ... অন্ধকার ... কি অন্ধকার! সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি একা বসে রইলাম স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ জানি না। তারপর গেলাম মোনার বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখি বাড়ি নিঝুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, যদিও ঘরভর্তি লোক, তার মাঝে এক কোণায় মুখখানি নিচু করে সুধীর বসে আছে চুপ করে। আস্তে আস্তে মোনার ঘরে গেলাম, গিয়ে দেখি মামাবাবুর ছবিখানি বুকে নিয়ে সে কি কান্নাই কাঁদছে! সেই খাটের উপর তার কাছে বসে আছেন ন'মাসিমা (ঊর্মিলা দেবী) ও ছোটমাসিমা। ন'মাসিমা মামাবাবুদের কাছেই ছিলেন, মাত্র কদিন আগে ফিরেছেন। সকলেরই চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ছে অঝোর ধারা। মাকে সেখানে কোথাও দেখতে পেলাম না। চলে এলাম আমার সেজদির বাড়ি। ওখানেই মা এসে রয়েছেন কিছুদিন থেকে। শরীর তাঁর অনেকদিন থেকেই খারাপ চলেছে, তাই আমার সেজ ভগ্নীপতি খগেনবাবুর চিকিৎসায় আছেন। দেখলাম মা বসে আছেন স্থির, শান্ত. সমাহিত। মুখেও কথা নেই, চোখেও জল নেই। মনে পড়ছে মায়ের একখানি চিঠির কথা। মামাবাবুর মহাপ্রয়াণের পরে 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকায় আমি 'স্মৃতিতর্পণ' বলে একটি প্রবন্ধ লিখি।

সেই প্রবন্ধটি পড়ে পাটনা থেকে মা আমায় লেখেন :—'তোমরা যে তোমাদের মামাকে এমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছ ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। সে যে আমার কতখানি ছিল তাহা তোমরা কল্পনাও করিতে পার না। অন্তর্ধানে দুঃখ নাই, কারণ তাহাকে আমি হারাই নাই, যেখানে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে শোক-দুঃখের স্থান নাই।'

১৮ তারিখে সকালে শিয়ালদা স্টেশনে মামাবাবুর শবাধার নিয়ে দার্জিলিং মেল এসে পৌছবার কথা। আমি তার আগের দিন রাত্রে এসে মোনার বাড়িতে রইলাম। মিলিও রইল। ওখান থেকে আমরা শিয়ালদা স্টেশনে যাব তারই ব্যবস্থা হয়েছে।

১৭ তারিখে মহাত্মা গান্ধী, এবং ১৮ তারিখে মেজমামা পাটনা থেকে এসে পৌছালেন। মহাত্মাজী সে-রাত্রে মোনার বাড়িতেই রইলেন। রাত থাকতেই মোনা, সুধীর, মহাত্মা গান্ধী ওঁরা মোটরে চলে গেলেন ব্যারাকপুরে দার্জিলিং মেল ধরবার জন্যে। ভোম্বল সুজাতা ওরাও অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম থেকে এসে দার্জিলিং মেল্ ধরে। আমি, মিলি ও আরও অনেকে চলে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন পৌছাবার অনেক আগেই।

তখনই গিয়ে যে ভিড় দেখলাম এমন ভিড় কখনও দেখিনি। তিলার্ধ জায়গা কোথাও নেই। এমনকি যে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে দাঁড়াবে তার করোগেটের টিনের চালের নিচে যে সব লোহার ফ্রেম্ রয়েছে তাই ধরে সব ঝুলছে কিম্বা ওরই মাঝে যে একটু ঠাঁই করে নিতে পেরেছে, সে তাইতে অতিকষ্টে কোনও রকমে বসে আছে। সে যে কি দৃশ্য, যারা দেখেছে তারাই জানে। দেশবাসীর হৃদয়ে দেশবন্ধুর স্থান কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানটায় মামাবাবুর জন্যে পালঙ্ক রাখা ছিল। তারই একেবারে পাশে। মিলি সুন্দর করে বিছানাটি ঠিক করে দিল। মাথার কাছে গীতা-খানা রেখে দেওয়া হল। ফুল হাতে সবাই দাঁড়িয়ে, সকলেই থেকে থেকে চোখের জল মুছে দিচ্ছে। কি গভীর শোকের দৃশ্য যে দেখেছিলাম। ওই ভিড়, কিন্তু কি নিস্তব্ধ শিয়ালদার স্টেশন। তারপর মনে আছে ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে ট্রেনের প্রবেশ করা—মনে হচ্ছিল বিশ্বের শোক বহন করে সে আসছে ধীরে অতি ধীরে…। মহাত্মা গান্ধীকে দেখা গেল যে-গাড়িটিতে শবাধার আছে সেই গাড়ির দরজা খুলে দরজাটির সামনে দাঁড়ানো। দুটি হাত নেড়ে ভিড়কে ইশারায় শান্ত হয়ে থাকতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু সেই বিপুল জনতা সে-সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাদের প্রিয় দেশবন্ধুকে একটিবার

দর্শনের আকুল আকাঙ্ক্ষায় ভিড় ঠেলে সেই কামরার দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

মামাবাবুর শবাধার ট্রেন থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে এনে পালঙ্কটির পাশে রাখা হল। তাঁকে দেখবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে কখন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। দেহটিকে তুলে সেই খাটে রাখা হলে মামাবাবুকে দেখতে পেলাম। কিন্তু দেখে আরও কষ্ট হতে লাগল। যেমন চেহারা দেখলাম মামাবাবু বলে আর তাকে চেনাই যাচ্ছে না। আমি ও মিলি গিয়ে শেষ প্রণাম করলাম। কাঁধ দেবার জন্যে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, সকলেই পাগল কাঁধ দিতে। মহাত্মা গান্ধী সে ভিড় সামলাতে পারছেন না। তারপর দেখা গেল ফুলে বোঝাই শবসুদ্ধ পালঙ্কটি যেন উড়ে চলেছে। তার কোনও ওজন আছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না। খাটের চারপাশে অত ফুলের স্তূপ উঁচু হয়ে থাকায় মামাবাবুর মুখখানা আর দেখাই যাচ্ছে না। শবশোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন মহাত্মাজী।

আমরা যখন বাড়ি ফিরবার জন্যে পা বাড়ালাম তখন ভিড়ের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে মরে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল। কি করে যে বের হয়ে আসতে পারলাম জানি না। ভলানটিয়ারদের জন্যে সে-যাত্রা বোধহয় কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে চলে গেলাম মোনার বাড়ি।

আমরা এসে পৌঁছানোর পরে মাসিমারা সকলে এসে নামলেন। তার আগে থেকে মা এসে অপেক্ষা করছিলেন। মামিমা গাড়ি থেকে নামতেই মা তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। সে দৃশ্য যেমনই করুণ তেমনই হৃদয়বিদারক! খানিকক্ষণ মামিমার কাছে থেকে মা ফিরে এলেন খগেনবাবুর বাড়িতে, সেই-খান থেকে শবশোভাযাত্রা দেখবেন বলে। সে বাড়িও রসা রোডের একেবারে উপরেই।

নতুনবাজার থেকে টুকরিবোঝাই ভালো ভালো ফুল আনিয়ে জানালার কাছে গিয়ে মা বসে রইলেন মামাবাবুকে শেষবার দেখবার জন্যে। রাণীমাসিমা (নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের পত্নী) এসে বসলেন মায়ের পাশে। ব্যবস্থা করা হল বাড়ির সামনে শোভাযাত্রার ভিড় একটু থামিয়ে ফুলের গুচ্ছ তুলে দেওয়া হবে। আমিও এলাম আবার দেখব বলে। এই বাড়ি থেকে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায়। যদিও শিয়ালদা স্টেশনে তাঁকে খুব ভালো করেই দেখতে পেয়েছি এবং চেহারা দেখে কষ্টও হয়েছে, তবু, আর ত কোনও দিন তাঁকে দেখতে পাব না। মামাবাবু বলে চিনতে পারা না গেলেও

আমাদের মামাবাবুই ত! তখন বোধহয় দুপুর একটা কি দেড়টা হবে, দূর থেকে দেখা গেল শবশোভাযাত্রা আসছে। কি দ্রুতগতিতেই আসছে আর কি বিরাট শোভাযাত্রা! না দেখলে এর বিরাটত্ব কোনও ধারণাতে আসে না। শহরের নানা পথ ঘুরে আসছে তাই হয়ত আসতে এত দেরি। ফুল দেওয়া হতে-না-হতেই আবার বেগে বেরিয়ে গেল, ভালো করে দেখবার অবকাশ হবার আগেই। বড়ই ইচ্ছে হল কত স্মৃতিভরা সেই রসা রোডের বাড়ি থেকে একবার তাঁকে দেখবার। চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন রসা রোডের বাড়ির ফটক পার হয়ে শোভাযাত্রা অনেকটা এগিয়ে গেছে কেওড়াতলা শ্মশানের পথে। মামিমারা সকলে চোখের জল মুছতে মুছতে মোনার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। সকলেই ওঁরা রসা রোডের বাড়ির ফটকের সামনে বসেছিলেন শেষদেখা দেখার জন্যে।

চিরদিনের মত মামাবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন আমাদের চোখের সামনে থেকে।

তারপর—'দেহ সাথে সব ক্লান্তি' তাঁর পুড়ে ছাই হয়ে গেলে শ্মশানের আগুন নিভল। সেই সঙ্গে নিভে গেল সেই আলো যে-আলো উদ্দীপ্ত করেছিল বাংলার প্রাণ, আলোকিত করেছিল স্বরাজের পথ, যে-আলোর ভিতর ছিল জলবার মন্ত্র, জ্বালবার অগ্নি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।

শ্রীঅরবিন্দের কথা তুলে দিয়ে আমার মামার পুণ্যকথা শেষ করি—

"Chittaranjan's death is a supreme loss. Consummately endowed with political intelligence, constructive imagination, magnatism, a driving force combining a strong will and uncomon elasticity of mind for vision and tact of the hour, he was the one man after Tilak who could have led India to Swaraj"

কবির সংস্পর্শে

আমি তখন ছোট। বয়সটা ঠিক মনে নেই। তবে মনে ছাপ পড়বার বয়স হয়েছে। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি একদিন আমার মামার (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের) বাড়িতে। তাঁর আসবার কথা ছিল বিকেলে, কিছু পড়বেন শুনেছিলাম। গাড়ি তাঁকে আনতে গিয়েছিল। আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম গাড়ি ঢুকলেই দেখতে পাব তাই। প্রথম দেখার সে কি আগ্রহ এবং কৌতূহল মনে। তিনি যে একজন অসামান্য কেউ, তা সেই বয়সেই বুঝে নিয়েছিলাম। সকলেই দেখতাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতেন। কাজেই আমাদেরও তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। ভাবছিলাম দূর থেকে কিভাবে প্রথম তাঁকে দেখা যাবে, শেষে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখাই স্থির করলাম। বেশ স্পষ্ট মনে আছে গেট দিয়ে গাড়িটা ঢুকল, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে বসে আছেন। গাড়িটা ছিল পালকি গাড়ী, আর ঘোড়া ছিল পাটকিলে রঙের তেজী একটা ঘোড়া—সওয়ারী গাড়িতে ভরবার জন্যে গাড়ির পা-দানে রাখতে না রাখতেই সে সবেগে ছুটতে আরম্ভ করে দিত ঘাড় বেঁকিয়ে। মামাবাবু, মা, মাসিমা (অমলা দাশ নামে তিনি তখন সুপরিচিতা) ওঁরা গিয়ে কবিকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। শুনেছি কবি একবার মাসিমাকে বলেছিলেন, 'অমলা, তোমাদের এই ঘোড়ার গাড়িটিতে চড়তে পারা একটা ব্যাপার। ভালো করে চড়বার আগেই ঘোড়া ছুটতে সুরু করে দেয়। সে এক মহাতটস্থ অবস্থায় উঠে পড়ার পালা সারতে হয় দেখলুম।' তিনি উপরে এলে তাঁকে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ পেলাম—কি সুন্দর চেহারা, কোথায় যেন যিশু খৃস্টের আদল আসে—গৌরবর্ণ, লম্বা. দোহারা, চোখ নাক মুখ সব যেন দেখবার মত। দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কালো চুল সিঁথি দিয়ে ভাগ করা, কপালের দুপাশে ঘোরানো। দাড়ি গোঁফ সবই কালো। দাড়ি অনেকটা ফ্রেঞ্চকাট। কালো ফিতে বাঁধা স্প্রিঙের টেপা চশ্‌মা নাকে, ফিতেটি গলায় ঝোলানো। একে ওই সুন্দর চেহারা, তার উপর সাদা ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে কালো ফিতেয় বাঁধা চশমা জোড়াটি, মনে আছে, এমন সুন্দর মানিয়েছিল। সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা—জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। আমার শিশু-মনের উপর প্রথম রেখাপাত। পরে তিনি আরও কতবারই এসেছেন। বেশির ভাগ দেখতাম

উনি কিছু পড়তেন। ওঁর পড়া এত ভালো ছিল যে মা, মামাবাবু, মাসিমারা সকলে পরম আগ্রহে মুগ্ধ হয়ে বসে শুনতেন। একবার 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' এই গানটি সবে লিখে নিয়ে এসেছিলেন পড়ে শোনাবার জন্যে। কত পড়াই তখন থেকে তাঁর শুনে এসেছি—শুধু মামার বাড়িতেই নয়, কত জায়গায়, কত অনুষ্ঠানে, কত ঘরোয়া বৈঠকে শুনেছি ওঁর পড়া। নাটোরের রাজবাড়িতেও প্রায়ই হত এই বৈঠক। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত-রসিক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা। আমাদের অতুলদাও (অতুলপ্রসাদ সেন) সেখানে উপস্থিত থাকতেন। আসর সে সময় খুব জমত। সেখানেই প্রথম শুনেছিলাম 'দেবতার গ্রাস'। ছোট ছিলাম—পরে বুঝেছিলাম তার আসল অর্থ। কবির মুখে 'দেবতার গ্রাস' যে একবার শুনেছে সেই জানে সে কি অভিজ্ঞতা! কতবার যে শুনেছি তবু কোনো কালেই তা পুরানো হত না। কানে বাজে—

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা?

মন প্রাণ সব যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেত তাঁর সেই মর্মস্পর্শী আবৃত্তির সুরে—

'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক···

মনে আছে ছোটবেলায় 'সোনার তরী' যখন পড়তেন মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম যদিও তার মানে তখন কিছুই বুঝতে পারতাম না। পড়ার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকত যা আমাদের মনকে আটকে রেখে দিত, নড়তে দিত না, তার মানে না বুঝলেও। তাঁর 'শা জাহান' কবিতাটি পড়ার কথাও মনে পড়ে—

'একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শা জাহান'—প্রথম লাইনের আরম্ভের সঙ্গেই যেন চমক লাগিয়ে দিতেন—কি ম্যাজেষ্টিক আরম্ভ!

আমার মামার বাড়িতে প্রায়ই ওঁকে 'গান্ধারীর আবেদন' পড়তে হত, ওটি আমার মামার বিশেষ প্রিয় ছিল। অনেকক্ষণ ধরে চলত কবির কিছু না-কিছু পড়ে শোনানো। তাঁর সঙ্গে মামাবাবুর শুধু কাব্য সাহিত্য এসব আলোচনাই চলত না, নানান বিষয়েই আলোচনা হত—দেশের অবস্থা, তার নানা সমস্যার কথা সবই থাকত। মাসিমাকে দেখতাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠতেন যখন কবি গান বাজনা বা অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলতেন। মনে হত সেটাই ছিল যেন তাঁর আপন জিনিস যার সঙ্গে চলত তাঁর অন্তরের লেনদেন।

ঘরোয়া কথাবার্তাও তাঁর সঙ্গে কবির বিস্তর হত। ছোট ছিলাম, সব বুঝতাম না। তবু কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে করত, ভালো লাগত তাঁর সান্নিধ্য তাঁর সঙ্গ।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সকলের কবে থেকে যে ঘনিষ্ঠতার সুরু তা আমার জানা নেই। মায়ের মুখে শুনেছি 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' গানটি তাঁরই বিবাহোপলক্ষে রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ গানটি নিজে বিয়েতে গেয়েছিলেন। তখন কবির গলা এত জোর ছিল, শুনেছি বড় প্যাণ্ডেলের শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা পৌঁছত অনায়াসে। আমরা যখন তাঁর গান শুনেছি তখন গলার জোর অনেক কমে এসেছে। আস্তেই বেশির ভাগ গাইতেন, ঠিক গলা ছেড়ে গান গাইতে বিশেষ বড় একটা শুনিনি।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার মাসিমার। কবি তাঁকে নিজের মেয়ের মতনই স্নেহ করতেন। মাসিমা রবীন্দ্রনাথকে 'রবিকাকা' বলে ডাকতেন। আর তাঁর ছেলেমেয়েরা মাসিমাকে ডাকত 'অমলা দিদি' বলে। কবি প্রায়ই তাঁকে জোড়াসাকোর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতেন। শিলাইদহে কবি যখন সপরিবারে বাস করতেন তখন মাসিমাও ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন। সুবিখ্যাত গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গানও শিখিয়েছেন। মাসিমার গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে মাসিমার সুকণ্ঠের খুব নাম ছিল। তাঁর গলা চড়ত তারা সপ্তকের 'ধৈবত' পর্যন্ত। আর তানের দানা ছিল পরিষ্কার। তাই কবি তাঁর কণ্ঠের জন্যে হিন্দী টপ্পার গান ভেঙে বাংলায় কথা বসিয়ে দিতেন। তার মধ্যে এই দুটি গান মাসিমার মুখে শুনতাম—'কে বসিলে আজি হৃদাসনে' আর 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। পরে নহবত থেকে তোলা মাসিমার কণ্ঠে মিশ্র ভীমপলশ্রী রাগের একটি সুর শুনে কবি তাইতে কথা বসিয়ে দেন, এই গানটি হচ্ছে 'দিন ফুরাল হে সংসারী', গানটি মাসিমা ছাড়া আর কেউ জানত না। পরে অবশ্য গানটি আমি মাসিমার কাছে শিখি। 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে এই গানটি আমি 'রবীন্দ্র ভারতী'র জন্যে টেপ রেকর্ড করে দিয়েছি যাতে গানটি আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ না হয়ে যায়। আর পরে কেউ চাইলে শিখে নেবারও সুযোগ পায়। আর একটি গান কবি মাসিমার গলার জন্যেই রচনা করে দিয়েছিলেন—'চির সখা হে ছেড়োনা মোরে ছেড়োনা'— গানটি মাসিমা খুব গাইতেন। কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে 'কাকীমা' বলে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র বসে অন্তরঙ্গভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গানটি হচ্ছে—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছে করে তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে ব'সে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।

এই গানটির কথা মাসিমার মুখে শুনেছি আর গানটিও তাঁকে অনেকবার গাইতে শুনেছি। তিনিই আমাকে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, -'রবিকাকা, আমাদের এই মেয়েটির গান শুনবে?' মনে আছে মাসিমার কাছে শেখা এই গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলাম—

'ঘুরে ফিরে এমনি করে ছড়িয়ে দেরে ফাগের রাশি
লালে লাল হব রে ভাই রাঙা হবে মোহন বাঁশি।'

এটা যে কার রচিত গান তা আজও জানিনা। পরে রবীন্দ্রনাথ যখনই আমার মামার বাড়িতে আসতেন, মাসিমার কাছে খোঁজ নিতেন—'কোথায় অমলা, তোমাদের সেই মেয়েটি কোথায়, কি খবর তার'? মাসিমা আমাকে এনে হাজির করতেন। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে মধুর হেসে জিজ্ঞেস করছিলেন একবার, 'তুমি কার কাছে গান শেখ'? আমি বলেছিলাম 'আমার মাসিমার কাছে'। মনে আছে উনি পর পর জিজ্ঞেস করে চললেন—এ গানটা জানো, সে গানটা জানো—আমি তার মধ্যে যে যে গান জানি তখনই গেয়ে শোনাতাম, আর না জানলে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিতাম যে জানিনা। আমি গান গাইতে এত ভালোবাসতাম যে আমাদের বাড়িতে কেউ এলে আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কখন তারা আমায় গান গাইতে বলবে। বললে তখনই বিনা আপত্তিতে সুরু করতাম গাইতে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এরকম অনেকবার করেছি। উনি আসবেন আগে থেকে জানতে পারলে নিজেই গিয়ে হাজির হতাম ওঁর কাছে আর নীরব আগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম একবার ওঁর গাইতে বলার অপেক্ষায়। তিনি কিন্তু খুব উপভোগ করতেন আমার গাইবার এহেন শখ ও উৎসাহ দেখে।

রবীন্দ্রনাথের কথা লিখতে গেলে আমার গানের কথাও তার মধ্যে এসে যায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধই গান নিয়ে। তিনি ভালোবাসতেন আমার গান শুনতে আর আমিও কি যে গভীর তৃপ্তি পেতাম তাঁকে গান শুনিয়ে। তাঁকে গান শুনিয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি এমন আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে করতে পারি

না। ছোট থেকেই আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম ওঁকে গান শোনাবার, বড় আনন্দ হত। ওঁর কাছে গেলে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার চেয়ে গানই হত বেশি। আমার গানকে তিনি যে-চোখে দেখেছিলেন ও গ্রহণ করেছিলেন, সে যে আমার কত বড় গৌরব। তিনিই তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন তাকে স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আদর দিয়ে, দরদ দিয়ে, আর এমন জায়গায় স্থান দিয়ে। আজ একথা লিখবার মধ্যে তাই আত্মপ্রচারের অহংকার থাকলেও কৃতজ্ঞতার প্রণতিও রয়েছে। যা কারও কাছে পাইনি তা-ই তাঁর কাছে পেয়েছিলাম একথা আমি ভুলতে পারি না। আমার গান সম্বন্ধে হয়ত বা কবির দুর্বলতা আছে মনে করে আমি কত সময়ই ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছি,—'আমার গানের প্রতি আপনার বেশ পক্ষপাতিত্ব আছে—' শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ তুলে বলেছেন, 'ঝুনু, তুমি আমায় একথা বলছ।'

আমার যখন আন্দাজ বারো বছর বয়স তখন রবীন্দ্রনাথ আমার মাকে লিখে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে দেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে। তিনি হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক বংশের বংশধর গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের ভাই। কবির পাঠানো এই সুরেনবাবুর কাছেই আমার প্রথম গান শিক্ষা আরম্ভ। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনেক গান তাঁর 'গীতলিপি' নামক স্বরলিপির বইএ ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে আমি স্বরলিপি করতে এবং স্বরলিপি দেখে গাইতে শিখি।

আমার তখন বছর পনেরো বয়স হবে, আমি প্রথম গান করি রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর পুরানো বাড়িতে মাঘোৎসবের উৎসব-সভায়। সেদিন ওঁদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা এই উৎসব উপলক্ষে খুব ভিড় হত। বাড়ির ভিতর দিককার মস্তবড় উঠোনটিকে এই অনুষ্ঠানের জন্যে খুব সুন্দর করে সাজানো হত। সেবারে উঠোনের শেষে একদিকে হয়েছিল উপাসনার বেদী রচনা, তারই ঠিক উল্টোদিকের শেষে বিরাট দরদালান, সেখানে হয়েছিল মেয়েদের বসবার জায়গা বেদীর দিকে মুখ করে। ছেলেরা সব বসেছিলেন উঠোনটি জুড়ে। সেই বেদীর উপর দেখেছিলাম মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে। আচার্যের বেশে শুভ্র গরদের ধুতি চাদর পরিধানে ঠিক যেন প্রাচীন ঋষির মত লাগছিল। তাঁর দুপাশে দুজন বসেছিলেন ঐরকম শুভ্র বস্ত্র পরিধানে, যতদূর মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্তোত্র মন্ত্র ইত্যাদি বলছিলেন। ভারি সুন্দর শোনাচ্ছিল! এই সংস্কৃত স্তোত্রমন্ত্র পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম শুনি অমন জিনিস। বৈদিক যুগের ঋষিদের মন্ত্রপাঠ

সম্বন্ধে বই পড়ে আমাদের যে ধারনা হয়, এ যেন সেই রকম, এমন শুভ্র সুন্দর, সকলের সম্মিলিত বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ এমন একটা ধ্বনি গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই বেদীর একপাশে দিনুদা বসেছিলেন শান্তি-নিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে। এই ছাত্ররাই দিনুদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নূতন-রচিত অনেক গান কোরাসে গেয়ে আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিল। এখনও মনে পড়ে 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে', 'অসীম ধন তো আছে', 'আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে', 'তোমারি নাম বল', 'নব এ মধুর খেলা' এইসব গানগুলির কথা—ছেলেদের কণ্ঠে যে কি ফুটেছিল! আমি গান করেছিলাম মেয়েরা যেদিকে বসেছিলেন তাদের মাঝখানে, উঠোনে নামবার সিঁড়িতে জায়গা করা হয়েছিল। সেইখানে বিবিমাসিমা (ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী) টেবিল হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন আর আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দুটো গান করি—'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে', 'আর লুকিয়ে আসে আঁধার রাতে।'

১৯১১ সালেই মনে হচ্ছে, আমি প্রথম যাই শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে। আমরা অনেকে ছিলাম। আমার এক বড় বোন ও এক খুড়তুতো বোন ছিলেন আমার সঙ্গে। সার নীলরতনের বড় দুই মেয়ে, ভাগ্নী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মেয়েরা, আমার পিসতুতো দুই বোন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভাদেবী, তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি—এই সব আমরা দল করে গিয়েছিলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নিচু বাংলায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি, তিনি সে-সময় সেখানে ছিলেন না। ওখানেই আমাদের খাবার নিয়ে যেত শান্তিনিকেতনের, ছেলেরা, তার মধ্যে বুলাকেও (প্রফুল্ল মহালানবিশ) দেখতাম। তখন শান্তিনিকেতনে শুধু ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থাই ছিল, ছাত্রীদের সমাগম তখনও হয় নি। বোলপুর স্টেশন থেকে গোরুর গাড়িতে তখন যেতে হত আশ্রমে, আর নইলে হেঁটে, এ ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনের বন্দোবস্ত ছিল না। খুব ভোরে বেশ অন্ধকার থাকতে ট্রেন এসে দাঁড়াল বোলপুর স্টেশনে। লণ্ঠনের আলোতে সব জিনিসপত্র দেখে শুনে নিয়ে সকলে গিয়ে উঠলাম গোরুর গাড়িতে। মাঠের পর মাঠ, আর কিছুই বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। মনে আছে তখন মনে হয়েছিল—স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন কি দূর! যাই হোক অন্ধকার থাকতে থাকতেই নিচু বাংলায় এসে গাড়ি থামল, আমাদের কয়েকজন মেয়েকে ওখানেই নামিয়ে গেল। বেশ আলো হবার পর অনেকে আমরা বের হলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমরা

সকলে প্রণাম করতেই সকলকেই আলাদা করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন আমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না বা কিছু দরকার আছে কি না। পরে বললেন, 'আজ রাত্রে আমাদের "রাজা" অভিনয় আছে জান তো'? জানতাম, তাই সকলেই বললাম, 'হ্যাঁ জানি!' চলতে চলতেই ওঁর সঙ্গে অল্প দু-চারটে কথা হল। ওঁর মুখেই শোনা গেল বিকেলে মাঠে ছেলেদের খেলা আছে। মনে হল উনি যেন একটু ব্যস্ত, অতিথি-অভ্যাগতদের সব ব্যবস্থার জন্যে। তখনকার শান্তিনিকেতন তো এখনকার মত সুবৃহৎ ব্যাপার ছিল না। কয়েকখানা কুটির দূরে দূরে, দু-চারটে পাকা বাড়ি হয়তো। বেশির ভাগই খোড়োচালের ঘর ছাত্রাবাস গুরুপল্লীর বাড়িগুলি সবই খোড়ো চালের ছিল। তখন স্থানাভাব যথেষ্ট থাকায় এই সব উৎসবাদির সময়ে অতিথি সৎকারের আয়োজনের ব্যাপারে নানা বিষয়ে অনেক কিছুই ওঁকেই ভাবতে বা করতে হত। বিকেলের দিকে গেলাম খেলা দেখতে। আমরা যাচ্ছি, দেখি কবিও যাচ্ছেন ওই দিকেই। কবি উপস্থিত হলে খেলা আরম্ভ হল। সকলেই কবিকে প্রণাম করে খেলায় নামল। নানা রকমের খেলা দেখা গেল— দৌড় ঝাঁপ ফুটবল ইত্যাদি অনেক কিছু। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে তৈরী হচ্ছি অভিনয় দেখতে যাবার জন্যে। সকলেরই আমাদের বিশেষ আগ্রহ অভিনয় দেখার। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা এত শুনেছি। গেলাম 'রাজা' অভিনয় দেখতে। এখানেও দেখলাম সেই খড়ের চালের ঘর। স্টেজ ইত্যাদি সে-রকম কিছু নেই। দৃশ্য বা 'সিন' কিছুই দেখলাম না। উঁচু মতন একটু জায়গা সেইখানেই হল অভিনয়, শুধু নটরাজের মূর্তি আঁকা একটা 'ড্রপসিন' ঝুলছে দেখলাম। আর আমরা সেই ঘরের মাটিতে বসে দেখলাম অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ করলেন 'রাজা'র পার্ট, দৃশ্যতঃ তাঁকে দেখা গেল না। অলক্ষে রইলেন বটে কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা যাবে কোথায়, মুহূর্তেই তা প্রতিভাত হল আমাদের সামনে। 'রাজা'কে চিনে নিতে আমাদের দেরী হল না। সবকিছুকে নিখুঁত করে সম্পন্ন করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছি তাঁর। আমার এক মামা শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ—পরে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য হয়েছিলেন—সেজে ছিলেন 'সুদর্শনা'। বেশ ভালো করেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী হয়েছিলেন 'সুরঙ্গমা'। তাঁর 'বিরহ মধুর হ'ল আজি' গানটি মনে পড়ে। দিনুদা হয়েছিলে 'ঠাকুরদা।' মনে আছে, কালি ঝুলিমাখা কতগুলো কাপড়ের টুকরো পোশাকের সঙ্গে এখানে ওখানে ঝুলিয়ে দিনুদার গাইতে গাইতে প্রবেশ—

'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই—'

সে যে কী ভালোই লেগেছিল, এমন নতুন ধরনের আর এমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল। রাত্রে ভরা মনে বাড়ি ফিরে এলাম। এমন অনাড়ম্বর সবকিছুর মধ্যে যে এমন একটা জিনিষ ফুটে উঠতে পারে তা দেখতে পাবার আনন্দে বিভোর হয়ে রাত কেটে গেল। পরের দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন 'দেহলি'তে ছিলেন। ছোট পাকা বাড়ি। উপরে বোধকরি একখানাই ঘর। সেইখানায় উনি থাকতেন। রাশীকৃত বইএর স্তূপের মাঝে লেখার সরঞ্জাম নিয়ে তিনি বসেছেন লিখতে। লেখায় ব্যস্ত বলে আমরা তাঁর বিশেষ সময় নিলাম না। ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করে চলে আসছিলাম। তিনি ডেকে আমাদের সকলের সঙ্গে হেসে কথা বললেন, হাস্য-পরিহাসও ওইটুকু সময়ের মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব তা করতে ছাড়লেন না। ও বাড়ির নিচের তলায় তখন ছিলেন মীরাদি ও তাঁর স্বামী। সন্তোষ মজুমদারদের সঙ্গেও দেখা হল। তিনি ছিলেন সপরিবারে। তাঁদের নিজেদের পাকা বাড়ি তখন তৈরী হয়েছে দেখে এলাম। রথীবাবু প্রতিমাদেবীকে দেখলাম না। রথীবাবু বোধহয় তখন শিলাইদহে তাঁদের জমিদারী দেখাশোনা ও আরও অন্যান্য কাজ নিয়ে ছিলেন। প্রতিমাদিও তখন সেইখানেই। যাই হোক, সেইরাত্রি থেকেই আমার হঠাৎ হল ভীষণ রকমের হাঁপানী। আমার জীবনে অমন হাঁপানী আর হয়নি, আনন্দের ওই মেলা ছেড়ে, যাত্রা ভঙ্গ করে আমাকে ফিরে আসতে হল—মনের সে কী অবস্থা!

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই আমার ডাক পড়তো জোড়াসাঁকোয় ওঁদের বাড়িতে। যেবার দিনুদা ওঁর সঙ্গে আসতেন সেবার বেশির ভাগ দিনুদাই গান শেখাতেন, যদিও কবি সেখানে উপস্থিত থাকতেন। কখনও তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতেন। দিনুদা না এলে কবি নিজেই শেখাতেন। একবার খুব মজার একটা ব্যাপার হয়েছিল, দিনুদা কলকাতা এসেই টেলিফোনে ডেকে বললেন 'ঝুনু, চলে এস, অনেক নতুন গান আছে।' আমি ত ছটফট করছি যাবার জন্যে, এদিকে মুস্কিল গাড়িও কিছুতেই জোগাড় করে ওঠা গেল না। ভবানীপুর থেকে জোড়াসাঁকো তো কম দূরের পথ নয়,—আমি আছি মামার বাড়ি রসা রোডে, আর ওঁরা জোড়াসাঁকোয়। গাড়ি নেই। তর সইছে না। তখন আমার মামার আপিস ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টেলিফোন যোগে চোদ্দটা গান শিখে নেওয়া গেল! দিনুদা জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে গাইছেন আর আমি ভবানীপুর রসারোডে টেলিফোন ধরে গান শিখছি—সে ভারি মজা! কবি তো শুনে অবাক! এই কথা যে কত লোককে উনি পরে বলেছিলেন—'এমন

গান-পাগলা আমি আর কোনো মেয়েকে দেখলুম না'। আমাকেও একবার বলেছিলেন, 'তোমাকেই দেখলুম যে সংসার থেকেও গান তোমার কাছে এত প্রিয়। মেয়েদের মধ্যে এটা কমই দেখা যায়। তারা সংসার করতে বড্ড ভালোবাসে।'

গাড়ি থাকলে গাড়ি প্রায়ই এসে হাজির হত যেখানে কবি উঠতেন সেখান থেকে। একদিন অমনি রাণী মহলানবিশদের আলীপুরের বাড়ি থেকে হঠাৎ মোটর এসে হাজির—যেতে হবে। কবি উঠেছেন ওখানে, গান শিখবার জন্যে ডেকেছেন। আমি তখন থাকি বিডন স্ট্রিটে, রাণীরা আলিপুর—দিলাম পাড়ি। তবে মোটরে দূরত্বের কষ্ট নেই, চট করে পৌঁছে গেলাম। আমি যে এত শীগগীর গিয়ে পৌঁছব কবি তা ভাবেন নি। গিয়ে প্রণাম করতেই অবাক হয়ে সহাস্যে বললেন—'আ রে, তুমি এসে গেছ! এইতো এখনি আমি রাণীকে বলছিলুম তোমাকে আনিয়ে নিতে পারলে হত। এরই মধ্যে এত শীগগীর গাড়ি গিয়ে আবার তোমায় নিয়েও এল? রাণী তো দেখছি বেশ করিতকর্মা মেয়ে।' বলে রাণীর দিকে একবার তাকাতেই সে বললে, 'ঝুনু আজ এখানে খাবে ও সারাদিন থাকবে। সন্ধ্যাবেলা ওকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই হবে।'

উনি হেসে মজা করে বললেন, 'ঝুনু তোমার এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তো?' রাণী বললে, 'ঝুনুর মতামত আবার কে শুনছে? ওর বাড়িতে ফোন করে দিয়েছি ও সন্ধ্যায় ফিরবে।' কবি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কি, পারলে না বুঝি ওর সঙ্গে?' আমি বললাম, 'পারবার চেষ্টাও করিনি, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় আত্মসমর্পণ করেছি'। গলা নামিয়ে একটু যেন কাঁপা সুরে মুখে হাসি হাসি ভাব নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি বলত? গান শিখবার অনেক সময় পাওয়া যাবে?' বললাম, 'সেই জন্যেই তো!' উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তাই বলো, এইবারে বোঝা গেল তোমার মতলবখানা! বলে হাসতে লাগলেন। রাণী টপ করে বললে, 'আর আমার মতলবখানার মধ্যে দেখলেন তো, স্বার্থের লেশমাত্র নেই।' সকলেই আমরা হাসাহাসি করলাম। আমাকে বললেন, 'তা হলে আর সময় নষ্ট করা কেন, চলো গান নিয়ে বসা যাক, অনেক গান আছে।' গিয়ে বসলাম। ওঁরও গান শেখানোয় ক্লান্তি নেই, আমারও নেই শ্রান্তি গান শেখায়। দুজনেই গানে মশগুল। এইখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে এই গানগুলি শিখেছিলাম, 'অলকে কুসুম না দিয়ো', 'না গো না', 'জয়যাত্রায় যাও গো', 'না বলে যায় পাছে সে'! পরে খাবার সময় হতে উঠে পড়া গেল। দেখলাম খাবার টেবিলে রাণীর গৃহিনীপনার

নমুনা—প্রচুর আয়োজন। খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথ কত রঙ্গরসিকতা যে করছিলেন রাণীর সঙ্গে, সে সব শোনবার মত, এত চিত্তাকর্ষক। আর রাণীও বড় কম যেত না, তখুনি তখুনি সেও যেসব উত্তর দিচ্ছিল তাও শোনবার মত। ভারি উপভোগ করেছিলাম। খাওয়া দাওয়ার পরে কবি চলে গেলেন ওঁর ঘরে বিশ্রাম করতে। আমি আর রাণী তার শোবার ঘরে শুয়ে শুয়ে আলাপ আলোচনাদি নিয়ে দুপুর কাটালাম। সময় হতেই রাণী বিকেলের জলযোগের আয়োজনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। বিকেলে চা-পর্বের পরে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাকে নিয়ে বসলেন গান শেখাতে। সবেমাত্র 'গান আমার যায় ভেসে যায়' গানটি শিখেছি আর অনেক লোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। বাধ্য হয়েই ওঁকে গান ফেলে উঠতে হল। যাবার সময় বললেন, 'দেখছ তো, আমার কত অনিচ্ছার সঙ্গে পদে পদে যুঝতে হয়।' আমি বললাম, 'আমি কেন কিছুতেই যা ইচ্ছে হয় না তা করতে পারি না ?' উনি বললেন, 'পার না নয়, করতে চাও না তাই। তার কারণ তুমি দেখতে চাও না তোমার অনিচ্ছাটা কেন আসে, কোথা থেকে আসে, বা তার কারণ কি ?' মনে আছে কথা-গুলো তখন মনে খুব দাগ কেটেছিল। রাণীদের বাড়িটা ছিল ভারি চমৎকার, ফাঁকা জায়গায়, চারিদিক খোলা। নানারকম গাছপালায় ভর্তি মস্ত বাড়ি সামনে টানা বারান্দা চলে গিয়েছে শেষ ঘরটি পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই ডানদিকের বড় ঘরটায় তখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ওখানে থাকায় স্থান মাহাত্ম্যও বেড়ে গেল আর পরিবেশও ভরে উঠল তার ব্যক্তিত্বের প্রভায়। এমন জায়গায়, এমন লোভনীয় সংস্পর্শে গান আপনা হতে এসে যায়। কবির কাছে গান শিখতে বসে বার বার মনে হয়েছে তিনি যেন গানের প্রেরণার উৎস। গানের সময় দেখেছি গানের প্রতি তাঁর কি ভালোবাসা, কি দরদ, তিনি যখনি গাইতেন তখনি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত সে ঐকান্তিক ভালোবাসা। শুধু সুরেই নয়, তাঁর চোখে মুখের ভাবেও তা মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যেত।

এই সময়ে তাঁর গানের বিরুদ্ধ সমালোচনায় কেউ কেউ তাঁকে আঘাত করেন তাঁর সঙ্গীতে সুরের দীনতা দেখিয়ে। আঘাত তিনি নীরবেই গ্রহণ করতেন, ফিরে আঘাত দিতে তাঁকে দেখিনি। তাঁর অসাধারণ মার্জিত রুচিতে তা বাধত। সে সময়ে একদিন আমাকে বলেছিলেন, গলার সে স্বর যেন আজও শুনতে পাই, 'পদ্মফুল আর জুঁইফুলের তুলনা চলে না। দুটো সম্পূর্ণ দুই জিনিষ। পদ্মফুল বড়, জুঁইফুল ছোট। এই বড় পদ্মফুলের সৌন্দর্য বা তার সব গুণের অধিকারী না হলেও ছোট জুঁইফুল তার আপন সুগন্ধ বুকে নিয়ে আপনার

সুকুমার সৌন্দর্যে আপনি বিকশিত। আমার গানকে আমি মনে করি এই ছোট জুঁই ফুল। কোনও ফুলকেই, সে পদ্মফুলই হোক আর জুঁইফুলই হোক, টেনে তুলে ছিঁড়ে বা বিচার বিশ্লেষণ করে তার বিকশিত রূপের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। সেই সৌন্দর্য ধরা পড়ে চোখের অন্য একদৃষ্টি নিয়ে, চেতনার অন্য এক স্পর্শে। অঙ্গচ্ছেদ করে তার আঙ্গিক তত্ত্বের কথা জানা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু মেলে না তার সত্তাকে, মেলে না তার স্বরূপ বিকাশের পূর্ণতর পরিচয়। পাওয়া যেতে পারে স্থূলকে, পাওয়া যায় না সূক্ষ্মকে ; দেখা যায় বাহিরকে, দেখা যায় না ভিতরকে, তাই বাহিরের সৌন্দর্য ধরা পড়লেও ধরা পড়ে না কিসে তাকে সুন্দর করে তুলছে, তাকে রূপ দিচ্ছে, ফুটিয়ে তুলছে, ধরে আছে ভিতর থেকে। এই জিনিসটির স্পর্শ না পেলে আসল জিনিসটির কাছে পৌছানো যায় না, পরিচয় পাওয়া হয়না আসলের। যাচাই করার অভিরুচি নিয়ে অনুসন্ধান করলে জানা যায় না সত্যকে, সম্ভব হয় না, তার মূল্য জানা।' এই সময় মনে আছে তিনি ওই গানটি লেখেন—

গান আমার যায় ভেসে যায়—

একবার বিখ্যাত এক ওস্তাদের গান শুনে এসে আমাকে লিখেছিলেন—

'আশ্চর্য তার সাধনা, কণ্ঠে মাধুর্য আছে, যেমন তেমন করে সুর খেলাতে এবং সুরে মোচড় দিতে তার অসাধারণ নৈপুণ্য। একে ভালো বলতে বাধ্য কিন্তু ভালো লাগতে নয়। সঙ্গীত যখন রূপঘনিষ্ঠ প্রাণবান দেহ নেয় তখন তার অঙ্গসীমাকে মানাই চাই। তখন তাকে যত খুশি টেনে বাড়ানো, ছেঁটে কমানো, তাকে আছড়ানো মোচড়ানো কলাতত্ত্ববিরোধী। পুরুভুজজাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজীতে যাকে বলে amorphous, তাকে দুখানা করলেও যা সাতখানা করলেও তা। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবে এই অত্যাচার খাটে না। তার স্বভাবসীমাকে কিছুদূর অতিক্রম করা চলে, কিন্তু বেশীদূর নয়। এই জন্যে —র গানকে কান তারিফ করলেও মন স্বীকার করছিল না। যারা ওস্তাদি নেশাগ্রস্ত তাদের এই কলাতত্ত্বের সহজকথা বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা নেশার সীমা নেই, ভোজের আছে। 'ঢাল্ ঢাল্ সুরা আরো আরো ঢাল্'—এটাকে মাংলামি বলে হাসতে পারি, কিন্তু দই ক্ষীর সন্দেশের বেলা যথাস্থানে থামার দ্বারাই তাকে সম্মান দেওয়া হয়, না থামলেই সেটা বীভৎস হয়ে ওঠে। — যে জাতীয় গান গায় শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া তার থামবার এমন কোনোই সুবিহিত প্রেরণা নেই যা তার অন্তর্নিহিত। তাতে —কে অপরাধী করিনে এই জাতীয় সঙ্গীতকেই করি। —র গায়নাতে কেবল যে সাধনার পরিচয় আছে তা

নয়, বিধিদত্ত ক্ষমতারও পরিচয় আছে যা অধিকাংশ ওস্তাদের নেই, কিন্তু ততঃ কিম, এই শক্তি ভুল বাহন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্যস্থান ছিল সুন্দর বনে তার মান বাঁচানো সহজ হয় না।"

আমি তখন কাশীতে থাকি। কোন্ সাল মনে নেই। আমি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাশীতে ছিলাম, এরই মধ্যে কোনও সময়ে হবে, শুনলাম কবি এসেছেন কাশীতে। আছেন কাশীর মহারাজার অতিথি হয়ে ক্যান্টনমেণ্টে তাঁরই 'নন্দেশ্বর প্যালেসে'। অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয় আমায় কবির আসবার খবরটি জানিয়ে যান। তখন ক্যান্টনমেণ্টের দিকে ক্যাপ্টেন জ্যোতিলাল সেন, আই.এম্.এস. সপরিবারে ছিলেন।

জ্যোতিলাল বাবুর স্ত্রী শ্রীবেলা সেন ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা সকলে মিলে রাত্রে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি ফণীবাবু ও তাঁর মেয়েরাও সেখানে রয়েছেন। গিয়ে কবিকে প্রণাম করতেই তিনি আমায় বললেন, 'কেমন আছ, ঝুনু, শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম ?' বললাম, 'হ্যাঁ, খুব অসুখ গেল, এখন ভালোই আছি।' বললেন, 'আমি আসবার আগে তোমাকে খবর দিতে পারিনি, তবে জানতাম তুমি খবর পেয়ে যাবেই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ফণীবাবু আমায় আপনার আসার সুখবরটি দিয়ে এসেছিলেন, তখন থেকেই আপনার কাছে কখন আসব তাই ভাবছিলাম।' বললেন ছেলেমানুষের মত, 'কি সুন্দর বাড়ি দেখেছ ? তারপর, গানটান কর আজকাল ? না সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছ ?' বললাম, 'গানের তৃষা আমার কোনও কালেই যাবার নয়। আমার মা বলতেন, ওর গান যাবে যেদিন ওর প্রাণ যাবে দেহ ছেড়ে।' কবি বললেন, 'যাক, শুনে খুশি হলুম যে তোমার গান শেখার মন আছে। এক তোমাকেই দেখলুম বিয়ে করেও গান ছাড়নি। তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে নয় গান, দুটো'র মাঝামাঝি কিছু নেই।' শুনে সকলেই হাসলাম ওঁর বলার ধরনে। আবার বললেন, 'কাশী তোমার কেমন লাগছে ? সঙ্গী সাথী জুটেছে কি ?' বললাম, 'মন্দ নয়, তবে মন এখনও বসেনি। থেকে থেকেই কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে।' অমনি বলে উঠলেন— চোখের সে ভাবই অন্য—'গানের লোভ ? এক কাজ করো ঝুনু, তুমি চলে এসো আমাদের শান্তিনিকেতনে তোমার স্বামীকে নিয়ে। তিনি সেখানে ডাক্তারি করবেন আর তুমি আমাদের তোমার গানে ভরে দেবে।' অসহায়ের হাসি হেসে চুপ করে রইলাম।

মনে পড়ে যাচ্ছে পরে আমার জীবনে একটা মস্ত সঙ্কটের দিনে তাঁর পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম আর তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তার কথা। সে-চিঠির খানিকটা এইখানে উদ্ধৃত করে দেবার বাসনা সংবরণ করতে পারলাম না:—

কল্যাণীয়াসু,

সুস্থ, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন ব্যথিত হয়েছে। তোমার বেদনা যে কত কঠিন আর তোমার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা বেশ বুঝতে পারছি। এই সময়ে দেশে যদি থাকতুম তাহলে আমার দ্বারা তোমার এই সঙ্কটের প্রতিকার যা কিছু সম্ভব তা আমি চেষ্টা করতুম।***

ইতিমধ্যে বিশেষভাবে শান্ত হয়ে থেকো। লোকনিন্দাকে অবজ্ঞা করবার উত্তেজনায় তাকে অনাবশ্যক কারণে প্রবল করে তুল না।

তোমাকে আমাদের ঘরের মেয়ের মতই অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করে থাকি নিশ্চয়ই তা তুমি জানো। তোমার অমলমাসী কতকাল আমারই ঘরেই ত মানুষ হয়েছেন। যদি কোনোদিন তোমার তেমন প্রয়োজনই ঘটে তাহলে আমার কাছে আসতে লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ কোরো না। এও তুমি জানো গানের ক্ষুধা আমার মনে কত প্রবল,—যদি আমারই ঘরের পাশে তুমি কোনো দিন বাসা বেঁধে থাকো তাহলে আমার দিনগুলি তোমার কণ্ঠস্বরে মধুর হয়ে উঠবে—আর আমার পথহারা গানগুলিও দিনের পর দিন তোমার মধ্যে আশ্রয় পেতে পারবে। সুতরাং মনে রেখো তুমি আমার কাছে থাকলে তুমি আমার কাজে লাগবে—তাতে তোমার ঋণ বাড়বে না। যদিও অকৃত্রিম স্নেহের সম্বন্ধে আত্মসম্মানের ক্ষুণ্ণতা ঘটে না তবুও এ-ক্ষেত্রে শুধু আমার স্নেহের যোগে না, তোমার নিজের স্বাভাবিক শক্তির গুণেও আমার উপর তোমার জোর দাবী চলতে পারবে।

মনের সঙ্গে কামনা করচি সমস্ত জঞ্জাল যেন কেটে যায়। সমাজে নিজের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠলে নানাদিক থেকে নানা দুঃখ ও অসুবিধা ঘটে তার থেকে তুমি রক্ষা পাও সর্বান্তঃকরণে এই আমি ইচ্ছা করি। তোমার সরল চিত্তের মধ্যে সুখী হবার স্বাভাবিক শক্তি আছে তারি জোরে সাংসারিক সকল আঘাতের উপর তুমি জয়ী হতে পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। দেশে ফিরে গিয়ে ভালো করে সকল কথার আলোচনা করা যাবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাশীতে মহারাজার বাড়িতে বসে সে সময়ে এই গানগুলি কবির কাছে শিখেছিলাম—'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন', 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই'। গান শেখা হয়ে গেলে রাত্রে কবির সঙ্গে আমরা সকলে খেলাম, তারপর বাড়ি ফিরলাম। পরদিন তিনি এলেন ফণীবাবুর বাড়ি, সেখানে গিয়েছিলাম। ফণীবাবুর বাড়ি ছিল আমার বাড়ির খুব কাছেই। হেঁটেই যাওয়া আসা করা চলত। তাঁর তৃতীয়া কন্যা রাণু (এখন লেডি রাণু মুখার্জি) ছিল কবির খুবই ভক্ত। কবি তাকে খুব স্নেহ করতেন। খুব মজা করতেন তাকে নিয়ে। ছোট্ট মেয়ে ছিল রাণু। কবিকে 'ভানুদা' বলে ডাকত। যেতেই কবি বললেন, 'এস ঝুনু, তোমার জন্যে অনেক গান তৈরী করে রেখেছি।' মনটা খুব খুশি হয়ে গেল। গিয়ে বসলাম পায়ের কাছে। কবি বসেছিলেন একটি আরাম কেদারায়। শেখালেন একের পর এক—'সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই', 'কেন রে এই দুয়ার-টুকু', 'আকাশ জুড়ে শুনিনু', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', 'কবে তুমি আসবে বলে', আর 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' এই গানগুলি। তার-পরের দিনও কবি ফণীবাবুদের বাড়ি এসে আমায় ডেকে পাঠান। গেলাম উৎফুল্ল হয়ে। কাছে যেতে বললেন, 'পরীক্ষা দাও ঝুনু, কি গান শিখলে।' হেসে বললাম, 'বেশ, শুনুন।' বলে গাইলাম সব গানগুলি, অর্থাৎ এগারোটি গান দুদিনে যা শিখেছিলাম। শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'Full marks!' মনে পড়ে ওঁর খুশিতে উদ্ভাসিত হাসিভরা সেই মুখ চোখের ভাব, সেই তাকাবার ভঙ্গী। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ঝুনু, তোমায় গান শিখিয়ে বাস্তবিক আনন্দ আছে। আহা, তোমায় যদি সেরকম কাছে পেতুম কত গান যে শেখাতুম মনের সাধে।' ওঁর অতখানি প্রশংসা পেয়ে আমিও যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। বার বার ঘুরে ফিরেই কবি ওই কথা প্রকাশ করতেন। আমার বড় সংকোচ হত। কতবার বলেছেন, 'তুমি জান না তোমার মুখে আমার গানে আমি কি শুনি। আমি ভুলতে পারি না তোমার গান।' শুনে বিব্রত বোধ করতাম, যদিও আনন্দের তরঙ্গ উঠত ভিতরে, কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করে মনে মনে বলতাম,—আমিও ভুলতে পারি না আমার গানকে তুমি কত ভালোবাসা দিয়ে কোথায় তুলে নিয়েছ।'

এইখানে ওঁর একখানা চিঠি তুলে দিচ্ছি যদিও অনেক পরের লেখা, আমি পণ্ডিচেরী আসবার দশ বছর পরে পেয়েছিলাম চিঠিখানা।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ছবি সমেত তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। ছবির আদিম দেহরূপিণীকে পেলে আরো খুশি হতুম। বোধহয় ঘটে উঠবে না, কারণ মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে, তার উপরে দেখতে দেখতে ভাঙন ধরেছে দেহে। সম্প্রতি ভাগ্যদেবী আমার চোখের মাথা খাবার ভয় দেখাচ্চে। চিঠিপত্র পড়ায় পরের দৃষ্টি ব্যবহার করতে হচ্চে। দৃষ্টিক্ষীণতা সবচেয়ে বড়ো কারাদণ্ড। নালিশ করে লাভ নেই। আপিলের আদালত বন্ধ।

হাসির গান পূর্বেই শুনেছি। ওর গলা মৃদু কিন্তু মধুর। ভয় হয় পাছে ওর নিজের গলার স্বাভাবিক দরদ কোনো শিক্ষিত ভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। যাদের গলায় সুরের বিধিদত্ত বিশেষত্ব আছে তাদের পক্ষে এটা লোকসান।

সেদিন —র গান অনেকগুলি ও অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি। কণ্ঠে ওর শিক্ষা আছে, জোর আছে, মাধুর্য আছে। আমার মনে হয় তার সঙ্গে একটা কিছু আছে যেটা সহজ নয়। প্রতিভার দৃষ্টিতে যে স্বতঃউৎসাহিত অনায়াসলীলা থাকে তার উপরে বাহিরের চেষ্টার হস্তক্ষেপ দেখলে দুঃখ বোধ করি।

'হে ক্ষণিকের অতিথি' মণ্টু সেদিন গেয়েছিল—সুরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি। তার মধ্যে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চেয়ে ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম শ্রোতাদের ভালো লাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে—অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত একটা বিশেষভাবের ব্যাখ্যা করে —সে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে—গায়ক ত গ্রামোফোন নয়। তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে—সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি তুমিও আছে—এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।

মণ্টুকে আমি স্নেহ করি, তার প্রাণশক্তি ও মননশক্তিকে তারিফ করি—তাকে কাছে পেয়ে খুশি হয়েছি। ইতি

৪।৮।৩৮

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন কাশীর বাস উঠিয়ে সবে কলকাতা এসেছি ১৯২৩-এর গোড়ায়। 'বসন্ত'-উৎসবে গাইবার জন্যে ডাক পড়ল। এই বসন্ত উৎসবে আমি ও চিত্র-

লেখা সিদ্ধান্ত দুজনেই কয়েকটা করে 'সোলো' গান করি। 'বসন্ত-উৎসব' হয়েছিল 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে' রাণী মহলানবিশ লিখেছেন তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ভূমিকায়। আমার ভালো মনে নেই কোথায় হয়েছিল। এখন আর ভালো মনে করতে পারি না কোনবার কোনটা কোন স্টেজে হয়েছিল। গিয়ে ঢুকতাম সাজঘরে, হয়ে গেলে বেরিয়ে আসতাম। যাই হোক, চিত্রলেখা গেয়েছিলেন, 'আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে', 'ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে কে', আর 'না যেও না যেও না গো'। আমাকে দিয়েছিলেন, 'ও আমার চাঁদের আলো', 'যদি তারে নাই চিনিগো', 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়', 'খেলার সাথী বিদায়-দ্বার খোল' আর 'যাওয়া আসারই এ কি খেলা।' শেষের গান দুটি হিন্দী ভাঙা গান। আমার মুখে নানা কাজওয়ালা হিন্দী গান শুনতে কবি খুব ভালো বাসতেন। আমিও প্রায়ই ওঁর কাছে গেলে এটা ওটা সেটা যা জানতাম গেয়ে শোনাতাম। অমনিতর দুটি হিন্দী গান সে সময় আমি গাই কবির কাছে বসে। শুনেই কবি বললেন, 'রোস, রোস, আমি বাংলাতে কথা বসিয়ে দিচ্ছি।' আমি গাইতে লাগলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কবি কথা বসিয়ে যেতে লাগলেন। 'মহারাজা কেওয়ারিয়া খোল' (গানটি শিখি অতুলপ্রসাদের কাছে), ভেঙে করে দিলেন, 'খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোল, এবং 'প্রেম ডগবিয়া মে ন করো' (শিখেছিলাম আমার এক খুড়তুতো ভাই এর কাছে) ভেঙে করলেন, 'যাওয়া আসারই এ কি খেলা।' কি দ্রুত যে কবি এই কথা বসানো কাজ শেষ করলেন। শেষ হতেই আমাকে বললেন, 'এই দুটি গানও তোমাকে বসন্ত-উৎসবে গাইতে হবে, কেমন রাজী তো?' আমি খুশি হয়েই সম্মত হলাম। এই সময়ে আরও একটি হিন্দী গান 'নর্‌মা কন্‌হইয়া' ভেঙে কবি করে দেন, 'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে।' এই গানটি সম্বন্ধে কারও কিছুই জানা নেই। আমারও আগের বিবৃতিতে (শ্রদ্ধেয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত আমার 'কবির সংস্পর্শে' লেখাটিতে) এ-গানের কোনও উল্লেখ নেই। দোষ কারোও নয় সম্পূর্ণ আমার। বিস্মৃতির অপরাধে অপরাধী আমি। গানটি সম্বন্ধে কোনও কিছুই আমার স্মরণ ছিল না। বুলা (পরম স্নেহভাজন প্রফুল্ল মহলানবিশ) যদি না এই গানটির কথা আমায় লিখে স্মরণ করিয়ে দিতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের এমন সুন্দর গানটি হয়ত চিরকালের মতন আমার বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেত, কোনও দিনও আর কেউই তার সন্ধান পেত না। বুলার কাছে এই জন্যে আমি কত যে কৃতজ্ঞ, যে-গানটির বিষয় জানিয়ে সে

আমার এত বড় অপরাধের ক্ষতিপূরণের উপায় করে দিয়েছে তার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা ও সুযোগ দিয়ে। তার চিঠি পড়ে সবই পরিষ্কার মনে এসে গেল। একটুও অসুবিধা হলো না। ভাবতে বড়ই আশ্চর্য লাগে যে এ গান আমি কেমন করে অমন বেমালুম ভুলে গেলাম যার চিহ্ন পর্যন্ত আমার মনে ছিল না। বসন্ত উৎসবের সময় গানটি শেখার পর সেখানে, কেন জানি না, আর গাওয়াই হয়নি। কেন গাওয়া হয়নি এ-প্রশ্নের উত্তর মন দিতে পারল না, তার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে সে গান আমার মন থেকে কবে কেমন করে এমনই সরে গিয়েছিল যার উল্লেখের কথা পর্যন্ত মনে উদয় হয়নি। বুলার চিঠি পাবার পর থেকে (চিঠিটি পাই 'রবীন্দ্রায়ন' প্রকাশিত হবার পর) এই গান সম্বন্ধে যা জানি তা প্রকাশ করার গুরুদায়িত্বের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এতকাল পরে আজ সব কথা প্রকাশ করতে পেরে সেই বোঝা নামিয়ে হালকা বোধ করছি। গান টি তুলে দিচ্ছি—

—বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে
নিশীথেরি সমীরণ হায়
মম মন হল উদাসী
দ্বার খুলিল
বুঝি খেলারি বাঁধন ওই যায়।

গানটি পড়লে আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এ-গান রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। এবং রচিত হয় বসন্ত উৎসবের জন্যেই। যদি ও এই গানটি সেবার বসন্ত-উৎসবে গাওয়াননি। আমার অক্ষমনীয় বিস্মরণের ত্রুটির জন্যেই রবীন্দ্রনাথের এমন গানটি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্থান পায়নি বা রবীন্দ্র রচনা বলে স্বীকৃতি পায়নি। এবার আমার সে-অপরাধ স্বীকারের পর আশা করি গানটি আর রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে নির্বাসিত হয়ে দূরে পড়ে থাকবে না এবং তার নিজের পরিচয়ের গৌরব লাভে বঞ্চিত হবেনা।*

এবার ফিরে যাই আগের কথায়, সামান্যই বলার বাকি আছে তার। বসন্ত উৎসবের দ্বিতীয় রাত্রে দেখা গেল চিত্রলেখা আসতে পারেননি। তাঁর গান-

* গানটি আমি 'রবীন্দ্র ভারতী'র জন্যে টেপ করে দিয়েছি, যদি কেউ চায় তো যেন শিখে নিতে পারে, এবং গানের সুর সম্বন্ধেও কোনও প্রশ্ন যাতে আর না থাকে। অতুল প্রসাদের 'শ্রাবণ ঝুলাতে' গানটিও এই সুরেই। হয়ত তিনিও একই হিন্দী গান থেকেই সুরটি নিয়েছিলেন।

গুলিও কবি আমাকে দিয়ে গাওয়ালেন ও বললেন, 'ভাগ্যে ঝুনু, তুমি সব গানগুলি শিখেছিলে?'

বসন্ত-উৎসবে ঠিক অভিনয়ের কিছু ছিল না। মুখ্যত ছিল গান ও কবির পাঠ। গান বেশির ভাগ ছিল 'কোরাস গান' দিনুদার নেতৃত্বে। তাছাড়া আমাদের কয়েকটা 'সোলো' গান ছিল। কবি বসেছিলেন স্টেজের একদিকে —একটু উঁচুতে ওঁর জন্যে সুন্দর করে আসন সাজানো হয়েছিল। দিনুদা বসেছিলেন তাঁর কোরাসের দলবল নিয়ে স্টেজের মাঝখানে মেজেতে। সব গানের সঙ্গেই দিনুদা এস্রাজ বাজিয়েছিলেন। আমাদের 'সোলো' গানের সঙ্গেও। দিনুদার এস্রাজটি ছিল একটা বিরাট জিনিস। এই বিরাট এস্রাজটি দিনুদার বিরাট দেহের উপর টেনে নিয়ে কাঁধে যন্ত্রটিকে হেলিয়ে দিয়ে যখন বসতেন বাজাতে তখন তা হত দেখবার মত। দেখে কবি একদিন হেসে বলেছিলেন, 'দিনু, ওটা তোরই হাতে মানিয়েছে ভালো!' দিনুদা আমরা সবাই খা হেসেছিলাম। সত্যি এতবড় এস্রাজ আমি জন্মেও আর দেখিনি। আমার আর চিত্রলেখার বসবার জন্যে একটু উঁচু জায়গা ছিল, দিনুদার গানের দলের ঠিক পিছনেই। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে যার যখন যে-গানের সময় হচ্ছিল গাইছিলাম। আমাকে মাঝখানে স্টেজ থেকে একবার বেরিয়ে এসে আবার 'বসন্ত'র সঙ্গে প্রবেশ করতে হয়েছিল 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' গানটির সঙ্গে। 'বসন্ত'র হয়ে গানও আমাকে করতে হয়েছিল, 'খেলার সাথী' গানটি 'বসন্ত'রই গান। কোরাস গান সব শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা করেছিল দিনুদার সঙ্গে। অনেকের সম্মিলিত গান আর কখনও শুনিনি। দিনুদা একাই ছিলেন এক শ। কি গলা! যেন গভীর অতল থেকে গম্ভীর ধ্বনি উঠত। রবীন্দ্রনাথের গান দিনুদার কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে উঠত। অমন রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমি আর শুনিনি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলতে কি বোঝায় তা দিনুদার মুখে একবার শুনলেই কারও বুঝতে বাকি থাকত না। আমরা—যারা এই সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ, যাদের সঙ্গীত পুষ্ট হয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে মাতৃদুগ্ধে সন্তান যেমন পুষ্ট হয়—অভ্যস্ত ছিলাম সেই রকম রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

এখানকার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে তাই আমাদের মন তৃপ্তি পায় না। মনে হয় তাতে কি যেন পাই না। কি যেন হয় না, কি যেন নেই। হারিয়ে গেছে কোথায়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের এখনকার পরিণতি দেখে দুঃখবোধ করি এইজন্যে যে, যা উনি দিয়ে গিয়েছিলেন; তা আর নেই বদলে গেছে অনেকটা। সেটা

ভালোর দিকে না মন্দর দিকে তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি যে-গান উনি দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের, আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি, পারিনি রাখতে তার অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও তো কম চেষ্টা করেননি। তবু থাকছে না যে, এইটে দেখা যাচ্ছে। তার কারণ কি? এক হতে পারে হয় তো এই যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এ-যুগের গায়কদের পছন্দ যাচ্ছে বদলে, কাজেই তার ধারাও যাচ্ছে পাল্টে। হাল আমলের যে নূতন সঙ্গীতধারা 'আধুনিক সঙ্গীত' বলে গড়ে উঠছে। তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যাচ্ছে হাল আমলের নূতন গায়ক সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তারা যে সেদিকে চলেছে এটা বললে নিতান্ত ভুল বলা হবে না। হতে পারে হয়ত এর খানিকটা প্রভাবে এখনকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতধারা তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর একটা কথা এই মনে হয় যে, আজকাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকলেই গেয়ে থাকেন। অতি সাধারণ গাইয়ে থেকে অসাধারণ গাইয়ে পর্যন্ত। কাজেই সকলেই ঠিকমত গাইতে পারবেনই বা সমান ভালো গাইবেন এমনটা আশা করা যায় না। তাছাড়া ভালো গাইয়ে হলেও সকলের কণ্ঠেই সব রকমের গানই যে সমান ফোটে এমনও তো নয়। তাই মনে হয় কোনও একটা কারণে নয়, নানা কারণে হয়তো তার গতি আজ এ-পরিণতির দিকে চলেছে আর এসেছে এ-পরিবর্তন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূলধারা কি তা এক কথায় বলা কঠিন। তবু বলা চলে, তাঁর কথা সুর ও ভাব এমনভাবে পরস্পর আশ্রিত, এমন নিবিড়ভাবে এক হয়ে মিশে থাকে যে কোনওটাই কোনওটাকে ছাপিয়ে ওঠে না বা একটা থেকে আর একটা প্রবল বা প্রধান হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্র সঙ্গীত মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই যখন সেই সঙ্গীত সত্তার মধ্যে কথা সুর ও ভাব সব এক হয়ে লীন হয়ে গিয়ে গায়কের গানে প্রকাশিত হয় আর গায়ক নিজেও হয়ে যান আর সঙ্গে এক। 'এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে,' যে স্পর্শ ফুটে ওঠে তাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলে যা আমরা জানি।—শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীতেই নয়, সব সঙ্গীতেরই আছে একটি বিশিষ্ট ধারা। গায়ককে তার অনুসরণ করে চলতে হয়, তবে সে পায় তাকে, দিতে পারে তার যথার্থ পরিচয়। কোনও বড় সৃষ্টি হতে পারে না যদি না আর্টিস্ট তার আর্টের অতীত যা তার সঙ্গে এক হয়ে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারে। এ-নইলে পূর্ণতর রূপ বা পরিচয় দেওয়া অথবা পাওয়া কোনওটাই সম্ভব নয়। সব আর্টের ক্ষেত্রেই এই হলো গোড়াকার কথা। সঙ্গীতচর্চা এখন ঘরে ঘরে, আমাদের দিনের চাইতে অনেক

বেশি। সকল রকম সঙ্গীতের চর্চাই ব্যাপক। সুতরাং কণ্ঠও আমাদের দিনের চাইতে তাদের বেশি তৈরী। তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেকের মুখে তেমন ফোটে না, আসল রূপটি পাওয়া যায় না। অথচ সুর হয়ত ঠিকই থাকে। সেই জন্যেই বলছিলাম ঠিক করে গাইলেই যে তা সবসময় রবীন্দ্র-সঙ্গীত হয়, তা বলা যায় না। অনেক সময় আবার এও দেখা গেছে কারও কণ্ঠে মূল সুর থেকে সুরের হয়তো কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে। কিন্তু তা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ঠিকই হয়েছে বলে মনে হয়েছে।

আমরা যদিও সুর সম্বন্ধে একটু বেশি কড়াকড়ি করে থাকি, রবীন্দ্রনাথ নিজে তা করতেন বলে। কিন্তু সুরই সব নয়। তার বেশি আরও কিছু আছে। সুরের যে এত তারতম্য আজকাল ঘটছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ করি ছিলেন কতকটা দায়ী। কেননা তিনি অনেক সময়, সুর ভুলেই হোক বা সুর বদলাবার জন্যেই হোক, দেখা গেছে একই গান সব সময়ই ঠিক একই সুরে সকলকে শেখাননি। অনেক সময় তার তারতম্য ঘটেছে। যদিও তা খুবই সামান্য হত। এত গান তিনি রচনা করেছেন যে, সব হুবহু মনে রাখা তাঁর সম্ভব ছিল না। সেই জন্যে তাঁর গানের কোন সুরটা ঠিক এ-নিয়ে তর্ক চিরকালই থেকে যাবে। তারপর ক্রমে এর গলা থেকে ওর গলায় একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে আজ সুরের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে এখনকার গাইয়েদের গানের অনেক অমিল দেখতে পাই। এখানে এসে অনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী আমাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়েছেন। কোনও গানই আমরা যা জানি তা পাইনি। এতটা পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ কখনওই করতে পারেন না, কেননা তিনি নিজে তাঁর সুর সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। ভুল যা হয়ে যেত তা তাঁর অসতর্কতার জন্যে অন্তত নয় এটা বলা যায়। তিনি কাজে-কর্মে সবকিছুতেই অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন, অসতর্কতাবশতঃ কিছু করা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। শুধু তাই নয়, যাদের তিনি গান শেখাতেন তাদের চেতনার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতেন ভুল সম্বন্ধে সতর্কতা। তাই মনে হয় মানুষের মুখে মুখেও বেশ কিছুটা বদলে গিয়ে থাকবে। যাইহোক এটা ঠিক যে তাঁর গানে সুরের পরিবর্তন ঘটানো তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি শেষটা অগত্যা মেনে নিয়েছিলেন গানে গায়কের স্বাধীনতার অধীকার, কিন্তু সেটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন অগত্যা হিসেবেই, অন্তরের সঙ্গে নয়। অন্তরের অনুমোদন যে তাতে খুব ছিল তা নয়। যে-মূর্তি তাঁর নিজের হাতে গড়া, তার উপর 'বাহিরের হস্তক্ষেপ' দেখলে তিনি বেদনা

বোধ করতেন, এ আমি জানি। অনেক সময় আমরা তর্ক করি সুর নিয়ে, সুরের দিকটায় একটু বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। ভাবি সুরটা ঠিক হলেই হল বুঝি। কিন্তু তা তো নয়। সুর হল তাঁর সঙ্গীতের বাইরের রূপ কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। মনে রাখতে হবে তা ধারণ করে আছে ভিতরের আসল পদার্থকে। সেজন্যে শুধু সুর ঠিক হলেই সব হল না, সেই আসল পদার্থ বা তার অন্তরের নির্যাস তাতে ধরা পড়ল কিনা সেইটেই হল আসল কথা, বড় কথা। এইটেই সেই যাচাই করবার কষ্টিপাথর যার স্পর্শে ধরা পড়ে কোনটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর কোনটা নয়।

অনেককে বলতে শুনেছি—সুর হুবহু তুলে, অবিকল সেই ঢঙে, সেইভাবে গাওয়া হল শুধু অনুকরণ। অনুকরণ অন্য জিনিষ। অনুকরণের কারবার শুধু বাইরেটাকে নিয়ে।—আমার মতে অনুকরণ হয় তখনই যখন শুধু এই বাইরেটাকে নিয়ে মাতামাতি করা হয়, যখন গায়ক নিজেকে তার মধ্যে দিতে পারে না, তার সঙ্গে এক হয়ে তার ভিতরকে বাইরে এনে সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয় না। চলে শুধু যন্ত্রের মত প্রাণহীন। পায় না রস, পায় না প্রেরণা। মূল প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারা বা একীভূত করতে পারাটা একটা শিক্ষ, একটা সাধনা, এবং একটা ক্ষমতাও বটে।

স্বরলিপি দেখে স্বরলিপির সুর ঠিক রেখে এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার প্রচলন চলেছে। স্বরলিপি দেখে গান তোলা শিক্ষার দিক দিয়ে আবশ্যক। সঙ্গীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না স্বরলিপি না জানলে। তবে শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। গায়কের মনে রাখতে হবে যে স্বরলিপি কখনও ষোল আনা দিতে পারে না। যতটুকু সে দিতে পারে ততটুকুকে যদি 'সব' বলে ধরে নেওয়া হয় তবেই মুশকিল। গায়ককে দিতে হয় অনেকখানি—যা স্বরলিপিতে পাওয়া যায় না তার সবটাই। তাতে তার দায়িত্ব আছে। যার গান তোলা হয় সেই সঙ্গীত স্রষ্টার নিজস্ব ধারা রীতিনীতি ভাবভঙ্গী সবের সঙ্গেই তার থাকা দরকার পূর্ণ পরিচয়। তবেই স্বরলিপি দেখে গান তোলা সম্ভব হতে পারে সার্থক হতে পারে এই প্রচেষ্টা—নইলে বাকি থেকে যায় অনেকটা। আর বাদ পড়ে যায় গানের অনেকখানি। স্বরলিপি দিতে পারে মোটামুটি সুরটা কিন্তু দিতে পারে না গহনার নির্দেশ। দিতে পারে না ভাবের সুরের আলোছায়ার বা সূক্ষ্ম কিছুর স্পর্শ, দিতে পারে না প্রাণের স্পন্দন, আসল রূপের পরিচয়। আর দিতে পারে না সুরের অতীত সেই সোনার কাঠির স্পর্শ যাতে গান হয়ে ওঠে গান আর যথার্থরূপে ফুটে ওঠে

তার সত্তা। স্বরলিপির প্রয়োজন আছে, মূল্যও আছে, কেননা সুরকে সে খানিকটা ধরে রাখতে সক্ষম হয় অনাগতকালের জন্তে আর ভুলে-যাওয়া সুরকে সে ধরিয়ে দিতে পারে—এই হল তার প্রধান কাজ।—সঙ্গীত এমনি জিনিস যার বিষয় কিছু বলতে চাইলে মনে হয় গেয়ে দেখাতে পারলে কাজ হত, শুধু বলে বোঝাতে গেলে ফল হয় না বিশেষ কিছু।

একবার 'অরূপ রতন' কলকাতায় হয়—আমাকে সুরঙ্গমার গানগুলি কবি গাইয়েছিলেন—'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,' 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী', 'এখনো গেল না আঁধার,' 'বাহিরের ভুল হানবে যখন', 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর', 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে'। সেবারে 'সুদর্শনা' হয়েছিল রানু (এখন লেডি রাণু মুখার্জি)। 'অরূপ রতনে'র কথা বিশেষ কিছু মনে নেই আমার। তার মধ্যে আমার জীবনে যা অবিস্মরণীয় তা এই যে এই 'অরূপ রতনে' রবীন্দ্রনাথ আমায় অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন। সামান্য অভিনয়ই আমার ছিল। বিশেষ করে মনে আছে। একটি মালা হাতে করে, হাতের কবজিটি সামান্য ঘুরিয়ে কেমন করে রাখতে হবে একটি থালায়, তা উনি কি সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাতটিকে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, 'হাতটা এত শক্ত করে টেনে রাখো কেন, বেশ স্বচ্ছন্দে সহজভাবে ভালো করে বার করে মেলে দাও।' উনি হাতটিকে বার করতেন কি সুন্দর করে, না দেখলে বুঝতেই পারতাম না, তারপর সেই কবজি ঘুরিয়ে মালাটি রাখবার দৃশ্য—সে যে কি সুন্দর! দেখবার মত! এই একটা সামান্য ব্যাপারকে যে কত সুন্দর করে করা যায় তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর কাছে এই শিক্ষা মধ্যে দিয়ে।

একবার বোলপুর গিয়েছিলাম বেড়াতে। সেবার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুরুলে। রথীবাবু প্রতিমাদি সঙ্গে ছিলেন। আমরা একদল শান্তিনিকেতন থেকে পায়ে হেঁটেই চললাম গান গাইতে-গাইতে সুরুলের রাঙা মাটি বিছানো পথে। বিশেষ করে 'গ্রামছাড়া এই রাঙা মাটির পথ' গানটি সেই পথযাত্রায় কি যে আনন্দ দিয়েছিল! ফিরবার পথেও মনে আছে, তখন চাঁদের আলোয় ভরে গেছে চারিদিক। মাঠের মধ্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম কয়েকজন। আর গান ধরলাম, 'জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে'—ভরা জ্যোৎস্নায় বেহাগের অন্তরস্পর্শী মধুর সুর খোলা মাঠে স্তব্ধ নির্জন রাতে যেন কি এক আবেশের সৃষ্টি করেছিল। তারপরেও গেয়েছিলাম—'তোমারি মধুররূপে'। চাঁদের আলোয় এমনি পরপর অনেক গান প্রাণ ভরে গেয়ে খুব আনন্দ করে

বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে। শান্তিনিকেতনে গেলে একটা খুব মজা লাগত যে, কে আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি তার কোনও হিসেব নিকেশ বা কৈফিয়ত কারও কাছে দিতে হত না। এমন-কি নিজেদের দলের কাছেও না। যার যখন যেখানে ইচ্ছে চলে যাচ্ছি, বেশ একটা বেপরোয়া ভাব—স্বাধীনতার একটা অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করা যেত।

সুরুলে সেদিন সারাদিন আমরা যেন আবেশের মধ্যে ছিলাম। খুব আনন্দে সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটল। ওখানে পৌঁছেই পুকুরে গিয়ে স্নান করতে নামা গেল। স্নান সেরে দোতলায় এসে দেখি বসবার ঘরে কবি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'কি ঝুনু, তুমি নাকি পুকুরে গিয়ে নেমেছিলে? তোমার উৎসাহ ত দেখছি শুধু গানেই নয় সবেতেই সমান।' আমি বললাম, 'সাঁতার কাটতে যে ভীষণ ভালো লাগে, উঠতে ইচ্ছে করে না জল থেকে।' বললেন, 'সাঁতারও তোমার জানা আছে বুঝি? কোথায় শিখলে?' আমি বললাম, 'কেন, আমার মামার বাড়িতে মস্ত পুকুর আছে, আমরা পুকুরে নেমে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। এখনও সুবিধে পেলেই করি।' কবি রঙ্গ করে বললেন, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।' আমি ওঁর দিকে তাকালাম। ওঁর কি মনে হল, তখনই আবার বললেন, 'কি তোমার আপত্তি হচ্ছে কথাটায়? তাহলে তো আরও প্রমাণ হচ্ছে তুমি কত ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষরাই এ কথায় আপত্তি করে। কেন-না তারা কেবলই বড় হতে চায়—এইটেই তাদের সাইকোলজি। তুমি লক্ষ্য করে দেখো। বয়স যাদের হয়েছে তাদের বয়স কম দেখায় বললে তারা কি রকম খুশি হয়।' বলেই ওঁর স্বভাব-সুলভ দৃষ্টি আর ভঙ্গী নিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'সেটা তো বোকামি।' শুনে উনি খুব হাসলেন, বললেন, 'ছেলেমানুষি, কিন্তু বোকামি নয়, ভুল কোরো না। তার মধ্যে বেশ একটা সহজ সজীব সরসতা, একটা সারল্য আছে যার মধ্যে বুদ্ধির কোনও অভাব নেই।' ওঁকে দিয়ে আরও কথা বলানোর জন্যেই আমি উত্তরে বললাম, 'আপনিই তো লক্ষ্মীর পরীক্ষায় লিখেছেন—

'ও জিনিষ বেশি সরল হলে,
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।'

'তুমি আবার সেটি মনে রেখেছ? তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি। আমারই কথা দিয়ে আমায় কোনঠাসা করবার চেষ্টা?' বলে কবি খুব হাসতে লাগলেন, আমরাও যোগ দিলাম। আবার আগের কথায় ফিরে এসে বললেন, 'বহু বুদ্ধিমান জ্ঞানীগুণীর মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষি দেখা যায়। তাদের তো

তুমি বোকা বলতে পার না। বরং তাকে তুমি তাদের খেয়াল বলতে পার।' যাই হোক কবি তো আমাদের গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। ওখানে দিনুদাও বসেছিলেন। স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের মেয়েরা কেউ কেউ ছিলেন আমাদের এই দলে। কবি গাইলেন। দিনুদাও গাইলেন। আমি আর আরুশিদি (স্যার নীলরতনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রী অরুন্ধতী দেবী শ্রীকেদার চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী) করলাম। গাইতে-গাইতে কোথাও সংশয় হলেই কবি দিনুদার দিকে চোখ তুলে একরকম করে তাকাচ্ছিলেন আর দিনুদা গেয়ে ওঁর সংশয় মিটিয়ে দিচ্ছিলেন। সুরুলে এইখানে, এইঘরে বসে দিনুদার কাছে আমি 'কী রাগিনী বাজালে' আর 'আমার পরাণ লয়ে' এই দুটি গান শিখি। কবিও বসে শুনছিলেন। স্যার নীলরতনের বড় মেয়ে বেবুদি (শ্রী নলিনী দেবী, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী) কবিকে বললেন, 'ঝুনু খুব সুন্দর কীর্তন গায়'। তিনি বললেন, 'তাই নাকি, আমাকে শোনাবে তো'? আমি গাইলাম কীর্তন। শুনে বললেন, 'কোথায় শিখলে তুমি এ গান?' বললাম, 'পান্নাবাঈ-এর রেকর্ড থেকে। তাছাড়া আমার মামার ওখানে খুব কীর্তন হয়, অনেক শুনেছি এঁদের সকলের কীর্তন।' দেখলাম কীর্তন উনি ভালোবাসেন। বললেন, 'অবনদের বাড়িতে প্রায়ই হত পালাকীর্তন।' কীর্তন সম্বন্ধে আমি একদিন কথা তুলেছিলাম ওঁর মতামত একটু বিস্তারিত জানবার জন্যে। উনি বেশ সুন্দর করে বলেছিলেন, 'কীর্তন জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। এর মধ্যে ধার করা কোথাও কিছু নেই। সবটাই তার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। সুরধারা, ভাবধারা, তালের ধারা, গাইবার প্রণালী, পদ্ধতি, ভঙ্গী সব নতুন। তার গঠনও নতুন। কীর্তন গঠিত ভিন্ন উপাদানে। যার মূল উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম ভক্তি ও তার রসমাধুর্যের লীলায়িত প্রকাশ। সেজন্যে কীর্তনকে বলা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। কীর্তন আবার অনেক রকমের আছে। নানা শ্রেণীর নান শাখা প্রশাখা। তাদের আবার নানা ধারা ও প্রতি ধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কীর্তন বেশ একটা বিরাট ব্যাপার, ছোট খাটো একটা কিছু নয়।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমপর্যায়ে পড়ে? বিরাটত্বে? বললেন, 'অমন করে কি বলা যায়? তবে কীর্তন ভাবলেই একটা বেশ বড় কিছু মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাঙ্গীতিক মূল্যে দেখা যায় এতে রয়েছে সুরের ঐশ্বর্য যত তালেরও তত, আর ভাবৈশ্বর্যের তো কথাই নেই। সঙ্গীতজগতে এর দান বড় কম নয়। এই যে কীর্তনের পালা। এই পালা জিনিসটাই তো একটা নতুন জিনিস, এ-রকম ড্রামাটিক সঙ্গীত আমাদের

দেশেও আগে ছিল না। কীর্তন সবাই গাইতে পারে না। এর জন্তে একটি বিশেষ ভাবের গলার প্রয়োজন।'

১৯২৬ সালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলাম এ-সময়ে গিয়ে তাঁর কাছে যদি থাকতে পারতাম। অনেক অসুবিধা সত্বেও শান্তিনিকেতনে তিনি আমার থাকবার বন্দোবস্ত করে এই চিঠি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়াসু,

ঝুনু, তোমার এখানে আসার বাধা নেই। আমার বাড়ির পাশেই যে বাংলাঘর আছে তার চালের অবস্থা শোচনীয়। অর্থাৎ শীতের সময় কাজ চলে যাবে কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির আবির্ভাব হলে ভিতরে বাইরে বিশেষ ভেদ থাকবে না। চালটা মেরামত করে দেব সে-ভরটুকুও সইবে না—হয় মানুষে নয় দৈবে ওটা সরিয়ে দিলে তারপরে আগাগোড়া নতুন করে বানাতে হবে। আপাততঃ সে-সম্ভাবনা নেই—চৈত্রমাসের পূর্বে আশাকরি তার প্রয়োজন নেই। সমস্ত আশ্রমে আর একটিও বাড়ি খালি নেই। যাইহোক এখন সময় ভালো—খোলা আকাশ বাতাস আর আলোর অভাব হবে না। একজন অনুচরী ও অনুচর সঙ্গে এনো! তোমার পথ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করবার জন্মে একটুখানি জায়গা পাওয়া যাবে। বৌমা, কমল, এঁরা তোমার যত্ন করতে ত্রুটি করবেন না। কখনো কখনো কাজ-কর্মে আশ্রম থেকে আমাদের অন্তর্ধান করতে হয়—তোমার কেউ সঙ্গিনী থাকলে সেইরকম অরাজকতার সময় ক্ষতি হবে না। আশাকরি শরীর বিশেষ খারাপ হয়নি। ইতি ২৫ পৌষ ১৩৩৩

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে সময় শান্তিনিকেতনে কবির পাশের বাড়িতে ছিলাম প্রায় তিনমাস। কোনোদিনও ভুলতে পারব না আমার জন্মে রবীন্দ্রনাথ তখন কি করেছিলেন। আমি অসুস্থ হয়ে যেভাবে ওঁর কাছে গিয়ে পড়ি আর উনিও যে কিভাবে আমায় তুলে নিয়েছিলেন, স্থান দিয়েছিলেন অনেক অসুবিধা সত্বেও, সাড়া দিয়েছিলেন আমার ডাকে! আমার জন্মে ওঁকে কম মুশকিলে পড়তে হয়নি। সে সময় তাঁর কত যত্ন পেয়েছি। কত স্নেহ! তাঁর মধুর সুকোমল স্পর্শ তখন আমাকে নবজীবন দান করেছিল। বারবার ঘুরেফিরে দিনের মধ্যে কতবার আমাকে দেখতে আসতেন। তাপ দেখতেন কপালে হাত দিয়ে। আর কিসে ভালো হয়ে উঠব তার জন্মে কতই না ভাবতেন, কত উদ্বিগ্নই হতেন আমার

জীবনের কথা ভেবে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে খাওয়াতেন। হোমিওপ্যাথিতে ওঁর খুব বিশ্বাস দেখেছি। প্রতিমাদি, কমল বৌঠান (দিনুদার স্ত্রী) এঁরা সে সময় আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁদের যত্নে আদরে। প্রতিমাদি তো রোজ আমার খাবার সময় নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াতেন। তাঁদেরই রান্নাবাড়িতে আমার পথ্য তৈরি করতেন নিজে সব দেখে। এঁদের ঋণ কোনও জন্মেই শোধ দেবার নয়।

একদিন মনে আছে বসে ছিলাম খাটে, সন্ধ্যের একটু আগে হবে, কবি এলেন দেখতে, কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'আজকে মনে হচ্ছে জরটা নেই।' আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কি বুঝলেন জানি না। আস্তে আস্তে পাশে এসে স্নেহভরে পিঠে হাতটি রাখলেন, দৃষ্টি তখন দূর দিগন্তের পানে, ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন, 'শেষরাত্রির নিবিড় ঘন অন্ধকার থেকে আসে ভোরের আলো। যখন মনে হয় চারিদিকে যেন অকূল সমুদ্র, কূল কোথাও নেই, তখনই দেখা যায় কূল। আমরা যখন হালছেড়ে দিই তিনি তখন হাল তুলে নেন। যে-অভিজ্ঞতা তোমার হল এ-অভিজ্ঞতা জীবনে কমই আসে। বিশেষভাবে তোমাদের জীবনে সেটার সুযোগ কমই আসে। তোমাদের চারিদিকে এত বাঁধাবাঁধি যে. সে সুযোগ যদি কখনো আসেও তো ঝড়ের মত সব যেন ভেঙে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' আমি বললাম, 'আমারই তো তাই, দেখুন না যেন সব ভেঙে, যেখানে যা ছিল খসিয়ে তবে ঠাণ্ডা হল। কিন্তু এর মধ্যে আমি যে নির্দেশ যে-পথ পেয়েছি তারই আনন্দে ও তৃপ্তিতে আমি এখন চলেছি। যাত্রা আমার থামবে কোথায় জানি না। জানতে ইচ্ছেও করে না। চলায় আনন্দ পেয়েছি তাই চলেছি। আমার জীবনে এ-অভিজ্ঞতা যে হলো, আমি যে এই সঙ্কটময় পথের ভিতর দিয়ে অটল সঙ্কল্প নিয়ে চলতে পারছি, এতেই আমার আনন্দ, এই আমার দুঃখের পুরস্কার। তাই সত্যিকারের দুঃখ আজ আমার কিছু নেই।' তিনি বললেন, 'এটাই তোমার মুক্তির আনন্দ। এতদিন তোমার ভয় ছিল, সুনামের আকাঙ্ক্ষা ছিল, চারিদিকের বন্ধন ছিল। ঝড় উঠবার আগেই মানুষকে একটা আতঙ্কে কাবু করে দেয়। কিন্তু যখন দুঃসময় আসে, দেখা যায় তখন তার ভিতর আত্মসমর্পণ করেই মুক্তির জন্যে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন ভয় আর তার থাকে না। মুক্তির আলোর মধ্যে নিজেকে মুক্ত দেখে আনন্দ বোধ করে। তোমারও আজ সেই আনন্দ। তুমি জানতে যে-বন্ধন তোমায় এতদিন বেঁধে রেখেছিল। সে-সব মিথ্যা জেনেও, ভয়ের আশ্রিত তুমি সেই মিথ্যার কাছেই নিজেকে আহুতি দিয়ে চলেছিলে—সময় এল, তোমার মধ্যে যা

সত্য তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—'আর নয়।' তখন তোমার হল জাগরণ। সত্যের আলোকে তখন নিজেকে দেখলে—সাহসে ভর করে উঠেছ, তাই দেখলে যে বন্ধন যে-সম্বন্ধ মিথ্যা তা খসে পড়ল। যা সত্য তাই রয়ে গেল। তাই তোমার আনন্দ আজ সেই মুক্তির আনন্দ, সত্যের জয়ের আনন্দ—মিথ্যার জঞ্জাল তোমার সব ঘুচে গিয়েছে, তোমার মধ্যে যা সত্য তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।' —তাঁর এই গভীর কথাগুলির মধ্যে কি যে তখন পেয়েছিলাম। এই কথোপকথন আমার একটি বন্ধুকে পত্রে আমি তখনই বসে লিখেছিলাম। সেই চিঠিখানা আজও ছিন্ন অবস্থায় আমারই কাছে পড়ে রয়েছে দেখলাম। তার থেকে লিখে দিলাম।

কবি ছিলেন তাঁর 'কোণার্ক' বলে ছোট একতলা বাড়িতে। আমি তাঁর পাশের যে বাড়িতে ছিলাম তা একেবারে ওঁর বাড়ির গায়ে লাগা বললেই হয়। ওদের বাড়িতে ওরা কথাবার্তা কইলে আমি শুনতে পেতাম আমার ঘরে বসে, এতই কাছে। কবি প্রায়ই গলা খাঁকারি দিতেন শুনতাম, তাঁর উপস্থিতিটা নানাভাবে সর্বদাই অনুভব করা যেত। মনে হত তিনি কাছেই রয়েছেন। যখনি শুনতাম কবি গুন্‌গুন্ করে গাইছেন তখনই বুঝতাম তিনি নতুন গান বাঁধছেন। গান রচনা করতেন, ওই ভাবে গাইতে-গাইতে একই সঙ্গে এসে যেত ওর কথা ও সুর, কবির মুখেও এ-কথা শুনেছি। আর, সময়-অসময় নেই, যখন দিনুদাকে তাঁর বাড়ির দিক থেকে কবির বাড়ির দিকে হন্ হন্ করে আসতে দেখা যেত বুঝতে বাকি থাকত না যে কবির কোনও নতুন গান তৈরি হয়েছে তা শিখে নেবার জন্যে দিনুদার ডাক পড়েছে। আমার বাড়ি থেকে দিনুদাদের বাড়ি পরিষ্কার দেখা যেত। উনি যখনই আসতেন আমি দেখতে পেতাম। ওর বাড়িটা একটু দূরে ছিল। কিন্তু মাঠের মাঝখানে খোলা জায়গার উপর মাত্র ওই একখানা বাড়িই ওইদিকে থাকায়, দূর থেকে পথরেখা সমেত বাড়িখানি ছবির মত দেখাত। আমি কোনও দিন একটু ভালো বোধ করলে কবির বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। একদিন আমি সবে গিয়েছি, দেখি দিনুদা এসে হাজির। বুঝলাম ব্যাপারটা কি। অধীর আগ্রহে কবির মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কবি বললেন, 'আজ একটা নৃত্যসঙ্গীত রচনা করা গেল, এই সবে শেষ করলুম।' বলে সদ্যরচিত 'নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ' গানটি গেয়ে আমাদের শোনালেন। অসম্ভব ভালো লাগল আমাদের গানটি। সকলেই উচ্ছ্বসিত, দিনুদার চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কবির মুখে গানটি শুনেই আমার কেমন মনে হল এই গানটির চারিটি স্তবক চার

রকম তালে বসালে নাচ বেশ জমবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বলে ফেললাম, 'আপনার এই নৃত্যসঙ্গীতের চারটি স্ট্যাঞ্জা চাররকম তালে বসালে কেমন হয়?' দেখলাম ওর বেশ পছন্দ হয়েছে কথাটা, উনি দিনুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার তো মনে হয় বেশ ভালোই হবে—কি বলিস রে?' দিনুদাও সাগ্রহে অনুমোদন করলেন। কবি গানের চারিটি স্তবকের চার রকম তাল করে দিলেন। আমরা যখন এই গান শিখি তখন 'নমো নমো নমো, তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম' এই অংশটি ছিল না, এটা ছাড়াই আমরা তখন গেয়েছি। পরে কবি এই অংশটা জুড়ে দিয়েছিলেন।

এ-সময়ে শান্তিনিকেতনে 'নটির পূজা'র রিহার্সাল চলছে। কলকাতায় হবার কথা শীগগীরই। শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বড় মেয়ে গৌরী সেজেছিল নটী শ্রীমতী। তখনি নাচের টেকনিক এত আয়ত্ত হয়নি এদের কারও। কিন্তু টেকনিক না জেনেও গৌরী নাচের মধ্যে দিয়ে যে-ভক্তিরস ফুটিয়ে তুলেছিল তার তুলনা নেই। তেমন আর আজও চোখে পড়ল তা। সমস্ত ভিতরকে সে বাইরে সামনে বের করে এনেছিল। ফুটিয়ে তুলেছিল নাচের অপরূপ ভঙ্গিমার মধ্যে। গৌরীর সে-নাচ যারা দেখেছিল তারা বোধহয় জীবনেও তা ভুলতে পারবে না। আমি তো আজও পারিনি। অভিনয়ের জন্যে কলকাতা যাবার আগে কবি শান্তিনিকেতনে একবার নটীর পূজা করিয়ে নিলেন তাই দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো' গানটির সঙ্গে গৌরীর সে অপূর্ব নাচের ভাব ব্যঞ্জনায় সকলেই সমভাবে অভিভূত হয়েছিল নয়নে জল নিয়ে, সে ভুলবার নয়।

আমার শান্তিনিকেতনে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। ওখান থেকে কবির সঙ্গেই আমি যাত্রা করলাম, বোধ করি ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে। কবি নেমে গেলেন কাশীতে, আমি গেলাম সোজা লক্ষ্ণৌএর দিকে ভাওয়ালীর পথে। কবি যেখানেই থাকতেন সেখান থেকেই আমার খবর নিতেন সদাসর্বদাই। শিলং থেকে তাঁর একটি চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ওজন কমে যাচ্ছে শুনে খুশি হলুম না। কিসের তোমার স্যানিটেরিয়ম। ওর চেয়ে আমাদের সেই ভাঙা খোড়ো চালের ঘরে যে ছিলে ভালো। কিন্তু সে-ঘরটারও ওজন প্রতিদিন তোমারই মতো কমে আসচে—ঝড়-বাদলে তার স্বল্পাবশিষ্ট চালের খড়গুলোর 'পরে দস্যুবৃত্তি করচে—তার ছিদ্রসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে উঠল।

বিচিত্রার কাছ থেকে দক্ষিণা পেয়েছ বলে ভারি অহংকার হয়েচে দেখচি—মনে রেখো আমিও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পেয়ে থাকি—অতএব তোমার যতই উন্নতি হোক আমাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে উঠতে পারোনি। কিন্তু তবু চেষ্টা করতে ছেড়ো না।

আমি খুব শীঘ্রই আবার সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত—এবার যাচ্ছি পূবের মুখে—প্রথমে মালয় উপদ্বীপে গিয়ে যাব জাভায়। তোমার খবর আবার কতদিনে পাব তা জানিনে। যদি নভেম্বরে ছাড়া পাও তবে আশাকরি তার আগে ফিরে আসব।

একটা উপন্যাস লিখতে বসেছি—এখনো উপন্যাস লেখবার বয়স আছে কি না সন্দেহ—অন্তত জীবনে উপন্যাস ঘটবার আশা নেই—সেই কারণেই কলমেও তার স্রোতে বাধা পড়ে। এখন উচিত শান্তিজাতক বাংলায় তর্জমা করা। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাওয়ালী থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি পণ্ডিচেরী চলে আসবার আগে। এখানে সমুদ্রবক্ষে ইউরোপগামী একটি ফরাসী জাহাজে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাসে। তিনি যাচ্ছিলেন ইউরোপে। সঙ্গে ছিলেন রথীদা, প্রতিমাদি, পুপু (নন্দিনী), অমিয় চক্রবর্তী ও তাঁর পত্নী হৈমন্তী। জাহাজে সেদিন ওদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছিলাম। আমি প্রতিমাদির কেবিনে তাঁর কাছেই বেশি সময় ছিলাম।

পণ্ডিচেরী চলে আসবার কথা তাঁকে যখন চিঠি লিখে জানাই, তিনি পত্রোত্তরে যে চিঠি লেখেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ আনন্দ বোধ করচি। জীবনে চরম সার্থকতার প্রবর্তনা বাইরের উপদেশ থেকে হয় না। শুভ মুহূর্তে ভিতর থেকেই জেগে ওঠে। তোমার চিত্তের মধ্যে সহসা সেই উদ্বোধন যে এসেচে এ তোমার চিত্তের পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া তুমি যে সাধনার ক্ষেত্রেও সাধনার সহায় পেয়েচ, সেও তোমার দুর্লভ সুযোগ। এই সুযোগ তোমার জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করুক এই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। ৩ পৌষ ১৩৩৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একটা মজার অথচ চমৎকার উপভোগ্য চিঠি তুলে দিচ্ছি। বাংলা দেশে থাকতে তিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর একটা কাটাকুটিওয়ালা কবিতার খাতা আমাকে দেবেন। এখানে এসে সেই কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। এই সেই চিঠির উত্তর—

কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে আমার কাটাকুটিওয়ালা কবিতার আস্ত খাতা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম একথা আমি অস্বীকার করব। বলচিনে তুমি মিছে কথা বলচ—আমার বক্তব্য এই যে প্রতিশ্রুতি শব্দটা আপেক্ষিক। এক সময়ে ওটা সত্য ছিল। এখন আর সত্য নয়। প্রথম কথা প্রতিশ্রুতিটা স্মরণে নেই, দ্বিতীয়ত সে খাতাগুলোর অস্তিত্ব নেই। একদা সে সব খাতা যারা হস্তগত করেচে তারা তোমার কাছে আমার প্রাগৈতিহাসিক প্রতিশ্রুতির খাতি ফিরে দেবে না। আজকাল নিজে যা উৎপন্ন করি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অধিকার বর্জিত। তুমি যদি নিকটে থাকতে তাহলে তাজা লেখা হাতে হাতে কেড়ে নিতে পারতে। বিশেষ তোমার গানের অনুসরণ যদি করত তোমার দাবী, তাহলে আইন-কানুন সমস্ত অগ্রাহ্য করতুম। দূরত্বের অনেক অসুবিধা আছে—প্রথমত জবরদস্তিতে হাজার মাইলের ব্যবধান পড়লেও সেটা দুর্বল হয়, দ্বিতীয়ত গানের গলা পৌঁছয় না এতদূরে। তুমি বুদ্ধিমতী সুবিবেচক, আমার যুক্তিগুলি আলোচনা করে তোমার আবেদন প্রত্যাহার কর—যদি নাও কর তাহলেও ফলের তারতম্য হবে কিনা সন্দেহ আছে।—তোমার বই-এর জন্যে যে গানগুলি চাও নিয়ো, দরখাস্ত তোমার হয়ে আমিই করব। রেকর্ড পাঠাবার কথা রথীকে জানাবে।

তোমাকে দেখবার এবং তোমার গান শোনবার জন্যে ঔৎসুক্য মনে জাগে—কিন্তু যেখানে উভয় পক্ষই পর্বত, কেউই মহম্মদ নয় সেখানে সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ দৈবাধীনে—হয়তো হবে কোনো এক সময়ে পণ্ডিচেরীতে যাবার প্রস্তাব করলে, আত্মীয়স্বজনেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তাদের ভয়, যাত্রী পাছে বা ন পুনরাবর্ত্ততে। ইতি ৮ আষাঢ় ১৯৪৩।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাটাকুটিওয়ালা একটি খাতা আমাকে তিনি পাঠিয়ে দেন এই চিঠি লেখার পরই।

১৯৩৫ কি ৩৬ সালে ঠিক মনে নেই। একবার নাচ গানের দলবল নিয়ে প্রতিমাদিদের বিলেত যাবার কথা হয়। সে-সময় প্রতিমাদি আমাকে লেখেন

তাঁদের সেই দলে আমাকেও তাঁরা নিয়ে যেতে চান গানের জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে তখন পণ্ডিচেরী ছেড়ে যাওয়া যে সম্ভব নয় এ-কথা জানিয়ে কবিকে চিঠি লিখি। তার উত্তরে এই মধুর চিঠিখানি তাঁর এইখানে তুলে দিলাম—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েচি, আরো অনেক বেশি খুশি হতুম যদি সাক্ষাৎ তোমাকে কাছে পেতুম। বিশেষত আজ দোলপূর্ণিমার দিন। আমাদের এখানে বসন্ত পূর্ণিমা, এই আনন্দের উৎসবে তোমার নির্বাসিত মধুকণ্ঠের জন্যে বেদনা জেগে উঠল। আর কোনোদিনই কি তোমার সুরের সঙ্গে আমার গানের মিলন হবে না? হয়তো অবকাশ হতেও পারে কিন্তু আমার আয়ু যে সীমায় এসে ঠেকেচে সেখানে পিছনের দিকেই স্মৃতির আসন সুবিস্তীর্ণ, সামনে আসার স্থান সংকীর্ণ।—বৌমা তোমাকে ধরবার চেষ্টায় ছিলেন আমি তা জানতুম না—কিন্তু তাঁদের বিলেত যাবার সংকল্প বোধহয় ব্যর্থ হবে। সকলের চেয়ে অসম্ভব উপলক্ষ্যে তিনি তোমাকে হরণের চেষ্টায় ছিলেন, সহজ হাওয়ায় যে ফুল বিচলিত হয় না তাকে ঝড়ের হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া অসাধ্য নয় এই কথাটাই বোধহয় তাঁর মনে ছিল।—কাল আমাদের নৃত্যনাট্য হবে। তুমি যদি দেখতে নিশ্চয় তুমিও খুশি হতে আমরাও হতুম।

স্নেহরত

দোলপূর্ণিমা ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ

আজ সারাদেশ জুড়ে তাঁর স্মৃতি মহোৎসব। সবাই দিচ্ছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁকে স্মরণ করছে—যারা জানে না তারাও, যারা জানে তারাও, যারা তাঁকে কাছে পায়নি তারাও, যারা তাঁকে কাছে পেয়ে হারিয়েছে তারাও। আমি পেয়েছিলাম তাঁকে আমার জীবন প্রভাতে প্রভাত-সূর্যের আলোর মতন।

স্মৃতিকুসুমের এই অর্ঘ্য দিয়ে আজ আমি তাঁর স্মৃতি তর্পণ করি।

স্বর্ণকমল হাতে
আসিলে যখন রাতের গগনে শুকতারা ছিল সাথে
তখন মগ্ন সবে
নিশীথস্বপন জড়িত ভুবন সুপ্তিতলে যবে।
যুগের প্রভাত সম
চারিদিক করি' উজ্জ্বল মনোরম,
ধরণীর শির চুমি,'
যাত্রার পথে নামিয়া হেথায় এলে বল কোন্ পথের পথিক তুমি।

কণ্ঠে ভরিয়া গান
—যেন কোন্ আহ্বান—
গাহিয়া জাগালে জীবনের নব প্রাণ।
রাত হোল অবসান।
ভোরের আলোতে দিয়ে গেল কারে ডাক:
এলো সেই দিন—সে পঁচিশে বৈশাখ।—

তুলে নিলে বীণাখানি
আপনার সুরে সুর দিলে যবে আনি'—
আনন্দে কোন্ মধু-উৎসবে মাতি'
প্রকৃতি সাজায় বরণের ডালা ভুলিয়া দিবস রাতি।
ঋতুরা কাহার আসন বিছায় আনি,
কুঞ্জে, কুঞ্জে কাননে কাননে গুঞ্জনে কানাকানি।
গাঁথে মালা তারি তরে
তাহারি চরণে পড়িতে ঝরিয়া ফুল ফোটে থরে থরে।
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে রহে চাহি'
তব পানে, ওগো বাণীর অমৃতবাহী।
তারি বিচিত্র রূপ-রস-সুধা পান করে অবগাহি'
অন্ত নাহি যে নাহি।
হে কবি, অমর কবি
হে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবি,
রেখে গেছ এঁকে বিশ্বের হিয়াপটে:
তোমার প্রাণের ঢেউগুলি সব লেগেছিল কোন্ তটে।
অতুলন তব সৃষ্টির এই অবর্ণ্য ফুলগুলি
চিরবসন্তমালঞ্চ ভরি' রবে চিরকাল ফুটিয়া আনন তুলি'।
হে কালদর্শী, হে শিল্পী সম্রাট।
বিরাট প্রতিভা কিরণোজ্জ্বল তোমার রাজ্য পাট।
কত অগণন দুর্লভ ধন রতনে পূর্ণ তব রাজভাণ্ডার
রাশি রাশি ভরা কতরূপ সম্ভার।
প্রতি কথা তব কী যে অপূর্ব বাণী,
কণ্ঠেতে যেন কথা কয় বীণাপাণি

অপরূপ সঙ্গীতে,
ছন্দ তোমার কল্লোলি' চলে তটিনীর ভঙ্গীতে :
কুলু কুলু কুলু কল কল কূলে কূলে,
বহি' চলে কোথা কোন্ গিরিপাদমূলে,—
বনানীর তরুছায়,—
দিকে দিকে কভু রাঙা পথে কভু শ্যামলের গায়ে গায়ে।
—কবে কোন্ পর্বতে,
রাজার দুলাল চলেছিল কোন্ মেঘের শুভ্র রথে,
আনিতে জিনিয়া পাষাণ পুরীর পর্বত দুহিতারে
নাশিয়া দৈত্য—ছিল যে জাগিয়া দ্বারে।
—কোথায় মেঘের গায়,
মরালীর ওই সুন্দর পাখা মেলিয়া গগনে কোন্ পথে ভেসে যায়
কোন্ শৃঙ্গের ধবল তুষার 'পরে,
কে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ করে।
গিরিগুহা গহ্বরে,
কোন্ মুনি ধ্যান ধরে।
—কোথা নীল সরোবরে,
করেছিল কারা জলকেলি কবে কমল তুলিয়া করে।
কবে কোথা কোন্ অপ্সরা সে রূপসী,
গেয়েছিল কার প্রাণের রাগিনী কোন্ প্রাঙ্গনে বসি'।—
রাজার কন্যা যৌবন ডাক শুনি একদিন কবে,
ছাড়ি' আপনার বীরের সজ্জা চেয়েছিল কোন্ বীর শ্রেষ্ঠরে
ছিল বনবাসে যবে।—
কত কথা, ছবি, কত কাহিনীর সমধুর ঝঙ্কার
তুলিয়া চলে যে ছন্দ তোমার স্রোতসঙ্গীতে তার।
ওগো মহীয়ান, ওগো মহা রূপকার,
হে সৌরভের গৌরব মনি হার,
নিখিলের অন্তর
পূর্ণ করিয়া দিয়েছ ভরিয়া, ওগো ধ্যানী সুন্দর।
তব গৌরবে গৌরবী আজ সবে,
জগৎজীবন তোমার কাহিনী ক'বে,

মর্মে মর্মে মূরতি তোমার র'বে
চিরকাল, চিরদিন।
শিল্পীর ধ্যান-অন্তরে র'বে তোমার প্রেরণা চির অন্তর্লীন।
এই ধরণীরে বেসেছিলে কত ভালো।
নয়নে তাহার জেলে দিয়ে গেছ আলো।
দিতে ভাষা দিতে গান!
দিতে রূপ, রস, বৈচিত্র্য মহান্,
এসেছিলে তুমি কবি,
রেখে যেতে তারি ছবি।
শারদ পূর্ণিমায়,
সুরের জ্যোৎস্না দিয়েছ বিছায়ে বিশ্বের আঙিনায়।
ভরা শ্রাবণের ঘন বরিষণ সাথে
কণ্ঠ ছাড়িয়া গেছে গান সে বরষা-মুখর রাতে।
বসন্ত উৎসবে,
ডাক দিয়ে গেলে চিরসুন্দরে সুন্দর সব যবে।
জীবনের সাজি ভরে
দিয়েছ সাজায়ে পূজার কুসুম কাহার পূজার তরে।
আমার কুসুম আনি',
এসেছি চরণে নিবেদিতে আজ প্রাণের প্রণাম খানি।
আজ নাই, তুমি নাই,
আমার কণ্ঠ আজো খোঁজে তব সে-পরশ মাঝে ঠাঁই।
শৈশব হতে তব গীত সুধা পানে,
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে কী তার নিভৃত আশা।
তোমার কাব্যে নিখিলের সনে হোল পরিচয়, হোল মন জানাজানি,
তোমার কাব্যে ভারতগাথায় শুনি কত ভাবে ভারতের মহাবাণী।
আজ আমি রেখে যাই—
আমার কাব্যে তোমারি লিখন—"ভুলি নাই, ভুলি নাই।"—
কীর্তিরে দিল মহিমার এই উচ্চশিখর যেই শিল্পীর তুলি,
মরণের মাঝে অমরণ নিল তাহারে দুয়ার খুলি'।

বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

সেবার কলকাতায়, যতদূর মনে পড়ে ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাস হবে বোধ হয়, এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক হয় চারদিন ধরে। জয় সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে নেমেছিলেন—

রঘুপতি—দিনুদা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অপর্না — কুমারী রাণু অধিকারী (পরে লেডি রাণু মুখার্জি) ও কুমারী মঞ্জু ঠাকুর (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইনি একদিনই অভিনয় করেছিলেন)

গোবিন্দমাণিক্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুণবতী—সংজ্ঞা দেবী (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী)

নক্ষত্র রায়—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র)

গোটা দশেক গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকেও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এই দশটি গানের মধ্যে 'বিসর্জন' এর জন্যে আগেকার রচিত গান ছিল তিনটি। এই তিনটি গান হচ্ছে—'ওগো পুরবাসী', 'আমি একলা চলেছি এ ভবে', আর 'থাকতে আর ত পারলিনে মা পারলি কৈ'। এই তিনটি গান ছাড়াও কবির পুরানো গান থেকে কবি বেছে দেন—'তিমির দুয়ার খোল' 'আর দিন ফুরালো হে সংসারী'—এই গান দুটি। নতুন রচনা করে দেন আরও পাঁচটি গান। সেগুলি হচ্ছে—'ও আমার আঁধার ভালো', 'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, 'আঁধার রাতে একলা পাগল', 'আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে' ও 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি'। শেষের এই পাঁচটি গান কবি আমায় শেখান তাঁদের জোড়াসাঁকোর পুরানো বড় বাড়িতে (৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) দোতলায় সামনের দিকের বসবার ঘরে ব'সে। প্রত্যেকটি গান তিনি নিজের হাতে লিখে দেন। তাঁর হাতের লেখা সেই গানগুলি থেকে কয়েকটা গান, কবির পুত্রবধূ আমার পরম বন্ধু প্রতিমাদেবীর নির্দেশে আমি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিই 'রবীন্দ্রসদন'-এ তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্যে। তাঁর পায়ের কাছে বসে গানগুলি শিখেছিলাম। কি যত্ন আর ভালোবাসা নিয়ে যে তিনি গান শেখাতেন। এক এক সময় একসঙ্গে বসে কত গানই যে আমি শিখেছি। গান শেখাতে সুরু করতেন যে উৎসাহ নিয়ে সেই একই রকম উৎসাহে দেখেছি

তিনি গান শেখানো শেষ করতেন। গান জিনিষটি যে তাঁর কত প্রিয় ছিল, গান শুনতে যত ভালোবাসতেন শেখাতেও ততই ভালোবাসতেন। দুটোতেই দেখেছি সমানই দরদ। সমানই আনন্দ পেতে। নিজে গাইতেও তেমনি ভালোবাসতেন। তবে আবার তাঁর গান কেউ ভুল সুরে গাইলে বা সুরের একটু এদিকওদিক করলে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর ঢং বা সুরের কোনও পরিবর্তরই তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না বরং শুনলে বেদনা বোধ করতেন। তখনকার দিনে আমরা কেউ তা করতাম না। করতে বোধকরি বা জানতামও না। আমরাও ভালোবাসতাম ওঁর গান অবিকল ওঁরই সুরে গাইতে। আমাদের আনন্দও ছিল তাইতেই। কবির মুখে কোনও সময় একবার শুনেছিলাম ওঁর গান সম্বন্ধে ওঁকে বলতে—'আমার গান যেন আমার কন্যাদায়! কাউকে শিখিয়ে ধরে দেওয়া যেন বরের হাতে কন্যাকে সঁপে দিয়ে করজোড়ে মনে মনে বলা—'যদি সুখে রাখো বাপু তবেই সব সার্থক'।' এ সবে কবি ছিলেন একেবারে অদ্বিতীয়, অনন্য। হাস্য পরিহাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না। কি সব অদ্ভুত মার্জিত সরস রসিকতা, উপমা, আর যে সব বলার, অননুকরণীয় সেই ভঙ্গী—সে সবের সত্যই তুলনা মেলা ভার। স্বচক্ষে না দেখলে বলে বোঝানো যায় না। বোঝাবার জিনিসও নয়। তাছাড়া এমনিতেই ওঁর কথাবার্তা ছিল অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, যা কিছু বলতেন আলাপ আলোচনা, সবই এমন করে বলতেন আর সে বলা হ'ত এতই সরেশ, এত উচ্চাঙ্গের আর এমনই একটা বৈশিষ্ট্যে ভরা যে, সবের মধ্যে সর্বদাই পাওয়া যেত ওঁর 'জিনিয়স'এর নানা ভাবের নানা পরিচয়, নানা নমুনা। কথায় কথায় অবলীলাক্রমে যে ধরনের কৌতুক, যে ধরনের রসিকতা উনি হরদম্ করতেন তার অজস্রতা দেখে আর সে সবে ওঁর তৎপরতার অমন 'অনায়াসলীলা' দেখে অবাক না হয়ে পারা যেত না। আর এইসব রঙ্গরসের মধ্যে দিয়ে রঙ্গরসের কত রঙের কত রকম কত ফুলই যে তিনি ফোটাতেন সে সব এক অভাবনীয় ব্যাপার। রস সৃষ্টির এক অভিনব দিক্।

আমার সঙ্গে তার সকল সম্বন্ধের মূল ছিল এই গান, কাছে গেলেই কি কি নতুন গান বাঁধলেন সেই কথা, সেই সব গান গেয়ে শোনানো। আর তখুনি তখুনি গানগুলি শেখানো। আমারও ছিল সে কী আগ্রহ তাঁর কাছ থেকে নতুন নতুন গান শিখে নেবার। তিনি যখন আমাকে সে সব গান শেখাতেন তখন আমার ভাবভঙ্গী থেকে অতি সহজেই বুঝে নিতেন কোন কোন গান শেখার দিকে আমার আগ্রহ বা ঝোঁক বেশি। সেই সব গানই আমায় শেখাতেন।

সকলের মধ্যেই পছন্দ অপছন্দ বলে একটা জিনিস আছে আমার মধ্যেও যেটা বেশ বেশিই আছে। তাই যেসব গানের সুর আমার তেমন পছন্দ হতো না সে গান শিখতে, অনেক সময়ই, আমি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারতাম না। শুধু তাই নয় কখনও হয় ত বলেও ফেলেছি যে এ গানটি শিখতে আমার ইচ্ছে করছে না—তিনি কিন্তু তাতে কখনও কিছু মনে করতেন না। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচি বা পছন্দেরই দেখছি তাঁর কাছে একটা বিশেষ মূল্য ছিল। গান শেখানোর সময় কোন বাজনা থাকত না। শুধু গলায়ই হ'ত গান শেখানো এবং শেখা। আমারও তখন শুধু গলায় গান গাওয়াই অভ্যেস ছিল তাই সে সব অসুবিধা ছিল না।

'বিসর্জন' নাটকের রিহার্সাল তখন সুরু হয়ে গেছে জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের পাঁচ নম্বরের (৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) বাড়িতে। তাদের দোতলার বিরাট হলে (বসবার ঘরে) রোজ সন্ধ্যায় চলত রিহার্সাল। এই নাটকে সেবারে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই প্রায় ঠাকুর পরিবারভুক্ত। যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি সব। অভিনয়ের বেশ একটা সহজ স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখেছিলাম সকলের মধ্যেই। রিহার্সালের সময় সেই ঘরে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন, বাইরেরও কাউকে কাউকেও কখন কখনও দেখা যেত। রিহার্সাল সুরু হলে দেখতাম যাদের দেখানো কবি প্রয়োজন মনে করতেন তাদের নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন, কিম্বা কখনও কাউকে সামান্য একটু সংশোধন করে দিতেন—বলে নয়, করে। দিনুদাকে কখনও কিছু দেখিয়ে দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। অভিনয়ক্ষমতা ওর দেখেছিলাম সহজাত। দেখাবার দরকার হত না। দিনুদার অভিনয়ের রবীন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করতেন। খাদের সেই মোটা দানাবাঁধা কণ্ঠস্বরে যেন আগুন জলে উঠত ব্রাহ্মণের (রঘুপতির) দম্ভ ও তেজ, যখন মা'র পূজার বলি বন্ধ হয়ে যাবার আদেশে গোবিন্দমাণিক্যকে রোষভরে বলে উঠতেন—

—'তুমি শুনিয়াছ দেবীর আদেশ
আমি শুনি নাই?'

কিম্বা :— 'ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুসম রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-পরে।'....

'চতুর্ভুজা, চারিহস্ত
আছ জোড় করি? বৈকুণ্ঠে কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না থাকে যদি ব্রাহ্মণ রয়েছে;
ব্রাহ্মণের রোষরক্তে দণ্ডসিংহাসন
হবি কাষ্ঠ হবে।'

মহারাণী গুণবতীর পূজা ফিরে গেছে শুনে তিনি রঘুপতিকে জিজ্ঞেস করায় তার উত্তরে রঘুপতির সে ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃপ্তকণ্ঠে বলা যেন আজও কানে শুনি —

'মহা'রানী যার পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী।
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু
এই বড় সর্বনাশ। মার পূজা ফিরে
গেছে।'

আরও-- 'এই শুধু জানি যে সিংহাসনছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।'

ধিক্কার ও আক্রোশে যেন ফেটে পড়ত দিগুদার গলা। পরে গুণবতী রঘুপতিকে আশ্বস্ত করে পুনরায় পূজা করার আদেশ যখন দেন তখন তারই উত্তরে রঘুপতির আবার শ্লেষোক্তি—

'যে আদেশ
রাজ অধিশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ বলে। ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই'
যতদিন নাহি জাগে কল্কি অবতার!'—

শেষের কথাও একটু না বলে পারছি না। জয়সিংহের আত্মাহুতির পরে শোকে মুহ্যমান, দেবীর প্রতি অবিশ্বাসাক্রান্ত রঘুপতির দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য মনের সেই আলোড়নের অবস্থা দিগুদা যা ফুটিয়ে তুলেছিলেন—

'দেখ দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে আছে জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মত!'

আর তারই সঙ্গে—কানে বাজে আজও, দেবীকে নাড়া দিয়ে বলা—

'দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর। দে ফিরায়ে
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী!
শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ, জানিস কি করেছিস?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন পুণ্য
জীবনের?'

অপর্ণার প্রতি কঠোরতা নিমেষে রূপ নিল যখন পিতার বিগলিত স্নেহে, তখন তাকে আবার কী ভাবে কাছে টেনে নেওয়া—

'মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে
যেমন ডাকিত সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে!'

সব শেষে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের অনুসন্ধানের শেষ উত্তর—

'এই শেষ পুণ্যরক্ত এপাপ মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজরক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা।'

রিহার্সেলের সময়কার একটা মজার কথা এইখানে মনে পড়ে যাচ্ছে। মৃত জয়সিংহের দেহের উপর শোকাচ্ছন্ন রঘুপতির আছাড় খেয়ে পড়া—হচ্ছে প্রসঙ্গটি। দিনুদার ওই মোটা ভারি শরীরখানা নিয়ে কবির শায়িত দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ার পর কবি সেই সময় একদিন উঠে দিনুদার দিকে এমন অদ্ভুত করে তাকিয়ে, বললেন—'দিনু, তুই ভুলে যাস আমি বেঁচে থাক!' একথা শোনা মাত্র সবাই উচ্চরবে হেসে উঠলেন। দিনুদাও।

আজ লিখতে বসে এসব দৃশ্য যেন চোখের সামনে জল জল করে উঠছে। সুদূর অতীতের পৃষ্ঠায় যা আশ্রয় নেবার কথা, তা মূর্ত হয়ে আমার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! এত কাছে, এত স্পষ্ট!

নক্ষত্ররায়ের অভিনয়ের কথাও একটু বলি। তাঁর চরিত্রকে তিনি হুবহু ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সুন্দর করেছিলান বিশেষ এইখানটা চমৎকার উপভোগ্য হয়েছিল, এত হেসেছিলাম!

'(স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে রাজা হবে ?'
'রাজা হবে ?' এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড ! একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুইকানে যেন
বাসা বাঁধিয়াছে দুই টিয়াপাখী—এক
বুলি জানে —রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু তাই হব —কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?'—

'বিসর্জন' হচ্ছে শুনেই আমি সন্ধ্যার দিকে যাই জোড়াসাঁকো পাঁচ নম্বরের বাড়িতে। গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল রবীন্দ্রনাথ কিছু একটা পড়ছিলেন। ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেরই বেশ মুগ্ধ মোহিত ভাব। আমাকে দেখেই প্রতিমাদি বলে উঠলেন—'ওমা, ঝুমু, তুমি একটু আগে এলেই বাবামশাই 'বিসর্জন' পড়লেন, শুনতে পেতে।' প্রতিমাদির কাছে শুনলাম যে, কোনও নাটক মঞ্চস্থ করা হবে স্থির হলে, সেই নাটকে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের সকলের সামনে কবি প্রথমে একবার নাটকটি নিজে পড়ে শোনান। তাঁর পড়া যাঁরা শুনেছেন তারাই জানেন সেকি জিনিস কি অভিজ্ঞতা চরিত্রগুলি যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। কবির পড়া শুনতে পেলাম না খুবই আফশোষ হল, তবে যাঁরা 'বিসর্জন' নাটকে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তাদের দেখে মনে হল কবির সেই পড়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিনয়ের অনেকখানি খোরাক সংগ্রহ করে নিয়েছেন, তাদের চোখে মুখে তারই আভাস প্রকাশ পাচ্ছিল। আমাকে দেখেই কবির ইচ্ছে হল আমাকে দিয়ে এই নাটকে গান গাওয়াবেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে রচনা হয়ে গেল সব নতুন গান। আর এ সূত্রেই তিনি প্রথম জানতে পারলেন তাঁর—'দিন ফুরালো হে সংসারি' গানটি আমি জানি। আমার মাসিমার কাছে শিখেছিলাম। এই গানটি একমাত্র আমার মাসিমা ৺অমলা দাস ছাড়া আর কেউ জানত না। গানটির একটু ইতিহাস আছে। শুনেছি আমার মাসিমা এই রাগপ্রধান গানের সুরটি কণ্ঠে তুলেছিলেন কোনও এক বিয়েবাড়ির নহবৎ শুনে তাই থেকে। এবং রবীন্দ্রনাথ মাসিমার কণ্ঠে সুরটি শুনে তখুনি তাইতে কথা বসিয়ে দেন। মাসিমার কাছে আমি এই গানটি শিখেছিলাম শুনে কবি খুবই উৎফুল্ল ও আশ্বস্তও হলেন। কেননা ওঁর ধারণা হয়েছিল মাসিমার মৃত্যুর সঙ্গে ওঁর এই গানটিও হয়ত বা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই আমার কণ্ঠে গানটি শুনেই তখুনি স্থির করে ফেললেন গানটি

আমাকে দিয়ে 'বিসর্জন' এ গাওয়াতেই হবে। কবির সেই উজ্জল চোখ আরও উজ্জল করে বলা —"তুমি জান গানটি? অমলা তোমায় শিখিয়েছিল? বড় ভালো হল। অমলা ছাড়া এ গানটি আর কেউই জানত না' আজও যেন সামনে দেখতে পাই।

মনের সাধে গান ত কবি 'বিসর্জন'এ দিলেন। এদিকের অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে আমার হ'ল দারুণ জ্বর। কবি ত মহাভাবিত। আমি ওঁদের ওখানেই তখন বেশির ভাগ সময় থাকতাম। জ্বর হয়েছে শুনে আমার কাছে এলেন। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে বললেন—'দেখো ঝুনু, তোমাকে দেখে আমার কেবল গানই দিতে ইচ্ছে হয়েছে। তখন আর কে ভেবেছিল, বল, যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে?'—যা হোক করে ত নুটুকে (রমা মজুমদার, পরে রমা কর) একটা না দুটো গান শিখিয়ে নিলেন কোনও রকমে তখনকার মতন কাজ চালিয়ে দেবার জন্যে।

সন্ধ্যা নাগাদ সবাই চলে গেছেন 'এম্পায়ার'-এ অভিনয়ের জন্যে তৈরী হ'তে। বাকি ছিলেন শুধু প্রতিমাদি। তখনও তিনি যান নি, তৈরী হচ্ছিলেন যাবার জন্যে। আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে প্রতিমাদির কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম—'আমি গাইব, প্রতিমাদি আমায় সাজিয়ে দাও।' প্রতিমাদি অবাক, তিনি ভাবতে পারেননি যে অমন আচম্‌কা আমি গিয়ে হাজির হব আর জ্বর গায়ে অভিনয়ে যেতে চাইব। গায়ে তখনও বেশ জ্বর দেখে প্রতিমাদি বললেন —'সে কি? তুমি পারবে ঝুনু?'—আমি বললাম—'কিছু হবে না। ঠিক পারব, প্রতিমাদি।' প্রতিমাদি ত খুব উৎসাহের সঙ্গে আমায় সাজাতে স্বরু করলেন, কেননা সময়ও তখন আর বেশি ছিল না। তবে প্রতিমাদির একটা আশঙ্কাও রইল আমার জ্বর পাছে আবার বেড়ে যায়। সাজগোজ শেস করে চলে গেলাম রঙ্গমঞ্চে। গিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের সাজ তখনও পুরো শেষ হয়নি। সব বড় বড় আর্টিষ্টরা তখনও ওঁকে ঘিরে আছেন। আমাকে হঠাৎ ওভাবে ওখানে দেখে ত একেবারে অবাক। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকা যাকে বলে। বললেন—'কী ব্যাপার? তুমি যে এসে গেছ? গান গাইতে পারবে মনে হয়?'—আমি বললাম—'মনে ত হয় পারব। তাই ত চলে এলাম।' শুনে কবি যত খুশি তত যেন নিশ্চিন্ত হলেন। দুর্ভাবনা দূর হ'ল।

তখনকার সেই খুশিতে উপচে পড়া চোখমুখের ছবি যেন আঁকা হয়ে আছে আমার মনে—সে কী খুশি হওয়া—ছেলেমানুষের মত—এমন আর দেখিনি।

অভিনয় আরম্ভই হত আমার 'তিমির দুয়ার খোল এস এস নীরব চরণে' গানটির সঙ্গে। স্টেজে আমার প্রবেশ করবার পথে দেখি রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের সাজে সেজে ভোঁ হয়ে বসে আছেন, যেন কিসের মধ্যে তলিয়ে গেছেন। আমি গান শেষ করে বেরিয়ে আসতেই হেসে রঙ্গ করে বললেন—"ঝুনু, তুমি ত দেখছি বেশ সহজভাবে স্টেজে চলে যাও? ভয় ভাবনায় ধার ধারো বলে ত মনে হয় না?" আমিও হেসে বললাম—"আমার খুব আনন্দ হয়। খুব মজা লাগে স্টেজে ঢুকতে।"—বললেন আরও মজা করে—"তাইত দেখছি! আর আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে এত স্টেজে অভিনয় করেও স্টেজে যাবার আগে আজও বলসঞ্চয় করে নেবার জন্যে একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিতে হয়।" যাঁরা কাছে ছিলেন সবাই হেসে গড়িয়ে পড়বার মতন অবস্থা ওঁর ঐই রকম মজার ভঙ্গী করে বলা দেখে। বলার যে কী ভঙ্গী—না দেখলে এ জিনিস কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রে, যেদিন আমি জ্বর গায়ে গান করি, সেদিন অভিনয় শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছটিতে এসে কৌতুকভরা নয়নে মৃদু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন—"শোন ঝুনু, জ্বর হলে যদি তোমার এমন গান হয়, তবে আমি তোমার জ্বর হয়েছে শুনে দুঃখ করব না, খুশি হব, সে কথা তুমিই বল, তোমার কি মত?" উত্তরে আমি আর কী বলব, বেশ খুশি হয়েই উঠলাম আর উপভোগও করলাম যা বললেন তা। পরে আবার তখুনি আরম্ভ করলেন—"তুমি ভেব না যেন আর তোমার জ্বর হলে আমি তাই নিয়ে ভাবতে বসব"—বলে চোখটি ঘুরিয়ে তুলে আমার দিকে এমন করে তাকালেন, তার অর্থ সবাই বুঝে হেসে উঠলেন। এরকম অনেক হাসিঠাট্টা উনি সর্বদাই করতেন। ওঁকে যারা জানত তারা সবাই জানে একথা!

'বিসর্জন' তখনও পুরো তৈরী হয়নি। রিহার্সলের পালা চলেছে তখনও। সে সময়ে আমরা খুব ফুর্তি করেছি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। খুবই আনন্দে কাটত তখন। বাড়িভরা লোক, দিনরাত যেন উৎসব লেগে আছে। গান, গল্প, হাসিঠাট্টা, তামাসা, আলাপ আলোচনা,—এমন কি টীকাটিপ্পনীও বাদ যেত না—এসব নানা সোরগোলে আমরা আসর জমিয়ে রাখতাম। আমি প্রায় সময়টা ওখানেই কাটাতাম। আর বাড়িতে এলেও, আবার কখন যাব—তাই ভাবতাম। এতই ভালো লাগত ওখানে ওঁদের সবার মাঝে। বাড়ি ফিরে এলেই মনে হত জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও ওখানকার সকলে আমায় যেন ডাকছে—সে যে কী নেশাগ্রস্ত অবস্থা! দিনগুলি ভ'রে উঠত রবীন্দ্রনাথের

অমূল্য সংস্পর্শে, দিনুদার গানের পর গানে। আর প্রতিমাদির স্নেহাদরে ও যত্নে। মাঝে মাঝে প্রায়ই পাঁচ নম্বরের বাড়ি থেকে আসতেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এঁরা। এঁদের সাহচার্যই কি কম পাওয়া যেত! রাত্রে যেতাম আমরা ওঁদের ওখানে। আর দিনেরবেলায় সময় বুঝে আসতেন এঁরা। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এঁরা যখন সভা জমিয়ে বসতেন তখন সেও হত আর এক শোভা গুণীজনসমাবেশের। আর কবির সঙ্গে এঁদের সেই সব নানা সরস রসালাপ ছিল আমাদের একটা মস্ত আকর্ষণের বস্তু। সে আসর ছেড়ে আর উঠতে পারা যেত না যতক্ষণ না আসর ভেঙে দিয়ে এঁরা নিজেরা উঠে পড়তেন। কেবলি মনে হত—কী অসাধারণ এঁরা সকলেই, আর আমার কি সৌভাগ্য যে আমি এঁদের এত কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছি!

কৌতুক পরিহাসের, কবির, আর একটি বিশেষ সময় ছিল। সে হচ্ছে খাবার সময়, খাবার-টেবিলে বসে। হয় ওঁর সেবক বনমালীকে নিয়ে আরম্ভ করতেন, নয়ত আমরা যারা থাকতাম সে সময় তাদের কাউকে নিয়ে। বেশির ভাগ দেখতাম দিনুদা কিম্বা দিনুদার স্ত্রী কমল বৌঠানকে সামনে পেলেই ওঁর সুরু হ'ত সব সরেশ রসিকতা। সে সব যে কী চিত্তাকর্ষক হ'ত। আর হাসাহাসিও চলত তারই সঙ্গে তাল রেখে। এসব সময় কবিকে দেখতে হত! দেখলে কবিরই কবিতার লাইন মনে করিয়ে দিত—

কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে।

রোজ সন্ধ্যায় রিহার্সলে যোগ দেবার জন্যে আমাকে থাকতেই হ'ত জোড়াসাঁকোর। অভিনয়ের আমার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চে ঢুকে গাওয়া ছিল আমার আসল কাজ। আমাকে দিয়ে গাওয়াবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটি সৃষ্টি করে দেন। রিহার্সল দেখে কিন্তু আমার আশা মিটত না, একটা জিনিস এতবার দেখেও নতুন দেখার মত সমান আগ্রহ থাকত, আরও দেখতে ইচ্ছে করত⋯ ⋯আরও⋯। এর মধ্যে কত যে দেখবার আর শিখবার পেতাম। রবীন্দ্রনাথের শেখানোর কায়দা দেখাও একটা মস্ত শিক্ষা—এইটেই বার বার মনে হত। আমি যা দেখেছি তাতে এই মনে হয়েছে যে কবি, ব'লে বিশেষ কিছু যে বোঝাতে চাইতেন তা নয়, অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন। যতবার দরকার হত ততবারই দেখতাম উনি অম্লানবদনে করে যেতেন। যখন যে চরিত্রটি করে দেখাতেন তখন সেই চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতেন। অনেক সময় একই সঙ্গে অনেককে হয়ত পর পর দেখিয়ে দিতে হত, সে সময় আশ্চর্য হয়ে দেখতাম যে নিজের মধ্যে কি দ্রুত

পরিবর্তনই না উনি আনতে পারতেন! শুধু তাই নয় তার সঙ্গে পরিবেশের পট-পরিবর্তনও ঘটাতেন তেমনি দ্রুত—এত সহজে, একেবারে অনায়াসে যাকে বলে তাই। একটা জিনিস বিশেষ করে ভালো লাগত তা হচ্ছে এই যে যিনি অভিনয় করা দেখিয়ে দিচ্ছেন আর যাঁরা অভিনয় করতে শিক্ষা লাভ করছেন, তাঁদের মধ্যে একটা সহজ সুন্দর ভাব, একটা সুমধুর সম্বন্ধ। শিক্ষালাভের এমন একটা সম্মিলিত একাগ্রতা, নিবিষ্টচিত্ততা, তন্ময়তার দৃশ্য কমই দেখেছি। একটা জিনিস বার বার করে করার মধ্যে শুষ্কতা এসে যায় বটে। কিন্তু এঁদের মধ্যে যে জিনিস কখনও দেখিনি। বরং উল্টো। আর সেই আনন্দের রসে সিঞ্চিত করে চেষ্টাকে করে তুলতেন সরস ও সফল। হয়ত বা কবির সংস্পর্শের যাদুকরী শক্তিই ছিল এর মূলে। রিহার্সল ব্যাপারটা যে এতটা চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায় আর তার সরসতা যে এমন আগাগোড়া বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে তা বিসর্জনের এই রিহার্সল পর্ব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দিনের পর দিন না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথের 'অপর্ণা'-কে শেখানোর কথা মনে পড়ে। প্রথম দৃশ্যে অপর্ণার ছুটে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের পায়ের কাছে ভেঙে পড়া ও দুঃখ বেদনা ক্ষোভ-জড়িত কাতরকণ্ঠে বলা—'বিচার প্রার্থনা করি।'—এই 'বিচার প্রার্থনা করি' —এইটুকু ঠিকমত ঠিকভাবে ঠিকভঙ্গীতে কি ভাবে কেমন করে বলতে হবে তা বার বার নিজে করে দেখিয়ে দেবার যে শিক্ষা দেওয়া রবীন্দ্রনাথের দেখেছি, তা দেখে তখনই শুধু বিস্ময় বোধ করিনি, তা স্মরণ করে আজও বিস্ময় বোধ করি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ভাবভঙ্গী তিনি বার বার করে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যতক্ষণ না অপর্ণা তা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পেরেছে। অপর্ণাকে কবির আপন হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলার পর যেদিন রঙ্গমঞ্চে অপর্ণার প্রথম অভিনয় দেখি, সেদিন তার অভিনয় ও উক্তির মাঝে দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আর একটি দিক্। ভিখারিনী অপর্ণার ক্ষুদ্র ছাগশিশুটিকে দেবীর চরণে দেবার উদ্দেশ্যে অপহরণ ক'রে আনা হয়, তারই বিরুদ্ধে অপর্ণার বিচার প্রার্থনা। 'বিসর্জন'-এর কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় তার রোদনভরা কণ্ঠস্বরের আকুতি—

'কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে।'
'মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন?'

কিম্বা—   জয়সিংহ, চলে এস
এ মন্দির ছেড়ে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জয়সিংহের বেশে বের হয়ে এলেন সাজঘর থেকে তখন দেখলাম তাঁর সেই রূপসজ্জার মধ্যে রয়েছে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীশ্রেষ্ঠদের প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ। বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের! হাঁ করে চেয়ে রইলাম সে রূপসজ্জার দিকে,—কতক্ষণ মনে নেই। কী যে ভাবছিলাম তাও জানি না, সব তখন নাগালের বাইরে!

আশ্চর্য করে দিত কবির অভিনয়নৈপুণ্য। মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হত। দেখেছি আর বার বারই মনে হত—কী অদ্ভুত! কী অপূর্ব! ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না নিজের সে অনুভূতিকে ব্যক্ত করার। চোখের সামনে, অন্তরের সামনে খুলে যেত সৌন্দর্যলোকের কোন্ এক পর্দা। ফুটে উঠত এক অদৃশ্য জগৎ। সে যেন এক অভিনব অভিব্যক্তি। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠত তাঁরই গানের চরণ—'আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে।' কবির সৌন্দর্যপ্রিয় সত্তার সেই অন্তরঙ্গ স্পর্শ লেগে থাকত তিনি যা কিছু করতেন তার সবের মধ্যে। প্রতি তুচ্ছতমেও দেখেছি, আর প্রতি সূক্ষ্মতমেও দেখেছি, তাঁর সব ভঙ্গিমাতেই থাকত সৌন্দর্যের কোনও না কোনও প্রকাশ। মন স্পর্শ পেত সৌন্দর্যের নানা অনুভূতির আর উপলব্ধি করত তাকে নানাভাবে, নানা দিক থেকে। মনে হত সৌন্দর্যে ভ'রে উঠেছে চারিদিক। আর পারিপার্শ্বিক হয়ে উঠত অনাস্বাদিত কোন্ এক রসের রসমুগ্ধ ছবি। যে পরিবেশের তখন সৃষ্টি হত তাতে আমাদের মন প্রাণ সত্তা সব যেন কোথায় কোন্ লোকে প্রবেশ করত! বাঁধা পড়ত এক অপূর্ব সুরে, ভ'রে থাকত শুধু তারি স্পন্দনের সুমধুর রেশ অভিনয় হয়ে যাবার পরেও। অভিনয় যে কী হ'তে পারে আর কোথায় উঠতে পারে তা উপলব্ধি করি কবির অভিনয় দেখে।

এই বহুমুখী প্রতিভাশালী শিল্পীসম্রাটের বিরাট রাজত্বে তার ধনদৌলতের মূল্য কে-ই বা যাচাই করতে যাবে। অনন্যসাধারণ এই ব্যক্তিস্বরূপের সান্নিধ্যে যখনি গিয়েছি তখন এতই আনন্দ হত যে ভুলে যেতাম সব, খুঁজবার অবকাশ হত না কি পাচ্ছি বা কি চাইছি। কিছু বুঝতে চাওয়ার প্রেরণাও যেত হারিয়ে।

সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যখন শুনলাম কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে—

'তোমার মন্দিরে এ কি নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,

করুণা কাতর কণ্ঠে ? ভক্ত হৃদি অপরূপ
বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।'

রঘুপতির মুখে দেবীর আজ্ঞায় ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যার কথা শুনে বিভ্রান্ত সংশয়াকুল, ব্যাথাতুর জয়সিংহের টলায়মান বিশ্বাসের এক জলন্ত ছবি চোখে দেখলাম—

'এ কি কথা শুনিলাম ? দয়াময়ি, এ কি
কথা ? তোর আজ্ঞা ? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা ?
বিশ্বের জননি, গুরুদেব, হেন আজ্ঞা
মাতৃ আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার !'

মনে পড়ে তিক্ততার নিবিড়ঘন ছায়া ফেলে একই পর্দায় বার বার আঘাত হেনে কণ্ঠে স্বরের চলাফেরা তীক্ষ্ণতার ঝলক দিয়ে—

'হঁ্যা ধিক, জননি, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই ? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডি ? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী ?'

আবার সেই স্বরেরই ওঠা নামার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুট হতে দেখা যাচ্ছে জয় সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ওঠা পড়া আর দোলা কী ভাবে রূপ নিচ্ছে—

'প্রেম মিথ্যা
স্নেহ মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনন্ত হিংসা।'

* * *

'নিবি মা আমার রক্ত—
দেব ছুরি বুকে ? এই শিরা ছেঁড়া রক্ত
বড় কি লাগিবে ভালো ?'

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নিঃশ্বাসের ওঠা পড়াও দ্রুত হয়ে উঠত, এমনই নিবিড় হত সে ব্যঞ্জনা।

চতুর্থ দৃশ্যে জয়সিংহ মন্দিরের সোপানে বসে। মনে হল সকলের সব ভাষাকে যেন স্তব্ধ করে প্রাণের তারে ঘা দিয়ে বেজে উঠল জয়সিংহের সুগভীর স্বর—

'দেবী, আছ তুমি ? দেবি থাক তুমি !'

তারপর জয়সিংহের সেই সবেগে প্রবেশ, কিসের যেন তাড়া নিয়ে, আর সেই বেগই সবকিছুতে সঞ্চর করে বলে বলল জয়সিংহ—

'বল্ চণ্ডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই ?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানবভাষায়, বল্ শীঘ্রই, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?'

আরও একটু বলি। জয়সিংহ অপর্ণাকে যখন বলছে—

'অপর্ণা, আবার এসেছিস ? তাড়ালেম
মন্দির বাহিরে, তবু এই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া মরিস
সুখের দুরাশাসম দরিদ্রের মনে ?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ এই।
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না !
সত্যরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে—
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।'

মনে আছে যে স্নিগ্ধতা উনি বিস্তার করলেন, সে স্নিগ্ধতা যেন জ্যোৎস্না-লোকের মতই ছড়িয়ে পড়ল ভিতরবাহির ভেদ করে। আর তারি আলো-ছায়াপাতে রেখে গেল হৃদয়াবেগের নিবিড়তম মধুরতম স্পর্শ। আমাদের অন্তরের স্পন্দনও হয়ে উঠল আরও কোমল। তারপর—

'দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুমখচ্ছবি
শ্রান্তিহীন—বহুরাত্রি জাগরণে
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুম ভারে। সুন্দর জগৎ ! হা অপর্ণা
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই ! থাক
দেবী ! অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা ? শুধু তাই বল !
যা শুনিলে অতলে মগ্ন হয়ে

ভুলে যাব জীবনের তাপ। মরণ যে
কত মধুরতাময়, আগে হতে পাব
তার স্বাদ।'

সে এক অভাবনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ আর অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে গেলেন। বড় কবি না হলেও বড় অভিনেতা হতে পারে, আর অভিনয়ক্ষমতা না থাকলেও বড় কবি হতে পারে। যেখানে এই যুগ্মপ্রতিভার একত্র সমবেশ যেখানে কী জিনিস সৃষ্টি হতে পারে তাই দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর আমরা তা দেখেছিলাম· রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহের ভূমিকায় রঘুপতিকে শেষ উত্তরের সঙ্গে দেবীর চরণে জয়সিংহের আত্মাহুতি— বুঝি বা বর্ণনাতীত —

'আছে, আছে, ছাড়ো মোরে
নিজে আমি করি নিবেদন।—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহ বংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা। এই রক্তে মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।'

আমিও এবার সমাপ্তি টানি এই উদ্ধৃতিপূর্ণ প্রবন্ধের। সেই মহাগুণীর চরণতলে বসে অভিনয় জগতের যে জিনিস ও যেদিক দেখেছিলাম তা তখন যেমন বিস্ময়কর ঠেকেছিল আজও তেমনি বিস্ময়করই রয়ে গেছে।

সুরে ভরা দিনগুলি

অতুলপ্রসাদ সেনের কথা মনে হলেই মনে পড়ে তাঁর গানের কথা। মনে পড়ে সেই সব সুরে ভরা সংস্পর্শের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা। অতুলদা আমার আত্মীয়। আমার পিস্‌তুতো ভাই হলেও তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধের মূল্য আমার কাছে ছিল, আত্মীয়তার চাইতেও বেশি তা হচ্ছে সঙ্গীত নিয়ে সম্বন্ধ। অতুলদা ছিলেন গান পাগল, আমিও পড়ি সেই পর্যায়েই, গান পেলে হয়ে যাই অন্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান গেয়ে যেমন মন ভরে উঠত, অতুলদার কাছেও হ'ত সেই রকমই। গান শুনে কাউকে অত খুশি হয়ে উঠতে আমি কমই দেখেছি, কি যে করবেন যেন ভেবে পেতেন না। এঁদের কাছে বসে কত গানই গেয়েছি,—কখনও শিখেছি, কখনও গেয়েই চলেছি,—গান শুনে এঁদের ক্লান্ত বোধ করতে দেখিনি, বরং মনে হয়েছে গান শোনার আনন্দে এঁরা ভুলে যেতেন আর সব। এত ভালো শ্রোতা ছিলেন। অতুলদা শুধু সঙ্গীত-অনুরাগীই ছিলেন না, সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণ, সত্তার নিত্য সহচর, সঙ্গী, সাথী। গাইতেনও সুন্দর। আওয়াজ খুব জোর না হলেও ভারি অন্তরস্পর্শী। মিষ্টি মধুর আর দরদে ভরা ছিল কণ্ঠস্বরটি। যখনই গাইতেন, যে গানই গাইতেন, প্রাণে লেগে থাকত তার স্পর্শ, মধুরতার একটা রেশ। অতুলদার রচিত গানগুলিতেও একটা বিশেষ রকম মধুরতার আস্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর নিজের গান তাঁর মুখে যা শুনেছি আর এখন যা সচরাচর শুনতে পাই, তা এতই তফাৎ যে তা যেন আর অতুলদার গান বলে চেনাই যায় না।

মৃদু মধুর সুরের নানা কাজের আলোছায়ার ভিতর ছোট্ট এক-একটি খোঁচ এক-একটি মোচড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গীতে ধরা পড়ে যে জিনিস, যে সূক্ষ্মতার স্পর্শ, যে রস, যে কমনীয়তা, লালিত্য, ধরা পড়ে সব জড়িয়ে যে অদ্ভুত একটা 'ডেলিকেসী', তাই হল অতুলদার গানের বিশেষত্ব, নিজস্ব ছাপ, স্বকীয়তার ধরণ। তারই মাঝে আমরা শুনতে পাই অতুলগীতির মর্মের সুর। এ গানের মাধুর্যই এমন যে শুনলেই মন স্বতই বলে ওঠে 'আহা!' এই এমন জিনিসটিই দেয় অতুলদার গানের আসল পরিচয়। তাঁর সঙ্গীতের সুর চিত্রণে নেই জাঁকজমকের ঘটা, নেই চমক লাগানোর চেষ্টা, আছে পেলব মাধুর্যের স্নিগ্ধতায় ভরা মনোহরা স্পর্শ সব। স্বরলিপিতে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। এ সবের স্বরলিপি করাও যায় না, করা সম্ভবও নয়। শুধু যে অতুলপ্রসাদের

গানের বিষয় বলছি তা নয়। এই জাতীয় বিশিষ্টশ্রেণীর সব বাংলা গানের সম্বন্ধেই বলছি, যে জাতীয় গানের কথার মূল্য বিশেষভাবে ধরা হয়ে থাকে। বাংলা গানে কথার ভাবকে বাদ দেওয়া যায় না। কেননা কথার সঙ্গে সুরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিশিষ্ট শ্রেণী বলছি এই কারণে যে গান রচনা হয়ত অনেকেই করে থাকেন কিন্তু যে সব গীতিকারের গান তাদের বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ আসন পায়, একটা বিশেষ পর্যায়ে পড়ে, আমি বলতে চাইছি সেইসব গুণীদের গানের কথা। স্বরলিপি সম্বন্ধে এবং স্বরলিপি দেখে গান শেখা সম্বন্ধে আমি অনেকবার বলেছি আবারও বলছি যে স্বরলিপিতে শুধু গানের সুরের কাঠামোটুকুই দেওয়া যায়, বাদ বাকী দিতে হয় গায়ককেই। সুরের কাঠামোই তো গান নয়। এই জন্যে যাঁরা শুধু স্বরলিপি দেখে গান তোলেন, রচয়িতার গান সম্বন্ধে, তাঁর গানের ধরনধারণ বা ধারা সম্বন্ধে যাঁদের সে রকম কোনও জ্ঞান নেই, অভিজ্ঞতা নেই, ধারণাও বিশেষ নেই, তাঁদের তোলা গানের সঙ্গে রচয়িতার গানের এত বেশি পার্থক্য থেকে যায় যে সে গানের মধ্যে রচয়িতার গানকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলা সম্পূর্ণ হয় না, সফলও হতে পারে না যদি না রচয়িতার রচনার সঙ্গে গায়কের যথেষ্ট পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা থাকে। যদি না কোন্‌টি রচয়িতার নিজস্বছাপ, বিশেষত্ব, সেটিকে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, যদি না অন্তরে রচয়িতার গানের আন্তরস্পর্শ পেয়ে থাকেন। নইলে হাজার বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপির সুরকে অনুসরণ বা অবিকল অনুকরণ করে গেলেও বজায় থাকে না রচয়িতার গানের বৈশিষ্ট্য, ধরা যায় না তার দেয় বস্তুটিকে আর পাওয়া যায় না তাঁর রচিত গানকে বা গানের প্রকৃত পরিচয়। যথার্থ শিল্পীমাত্রেরই থাকে তার প্রতিভার নিজস্ব ছাপ যা দিয়ে তাকে চেনা যায়, যেটি দেয় তার পরিচয়। আমি শুধু আমাদের গীতিকারদের কথাই বলছি না। কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি শিল্পকলা জগতের সব শিল্পীবৃন্দের কথাই আমি বলছি। তাদের প্রত্যেককে আমরা চিনতে পারি তাদের নিজস্ব ছাপটি দিয়ে। এই ছাপ দিয়েই আমরা চিনতে পারি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমকে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, শরৎচন্দ্রকে, চিনতে পারি দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল, অতুল-প্রসাদ প্রভৃতিকে। এমনি করেই চিনেছি আবদুল করীম, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলী, কেশর বাঈ আর আলাউদ্দীন হাফেজ আলী, এনায়েৎ খাঁ, আলী আকবর, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, তিমিরবরণ প্রভৃতি সঙ্গীতমুকুটমণিদের এবং আরও কত কত শিল্পীশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালীদের।

ছোটবেলায় অতুলদার সঙ্গে যে আমাদের খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হত, তা নয়। তার কারণ তিনি থাকতেন পশ্চিমে, লখনৌ শহরে, আমরা কলকাতায়। আমাদের পিতামহের (ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত) সব নাতী নাতনীদের মধ্যে অতুলদাই ছিলেন সকলের বড়। গুপ্ত পরিবারের আমরা ভাই বোনেরা তাঁকে ডাকতাম 'ভাইদা' বলে। অতুলদা যখন লখনৌ আদালতে যোগ দেন আমরা তখন ছোট ছোট। আমি জন্মাবার দু-তিন বছর আগেই তিনি বিলাত থেকে ফিরে আসেন আইনজীবী হয়ে। পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে কখনও কলকতায় এলে হয় ত দেখা হত। সে-সময় প্রায়ই দেখতাম আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকে ভাইদাকে ঘিরে বসেছেন গান শোনার আগ্রহে। বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত গান সম্বন্ধে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। মনে আছে ছোটবেলায় আত্মীর-স্বজনের কারও নামকরণ হলে তাঁর রচিত এই গানটি আমরা প্রায়ই গাইতাম—

'যদি তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠেছে কুসুম ফুটিয়া
তবে এ ক্ষুদ্র কলিকা হউক বর্দ্ধিত তোমারি সৌরভে মিশিয়া'

গানটি আমার জ্যাঠামশায় সার কে.জি. গুপ্তের ছোট মেয়ের নামকরণ উপলক্ষে ভাইদা রচনা করেন। শুনেছি তাঁর নিজের বয়স তখন খুবই কম ছিল, চোদ্দ কি পনেরোর বেশি নয়।

অতুলদার কাছে আমার প্রথম শেখা গান হল, 'তব পারে যাব কেমনে হরি।' গানটি শিখি দার্জিলিঙে আমাদের বড় মেশোমশায় ডাক্তার পি.কে রায়ের 'রুবি-হল্' নামক বাড়িতে বসে। সেইদিনই, 'বঁধু ধর ধর মালা পর গলে' ও 'এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়' গান দুটিও শিখি। অতুলদা এসে সেবারে ওই বাড়িতে ছিলেন। আমি ছিলাম আমার এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে অকল্যাণ্ড রোডের উপর ছিল সে বাড়ি।

এই বন্ধুটির সঙ্গে পরে আমার মামা সুধীরঞ্জন দাশের (সুপ্রিমকোর্টের ভূত-পূর্ব প্রধান বিচারপতি এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য) বিবাহ হয়।

অতুলদার কাছে গান শিখবার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই, কিন্তু এ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। এইবার এই দার্জিলিঙ পাহাড়ে প্রথম সেই সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া গেল। এত আনন্দ হল যে কালবিলম্ব না করে তাঁর কাছ থেকে যে কটা গান পারলাম শিখে নিলাম। অতুলদার গান শেখানোর ধরণ ও পদ্ধতিটি ছিল এমন যে গান শেখার আনন্দ ও আগ্রহ দুই-ই যেন দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তিনি নিজেও গান শেখাতে খুব উৎসাহিত বোধ করতেন। দেখতাম

তাঁর সঙ্গীতপিপাসু মন কি রকম রসঘন হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথের মত ইনিও গান শুধু শুনতেই ভালো বাসতেন না, শেখাতেও সমানই ভালোবাসতেন।

সেবার দার্জিলিঙে যখন যাই তখন কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে চলে এসেছি। খানিকটা ছাড়া পেয়ে বেশ নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা করার জন্যে নিত্য নতুন আনন্দের রসাস্বাদন করছি। কিন্তু হলে হবে কি, তার সঙ্গে এও দেখেছি, চারিদিকের অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝে কিসের হাতছানি যেন আমার মনে কেবলই ছায়া ফেলত, কেবলই যেন কোথায় কোন্‌দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত, ছোঁওয়া লাগত যেন কিসের। হিমালয়ের ওই শুভ্রতা, ওই অটলতা, ওই অকল্পিত বিরাটত্ব অন্তরের গভীরে কোথায় যেন নাড়া দিত, ধ্বনিত করে তুলত কি এক সুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে—আমার চিত্ত হয়ে উঠত, 'অকারণে চঞ্চল'। হিমালয় পর্বতকে দেখে শুধু পর্বত মনে হত না। কেন জানিনা মনে হত ধ্যাননিশ্চল কোন্ এক বিরাট সত্তা। এই সব অনুভূতি একদিকের আবার আরেক দিকের আরেকটি জিনিস আমাকে টানত যা ছেলেমানুষি না হয় পাগলামী বলা চলে। বাড়ি থেকে বের হলে আর সঙ্গে কেউ না থাকলে, পাকা সড়ক ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে যেখানে পথ নেই সেইসব জায়গার ভিতর দিয়ে চলতে, ওঠানামা করতে খুব ভালো লাগত। মনে আছে তখন আরও ছোট, ওইভাবে পাহাড়ের গায়ে পথ না থাকা পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এক এক সময় নিচের দিকে নামতে নামতে এমন নিচে চলে যেতাম যে আশে পাশে জনমানবের বসতি দেখতে পাওয়া যেত না, আর তা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক যে না হত তা নয়। তবু দমবার পাত্রী ছিলাম না। কখনও এমন হয়েছে, পা হড়কে পড়বার মুখে ছোট ছোট গাছের ঝোপের খানিকটা আঁকড়ে ধরে কোনও রকমে সামলে গিয়েছি। এইসব ঝোপঝাড়ের মাঝে ভারী সুন্দর ছোট ছোট হলদে এক রকম অম্লমধুর ফল পাওয়া যেত, তার প্রতি লোভও কম ছিল না। কখনও ফিরবার পথ হারিয়ে ফেলতাম। তা সত্ত্বেও ওই সব অজানা অচেনা পথে যাবার একটা নেশা কেমন আমায় পেয়ে বসত, রোখ চেপে যেত। বোঝা যাচ্ছে তখন থেকেই অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় জিনিস আমায় আকর্ষণ করত। দার্জিলিঙ যাওয়া আসা আমাদের ছোটবেলা থেকেই, তবু এই দার্জিলিঙের আকর্ষণ কখনও কমেনি। আসতে পারলে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম।

দার্জিলিঙে সেবার 'গ্লেন-ইডেন' ছু' নম্বরের বাড়িতে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার। তাঁর মেয়েরা, অতুলদা ও আমি, আমরা সবাই একসঙ্গে প্রায়ই

বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প বলে আমাদের খুব হাসাতেন। তিনি হাসাতে যত পারতেন হাসতেও তত পারতেন। এমনিতে মানুষটি ছিলেন ভারী শান্ত, ধীরস্থির, খানিকটা লাজুক মত। মিষ্টভাষী মোলায়েম প্রকৃতির। অন্তরঙ্গ মহলে তিনি ছিলেন বেশ মজলিশী মেজাজের। তাদের সঙ্গে যখন গল্পের আসরে বসতেন তখন যা জমাতেন। অতুলদা কথা বলতেন বেশ আস্তে মৃদুস্বরে, কিন্তু হাসতেন খুব জোরে—একেবারে প্রাণ খুলে। একদিন খুব মজার একটি গল্প করছিলেন—ব্রিটিশ সরকার বোধকরি টাকাকড়ি সম্বন্ধে কড়াকড়ি কিছু একটা করেছিলেন, হয় আইন, নয়ত অন্য কিছু, সে সব আমার ঠিক মনে নেই। তারই বিরুদ্ধে লখনৌএ কোনও বক্তৃতা মঞ্চে নানা লোকের বক্তৃতাদি হচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক মঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে—The Government says—ব'লে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে বক্তৃতার মাঝে হঠাৎ হিন্দী সুরে বলে ওঠেন—, 'আরে whose money ? Your father's money ?'—অতুলদার ঠিক সেই সুরটি অবিকল নকল করে বলার রকম দেখে আমরা হাসতে আরম্ভ করে আর থামতে পারি না। কত গল্পের পুঁজি যে ওঁর ছিল।

একবার আমরা অনেকে দার্জিলিং-এর 'ক্যালকাটা রোড' বলে রাস্তাটি দিয়ে চলছিলাম। অতুলদাও সঙ্গে ছিলেন। এই রাস্তাটি ধরে সোজা গেলে দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন 'ঘুম্'-এ পৌছানো যায়। 'ঘুম্' দার্জিলিং থেকে আরও বেশ উঁচুতে অবস্থিত। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা থাকতে দেখা যায়। চলতে চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এল মৃদু স্বরে গান—চেয়ে দেখি সামনের পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুন্‌গুন্ করে গাইছেন নিজেরই একটি গান—'কে হে তুমি সুন্দর'—মন যেন তাঁর কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম, আমার মনও ডানা মেলল। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে এক একবার তাকিয়ে বললেন—'গা না ঝুনু, গা না রে একটা গান।'—খানিকদূর গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে একটি পাকদণ্ডি দিয়ে একটু উপরে উঠে সুন্দর একটি জায়গা দেখে সবাই বসলাম। জায়গাটিতে এক একটি আলগা পাথর এমন ভাবে পড়ে আছে যে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝে ওই ভাবে তৈরী করা হয়েছে বসবার জন্যেই। পাথরগুলি বেশ ছড়ানো মত ছিল। যে যেটার উপর পারলাম গিয়ে বসে পড়লাম। সকলের মধ্যেই একটা স্তব্ধভাব যেন জমাট বেঁধে উঠেছে। সেই সময় অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন—'পাগলা মনটা রে তুই বাঁধ'—কি প্রাণ ঢেলেই গাইছিলেন, অদ্ভুত একটা

পরিবেশের সৃষ্টি হল। আর কী যে জমে গেল! এই গানটি রেণুকা দাশগুপ্তর গাওয়া গ্রামোফোনের রেকর্ডে যখনই শুনি, মনে পড়ে যায় অতুলদার সেদিনের গাওয়া এই গানটির কথা। পরে অতুলদা আমাকে গাইতে বলেন, আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান—'কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়' —শুনে অতুলদা কি যে বলবেন ভেবে না পেয়ে থেকে থেকে সমানে কেবল বলে যেতে লাগলেন—'বাঃ বেশ গেয়েছিস্, বেশ গেয়েছিস্'।—গগনচুম্বী সব পর্বতশৃঙ্গের দৃশ্য, তার উপর অতুলদার গাওয়া গান্ মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুরে যে গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসছে যেন অন্য কোন এক জগৎ থেকে, সে অভিজ্ঞতা কোনদিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ শুনলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ এসেছেন। আছেন 'আসানটুলি' নামক বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথীবাবু ও প্রতিমাদেবী। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে। দেখা করবার জন্যে মন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল, খুব আনন্দ হচ্ছে কবি এসেছেন শুনে। অতুলদা আর আমি গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনে বসবার ঘরে একা বসে গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা হাসি পিয়ানো বাজিয়ে গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান—'চলি গো চলি গো যাই গো চলে'—

ভারি মিষ্টি গাইছিলেন। পরে খবর পেয়ে সকলে এলেন। অতুলদাকে দেখে কবি খুবই খুশি হলেন, ভারি স্নেহ করতেন তাঁকে। সেদিন কবি বেশিরভাগ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনীই সবিস্তারে অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন। ১৯১২ সালে যে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন, বোধহচ্ছে আমেরিকাও গিয়েছিলেন, সেই সব কথাই হচ্ছিল। সেই আসরে সেদিন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অতুলদা, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতুলদা আগ্রহ প্রকাশ করে জেনে নিচ্ছিলেন কবি নতুন কি কি গান বাঁধলেন, কি লিখলেন ইত্যাদি। এইসব নানা কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ কবি কি মনে করে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আমায় একটু দেখলেন, পরে বেশ একটা ভঙ্গিতে অতুলদার দিকে চেয়ে গলার স্বরটি নামিয়ে অর্থপূর্ণ একটু চাপাহাসিহেসে চোখের ইসারায় একবার আমাকে দেখিয়ে অতুল-দাকে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'গানে অনুরাগ কি বলে? গাইছে আজকাল' —অতুলদা হেসে বললেন—'গানে অনুরাগ তো খুবই দেখছি,—উৎসাহের শেষ নেই। এরই মধ্যে আমার কাছে এসে কটা গান শিখে নিয়েছে।' অতুলদার কথা শেষ হতে না হতে চোখেমুখে এমন এক ভাবের ছটা ফুটিয়ে রহস্যের সুরে

আরও রস ঢেলে বেশ টেনে টেনে কবি বলতে লাগলেন—'ওহে, রোস রোস, এখনও ত বিয়ে হয় নি!'—ওঁর সেই বলার ভঙ্গিতে ঘরশুদ্ধলোক সজোরে হেসে উঠলেন। কবির কাছে আমি পরেও শুনেছি, আমায় বলেছেন—'তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে, নয় গান, দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।'

একবার স্থির হল 'ঘুম রক্' বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেইখানে বনভোজনে যাওয়া হবে। স্যার নীলরতন সরকারের মেয়েরা, প্রতিমাদি, রথীবাবু, অতুলদা, ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র (ইনি আমার এক পিসতুতো ভগ্নিপতী) ও আমি —আমরা ছিলাম একদল। ট্রেনে ঘুম্ পর্যন্ত গিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। শুনেছি এখন এসব পথে মোটর ইত্যাদি সবই চলাচল করে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সব হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রতিমাদির জন্যে ডাণ্ডীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুন্দর চওড়া রাস্তা, মনোরম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূর গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ার পথে উঠতে আরম্ভ করা গেল। চূড়ার ওঠার পথটি কিন্তু অত প্রশস্ত নয়। সকলেই দেখি জোঁকের ভয়ে অস্থির ও তটস্থ, কার জুতোয় কখন জোঁক ঢোকে। এই রাস্তাটিতে নাকি অসম্ভব জোঁক।

যথাস্থানে যখন উপস্থিত হলাম, দেখা গেল দ্বিজেনবাবু হঠাৎ লাফাচ্ছেন। কি ব্যাপার! অতুলদা হেসে বলে উঠলেন—'ওহে, লাফিয়ে আর কি হবে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, রক্ত খেয়ে আপনিই পড়ে যাবে!' তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সকলেই হেসে উঠলেও প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভয় ও অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। উপরে গোলমতন একটা জায়গা আছে সেইখানে খাবারদাবার জিনিস-পত্র রেখে আমরা ঘুরে ঘুরে চারদিকের অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করছিলাম। সকলের মনই কানায় কানায় ভরে আছে। মুগ্ধচিত্তে সবাই ঘুরছি, ফিরছি, দেখছি। দেখে দেখে কারোরই যেন আশ আর মিটছে না। খানিকবাদে ফিরে এসে সেই গোল জায়গাটিতে খাবারের ভাণ্ডার খুলে বসা হল। কতরকম খাবারই যে স্যার নীলরতনের মেয়েরা এনেছিলেন, তার মধ্যে মনে আছে দার্জিলিং-এর বিখ্যাত Vado-র দোকানের ক্রিম দেওয়া কেক্ যে কি উপাদেয়ই লেগেছিল! তারপর চল্‌ল গান গাইবার অনুরোধ উপরোধ কত কিছু। অতুলদা গাইলেন 'মিছে তুই ভাবিস মন'। আকৃশিদি (স্যার নীলরতনের দ্বিতীয়া কন্যা) গাইলেন, আমিও গাইলাম। কিন্তু কে যে কি গেয়েছিলাম তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে, অনেক সাধ্যসাধনার পর রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কাছে শান্তি চাব না' গানটি। দার্জিলিঙে

সেবার রবীন্দ্রনাথ ও অতুলদাকে একসঙ্গে পেয়ে যে আনন্দ করব বলে অনেক আশা করেছিলাম, তা আর হল না। আমাকে হঠাৎ নেমে আসতে হল।

দিলীপকুমার রায়ের নিমন্ত্রণে একবার মধুপুর বেড়াতে যাই। অতুলদাও গিয়েছিলেন। আমরা দিলীপের মেজমামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র) ও তাঁর পত্নী মন্দাদেবীর অতিথি হয়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে তখন আমার সবে নতুন আলাপ। সঙ্গীতের সূত্রেই হয় এই পরিচয়। তখন কলকাতায় নানা জায়গায় দিলীপকুমার রায়ের গানের জলসা চলেছে পুরোদমে। তাঁর সঙ্গীতের অনেক আসরে তিনি আমাকেও সঙ্গে নিতেন গাইবার জন্যে। বাংলাদেশ তখন দিলীপ রায়ের অতুলনীয় কণ্ঠস্বরে, তাঁর গানের ঢঙে মুগ্ধ পাগল। কলকাতা সহরবাসী সব মেতে আছে। বাংলাগানে তিনি এনে দিয়েছেন একটা নতুন ধারা, নতুন প্রেরণা, খুলে দিয়েছেন নতুন একটা দিক্। অতুলদা মধুপুরে আসছেন শুনে দিলীপ আমাকেও যাবার জন্যে বিশেষ করে লেখেন। গানের লোভ ত আমার যথেষ্টই, তার উপর অমন সকলের সঙ্গ ও সাহচর্যের লোভও দেখলাম বড় কম নেই। স্থির করলাম মধুপুর যাব। মনে আছে মধুপুর স্টেশনে যখন নামছি, দেখি আমার কম্পার্টমেণ্ট থেকে একটু দূরেই অতুলদাও নামছেন ওই ট্রেন থেকেই। হঠাৎ ওইভাবে ওকে দেখে খুব আনন্দ হল, অবাকও খুব হলাম। কেন না ওই গাড়িতে যে অতুলদাও আসতে পারেন তা আমার ধারণাতেই আসেনি। দিলীপরা স্টেশানে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি রওনা হওয়া গেল। গিয়ে দেখি বাড়িভরা লোক, ওদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব অনেকেই রয়েছেন। আমি রইলাম মন্দাদেবীদের সঙ্গে তাদের 'প্রসাদ-ভবন' নামক বাড়িতে। অতুলদা রইলেন দিলীপের বড়মামা সুবিখ্যাত ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে। সেবাড়ি তখন খালি। পর পর পাশাপাশি তিনটি বাড়ি মজুমদারদের তিন ভাইয়ের—একটির ভিতর দিয়ে আরেকটিতে যাওয়া-আসা করা যায়। প্রসাদভবনের তলায়, পিছন দিকের লম্বা বারান্দায় বেশ লম্বা এক সারি করে সব খেতে বসা হত। সে সময় চলত সব উপভোগ্য গল্প রসিকতা, আর চলত হাসাহাসির পালা। তকুমামা দিলীপের মেজমামা, প্রতি কথাতেই সবাইকে হাসাতেন। তার একটি নমুনা দেবার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। নিজে বেশ গম্ভীর হয়ে বলতেন। সেদিনও দেখি গম্ভীর হয়ে বলছেন—'ফুলশয্যার সেই দারুণ শীতের রাতে লেপটি উনি টেনে নিলেন—সেই যে আমি কাঁপতে শুরু করলাম, আজও কাঁপছি!'

হাসি আর থামেই না। অতুলদা তাঁর পুঁজি খুলে বসতেন, বের করতেন রকম রকম হাসির খোরাক, ঘর ভরে যেত হাসির উচ্চরোলে। দিলীপের জ্যাঠতুতো ভাই শচীন্দ্রলালও এক্ষেত্রে কম যেতেন না, তিনি ছিলেন আর একজন যার রসিকতা করবার ক্ষমতাও ছিল যেমন ঢঙও ছিল তেমনই অদ্ভুত। চারবার খাবার সময়ই এই ব্যাপার চলত। তাছাড়া অন্যান্য সময়ও সুবিধা বা সুযোগ পেলে কেউই তা আর বৃথায় যেতে দিতেন না। সেবার মধুপুরে যা হাসিটা হাসতাম, মনে হত আর কখনও অমন হাসি হাসিনি। তবে তারও উপর পাল্লা দিয়ে চলত আমাদের গান। কি গানই কদিন গাওয়া হয়েছিল! অতুলদা যে বাড়িতে উঠেছিলেন সেখানেই হত গান। তিনি শেখাতেন তাঁর নিজের গান আর আমরা কখনও সব গোল হয়ে বসে সকলে একসঙ্গে শিখতাম, কখনও বা শুধু দিলীপ আর আমি। সকলে চা খেয়ে বসতাম, শুরু হত গান, চলত যত বেলা অবধি চলে, বিকালে সব এক সঙ্গে বেড়াতে বের হতাম, সে সময়ও হৈ-হুল্লোড়, হাসি-গল্প কিছু কম হত না। ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা আবার আরম্ভ করা যেত গান, শেষ হত রাত্রির খাবারের ঠিক আগে। প্রাণভরে প্রাণ খুলে মনের আনন্দে আমরা গান গাইতাম। কি অফুরন্ত আনন্দেই যে কাটত সে সময়টি! অতুলদাও হয়ে থাকতেন তৃপ্তিতে আনন্দে ভরপুর। গান থামাবার দরকার না হলে হয়ত আমরা আরও চালিয়ে যেতাম। অতুলদা কিম্বা আমরা কেউই যে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছি এমন বোধ হত না। মধুপুরে ছিলাম ছয় কি সাত দিন। ফিরে এসেছিলাম গানের ঝুলি বোঝাই করে।

অতুলদার কাছে গেলেই গান, শুধু গান আর গান। সব সময় সুরে সুরে ভেসে বেড়াতাম, সুর চিরদিনই আমার প্রিয়, আমায় আকর্ষণ করেছে, আজও করে সমভাবেই, যখন যেখানে যেভাবে থেকেছি, সুর শুনলেই সব ভুলে মন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। অতি শিশুকালে খেলতে খেলতে সুর যদি শুনেছি কোথাও, অমনি কান চলে গেছে সেদিকে, খেলা ভুলে গেছি। সুর আমার সংসারের মন কেড়ে নিয়েছে, গৃহকাজে করেছে আনমনা। সুর আমার ভগবানের প্রসাদ, আমার জীবনকে করেছে ভবগদ্‌মুখী। সুরে পেয়েছি আলো, পেয়েছি ভগবানের নিবিড় স্পর্শ। অনুভব করেছি অনেক কিছু। সুর নিয়ে পৃথিবীর জীবন শুরু করেছিলাম, আজও কণ্ঠে সুর নিয়ে চলেছি বিদায়ের পথে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, যাঁরা সুরের মানুষ, আমার সুরের জীবন তাঁদের সুরে অনেকখানি আশ্রয় পেয়েছে। তাঁদের আমি যেটুকু চিনেছি, জেনেছি তা তাঁদের গানের ভিতর দিয়েই বেশি। অতুলদার কথা লিখতে গেলে তাই গানের

কথাই আগে মনে আসে এবং আমার গানের কথাও তার মাঝে এসে পড়ে। অতুলদার জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার জীবনে তাঁর সংস্পর্শের কথা, তাঁরই সংস্পর্শভরা আমাদের সেই সব গীতমুখর দিনগুলির কথা—কিভাবে তাঁকে দেখেছি, পেয়েছি তাঁর স্পর্শ, কিভাবে তিনি সাড়া দিয়েছেন, আমি লিখবার প্রয়াস পেয়েছি বেশির ভাগ সেইসব কথাই।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের সময় একবার আমি অতুলদার কাছে লখ্‌নৌতে ছিলাম। সেই আমার প্রথম সঙ্গীত সম্মিলনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। সর্বক্ষণ সে যে কি অসহ্য পুলক। আগ্রহের আতিশয্যে খাবার পাট কোনও রকমে চুকিয়ে, মনে একটা অসম্ভব তাড়ার ভাব নিয়ে চলে যেতাম অতুলদার সঙ্গে সেই সঙ্গীতের আসরে। সারাদিন রাত্রি যতক্ষণ গান বাজনা চলত, কিভাবে যে সব তন্ময় হয়ে বসে শুনতাম! মনে হত যেন অন্যরাজ্যে প্রবেশ করেছি। দিলীপও সেই সময় এসেছিলেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। সঙ্গীত পাগল আমরা সব একদল জুটেছিলাম। সব সময়েই মেতে রয়েছি গান বাজনা নিয়ে। এক একটি পর্ব শেষ হলেই উন্মুখ হয়ে উঠতাম আর একটি পর্বের সুরুর জন্যে। অতুলদা, ধূর্জটিদা, দিলীপ রায়, এঁদের মত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বোদ্ধাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে সব বড় বড় গুণীদের সঙ্গীত শোনার গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম সেবার। সঙ্গীত সমজদারদের সঙ্গে বসে সঙ্গীত যে আরও বেশি উপভোগ করা যায় তাই দেখলাম। অনেক জিনিসই চেনা যায়, ধরা যায় তাঁদের সাহচর্যের গুণে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে দেখতাম থাকতেন মণ্ডপের মাঝে বসে। সুন্দর ধ্যানী মূর্তি। বসতেন সঙ্গীতসভা আলো ক'রে। অতুলদার বাড়িতে একদিন তিনি এসেছিলেন। অতুলদা তাঁকে আমার গান না শুনিয়ে ছাড়েন নি। ছেলেমানুষের মত গান শোনানোর তাঁর সে আগ্রহ দেখার মত। কন্‌ফারেন্‌স্‌ শেষ হয়ে যাবার পরে লখ্‌নৌয়ের কোন্‌ এক বিরাট হলএ একদিন গানের এক আসর হয়। সেই আসরে আমারও গান হয়। যে আসরে মথুরার বিখ্যাত ওস্তাদ চন্দন চৌবে, ভাতখণ্ডের প্রিয়শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের মত অত বড় বড় গায়কেরা গাইবার জন্যে এসেছেন, সেই আসরে আমার মত একজনের—যার ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা ছাড়া শিক্ষাদিক্ষা কিছুই নেই, তার গিয়ে বসে গাওয়াটা যে কতটা কিরকম ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দেখলাম অতুলদার তার জন্যে কোনও তাপউত্তাপ নেই। বরং মহা-উৎসাহে, এবং বেশ গৌরবের সঙ্গেই সকলের কাছে আমাকে তাঁর বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এই

অনুষ্ঠানে দিলীপের শেখানো একটি হিন্দী গান গাইবার কথা। দিলীপ আরও একটি গান, মীরার ভজন, তালিম দিয়ে তৈরী করিয়ে রাখলেন, দরকার হলে যেন গাইতে পারি। সেদুটি গান ত গাইলামই, শ্রোতাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধে সেদিন আরও দুটি গান আমাকে গাইতে হল। একবার দিলীপ মথুরায় গিয়ে চন্দন চৌবের কাছ থেকে কাফিসিন্ধু রাগের একটি হোলির গান শিখে এসে আমায় শেখান। গানটি হচ্ছে—'মোহিয়া সামলিয়াকি দেখ'। অতুলদার একান্ত ইচ্ছেয় চন্দন চৌবের সামনেই সেই গান আমাকে দিয়ে সেদিন গাওয়ানো হল। দিলীপের মুখও সেদিন কম উজ্জ্বল দেখিনি। তারপর সেই আসরে এসে গাইতে বসলেন চন্দন চৌবেজী। আমরা একেবারে ওঁর পাশেই, মঞ্চের ঠিক নিচে বসেছিলাম। কি অপূর্ব সব মীড়ের কাজই যে করতে লাগলেন! শুনেছিলাম মীড়ের কাজে উনি বিখ্যাত। এক একটি অদ্ভুত সুন্দর কাজ করছেন আর পাশে ফিরে ফিরে কেবল আমার দিকে দেখছেন। অতুলদা খুশির সুরে বললেন—'দেখলি ত, তুই যে বড় গাইতে আপত্তি করছিলি? তোর গান শুনে বুঝতে পেরেছেন তুই একজন সমজদার।'—সেবার লখনৌ সঙ্গীত সম্মিলনে মোরাদ খাঁর বীণায় যে দরবারী কানাড়া শুনেছিলাম, আজও তার স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দেয়। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর সেতার, বীরু মিশ্রের তবলা, আলাউদ্দীনের মাইহর ব্যাণ্ড, তাঁর স্বরোদ, ফিদা হোশেন, হাফেজ আলি—এঁদের স্বরোদ—সব আমাদের যেন কোন্ রসলোকে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে সে বোধ কারোরই নেই। শুধু চোখে চোখে খেলে যাচ্ছে সকলের মন খুশির হিল্লোল। হাফেজ আলীর স্বরোদ বাজনা—সে সত্যই এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার! তার তুলনা নেই। প্রতিটি সুরের পর্দা থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে কি রস যে বার করছেন, আর সে রসও কি রস—যা শুনেছিলাম সেজিনিস অন্য জিনিস। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আর একবার দেখা হয় অতুলদার উপস্থিতিতে আমাদেরই এক গানের আসরে। অতুলদার জন্যেই সে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিন আবার হাফেজ আলীর অমন বাজনা প্রাণভরে শুনেছিলাম। তাঁকেও অতুলদা আমাদের গান শুনিয়েছিলেন। সঙ্গীত সম্মিলন হয়ে যাবার পর অতুলদা ধরে বসলেন কদিন আমাদের গানের আসর হোক। আমি মনে মনে ভাবলাম এখন সব গানবাজনার পরে আমাদের গান জমবে কি না। ধূর্জটিদা এবং আরও অনেকেই অতুলদার এই প্রস্তাবে সায় দিলেন বেশ জোরের সঙ্গেই। অতুলদা, তাঁর বিশেষ বন্ধু বিচারপতি শ্রী মিশ্রের বাড়িতে একদিন আমাদের নিয়ে গেলেন। দিলীপের

গানই হল প্রধানত, তবে আমিও দু'একটা গেয়েছিলাম। তারপর সুরু হল বাড়ি বাড়ি দিলীপের ও আমার গানের আসর। শিল্পী অসিত হালদার, প্রফেসর রাধাকুমুদ এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয় দাসগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলদা, এঁদের কারো না কারো বাড়িতে প্রতিদিনই হত গান। প্রতিদিনই কি যে জমত। গান যত জমে উঠতে লাগল অতুলদার উৎসাহও ততই বেড়ে যেতে লাগল আর আমার ফিরে যাওয়াও ততই পিছিয়ে যেতে লাগল। অতুলদা এসে বসতেন পাশে, তাঁর উদ্ভাসিত মুখচোখের নানাভাবে প্রকাশ পেত তাঁর অন্তরের দোলা, তৃপ্তি, আনন্দ। অতুলদা, ধূর্জটিদা এঁদের মত শ্রোতা পেয়ে আমাদেরও ভিতরটা খুলে গিয়েছিল একেবারে, আমরাও গানের মাঝে নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলাম উজাড় করে। অতুলদা ছিলেন আমাদের প্রধান আকর্ষণ, আমাদের আনন্দের মধ্যমনি। তাঁরই জন্যে গানের আসর এমন জমে উঠত। তার উপর দিলীপ ছিলেন, আসর আরও জমজমাট হত।

লখ্‌নৌ প্রবাসী আইনজীবী অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর স্বভাবের গুণে ব্যবহারে, বাঙালী অবাঙালী সকলেই তাঁকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করত, সম্মান করত, নিজেদের প্রিয় পরিজনের মতই দেখত। প্রবাসী বাঙালীদের শুধু যে তিনি একটা আশ্রয় স্বরূপ বা অবলম্বন ছিলেন তাই নয়, সর্ববিষয়েই ছিলেন তাদের একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। তাদের মধ্যে বাংলাভাষার চর্চা যাতে থাকে তার জন্যে তিনি কম ভাবেননি, কম করেননি। তাঁরই প্রয়াসে, সহায়তায় এবং সম্পাদনায় 'উত্তরা' নামক মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী' তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনি প্রথম তার সূচনা করেন। অতুলপ্রসাদের গৃহ ছিল বাঙালীদের, সাহিত্যিকদের সকলের আনন্দ নিকেতন, মিলন কেন্দ্র।

অতুলদা ছিলেন উদারচেতা আত্মভোলা দিলদরিয়া মানুষ। হৃদয়টি ছিল দরদ দিয়ে গড়া। তাঁর কাছে গেলে বোঝা যেত মানুষটি কত নরম, কত নত নম্র আর কত মধুর প্রকৃতির। এই স্নিগ্ধ নরম স্বভাবের জন্যে তাঁর সান্নিধ্য সাহচর্য সংশ্রব সবই আমাদের এত মধুর মনে হত। তাই ভাবি তাঁর গানে ও স্বভাবে কি আশ্চর্য মিল ছিল, কতভাবেই তাঁকে দেখেছি, কিন্তু 'আমি' 'আমি' এইভাবের কোনও প্রকাশ তার মধ্যে কখনও দেখিনি। সেই জন্যে কোনও কিছু নিয়ে অহঙ্কার করতেও কোনওদিন দেখা যায় নি। দেবার দিকে যেমন সহজ প্রবণতা ছিল, লাভলোকসানের দিকে তেমন হিসেবজ্ঞান মোটেই ছিল

না। তাঁর দানে পুষ্ট হত অনেকেই। আমার জীবনের এক সঙ্কটের দিনে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁকেও পেয়েছিলাম পাশে, পেয়েছিলাম তাঁর গভীর দরদেভরা সহানুভূতি শুভকামনার নিবিড় স্পর্শ। মানুষের জন্যে করাই ছিল অতুলদার স্বভাব। তাঁর উন্মুক্ত দুয়ার থেকে শূন্যহাতে কোনও প্রার্থীকেই কখনও ফিরে যেতে হয়েছে বলে জানিনা। যে ভাবেই যে এসেছে, সকলকেই কাছে টেনে নিতে বাড়িয়ে দিয়েছেন হাত।

যে আসে মনের দুখে যে আসে মুল মুখে
টেনে নে সবায় বুকে
ও তোর থাক্‌না চোখে জল্ রে ভোলা।—

এই লাইনগুলির মাঝে মনে হয় যেন অতুলদাকেই দেখছি। তাঁর রচিত অনেক গানে পাই তাঁর জীবনের ছবি।

যে সব গুণ থাকলে মানুষ অসাধারণ পর্যায়ে পড়ে, অতুলদা সে সব গুণেরই অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কারও সম্বন্ধে শুধু ওইটুকু বললেই সব বলা হয় না। পরিচয় অন্য জিনিস, নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। অসাধারণ বা গুণীজনের প্রত্যেকেরই চরিত্রের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। কারও প্রভাব মানুষকে কাছে আনে, করে নেয় সহজেই আপন। কারও প্রভাব দূরে রাখে—দূর থেকেই করে তাঁকে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, করে ভক্তি, দূর থেকেই ভালোবাসে। অতুলদার সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি অতুলদা তাঁদেরই একজন, তাঁদের ঘরেরই লোক, যেন কত কাছের মানুষ। তাঁর সংস্পর্শের প্রভাবে দূরত্ব ঘুচে গেছে, দূরের মানুষের কাছের মানুষ হতে সময় লাগেনি। অতুলদা ছিলেন, এবং হতে পেরেছিলেন সকলেরই আপন। সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসতেন নিজেকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে—

সবারে বাস্ রে ভালো
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে
যাহা তোর আছে ভালো
ফুলের মত দে সবারে—

তাঁর আর একটি গানে আছে—

সবারে কর্ রে আপন
হ'য়ে তুই সবার আপন।'

অতুলদারই স্বভাবের প্রতিচ্ছবি যেন।

অতুলদার কথা বলছি আর মনে পড়ছে তাঁর সেই শান্ত উদাসী চেহারাটি। গভীর চোখদুটি দেখলে মনে হত না-বলা কোন বাণীর নীরব ভাষা। দুঃখ আঘাত তিনি অনেকই পেয়েছেন। তাতে তাঁকে ভেঙে পড়তে দেখা যায় নি। একদিকে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহপ্রবণ, কিন্তু অন্যদিকে অন্তরে ছিলেন বৈরাগী, ছিলেন ভক্ত। তাই জীবনের সকল শূন্যতাকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন 'ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে, তাঁকে আত্ম নিবেদন করে।—

'কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ বাটে
তোমার কাছে, হে মহাজন
সবাই বাঁধা রবে কবে!'

তাঁর গানের অপূর্ব এই লাইনগুলি থেকে বোঝা যায় ভগবানে তাঁর নির্ভরতা, তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি। বোঝা যায় তিনি কোন্ পথ ধরেছিলেন, কোন পথের পথিক—

'বলিব না রেখো সুখে
চাহ যদি রেখো দুখে
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে
চলিব চাব না পিছে,
আমার ভাবনা, প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।'—

কি সুন্দর আত্মনিবেদনের সুর! এ পথে এসে আরও বুঝতে পারি এর মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের গান

'শৈশব হতে তব গীতসুধাপানে
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে।
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা।
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে কি তার নিভৃত আশা'

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এই হল আমার প্রথম কথা। আমার প্রাণের কথা। সঙ্গীত বলতেই বোঝায় সুর, আর তার প্রকাশের অনন্ত সম্ভাবনাকে। সুরের গভীরে রয়েছে তার অতলের বারতা—কখনও তা মূর্ত হয়ে বাজে গুণীর হাতে যন্ত্রের মাধ্যমে, কখনও গুণীজনের কণ্ঠে। সঙ্গীতজ্ঞ, সুরজ্ঞ, সব শিল্পীই রূপকার। এঁরাই আমাদের এনে দেন সুরের অন্তহীনতার স্পর্শ, এঁরাই ব্যক্ত করেন অব্যক্তকে, রূপের মাঝে রূপাতীতকে। সুরের একাধিপত্যের মাঝখানে যখন বাণী এসে দাঁড়ায় তার প্রকাশের ব্যঞ্জনা নিয়ে, দাবী নিয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্যে, তখন তাকে বরণ করে নিয়ে সুরকে তার জন্যে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তার সে দাবী মেটাতে। সুর তখন আর একা নয়। তখনই হয় গানের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সঙ্গীত সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে কবি যেসব গান লিখতেন. তার অধিকাংশ গানেরই সুর হত রাগপ্রধান—ধ্রুপদাঙ্গই বেশি, টপ্পাও কিছু কিছু। আমরা ছোটবেলায় ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে তাঁর রচিত যেসব গান গাইতাম বা শুনতাম, সে সবও দেখতাম প্রধানত রাগপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি তাঁর বাল্যজীবন কাটে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের পরিবেশে। সে সময়কার অনেক সব গল্প আমরা কবির মুখে শুনতাম। বেশ রসিয়ে আর জমিয়ে তিনি সেসব গল্প বলতেন। প্রসিদ্ধ গায়ক যদুভট্টের নাম তাঁর মুখে খুব শোনা যেত। শুনেছি তাঁদের বাড়িতে যদুভট্ট ছিলেনও। যতদূর মনে হচ্ছে তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে বাল্যকালে সঙ্গীত শিক্ষা তিনি করেছিলেন। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই সঙ্গীতের আসর বসত, সমাগম হত কত সব গুণীদের। বহু গুণী এবং সঙ্গীত বিশারদের গান বাজনা শুনবার তিনি সুযোগ পান। কাজেই সেই সব সঙ্গীতের প্রভাব তাঁর সঙ্গীত রচনার সুরুর দিকে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। এবং ধরে নিলেও বোধ হয় ক্ষতি হয় না যে তাঁর সঙ্গীতের মূল, মার্গসঙ্গীতের

ভিত্তিভূমি থেকে কিছু রস আহরণ করে নিয়েছে। কবি বলতেন, প্রথম দিকে তিনি নাকি আগে গান লিখে পরে তাতে সুর সংযোগ করতেন। এই ভাবেই সাধারণত দেখা যায় গীতকারেরা গীত রচনা করে থাকেন। যাই হোক আমরা যখন দেখেছি তখন কিন্তু কবির গীত রচনার পদ্ধতি অন্য রকম দেখেছি। গান রচনাকালে গানের কথা ও সুর তাঁর একই সঙ্গেই আসত। আলাদা করে আর আগে গান লিখে পরে সুর বসাবার দরকার হত না। গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে গেয়ে কবি গান রচনা করতেন। আমি এই রকমই দেখে এসেছি তার গীতরচনার রীতি। এবং তাঁকে বলতেও শুনেছি এইটেই তাঁর স্বকীয় স্বাভাবিক ধারা। আমি পণ্ডিচেরী চলে আসবার পরে তাঁর গীত রচনার ধারার আর কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে তিনি তাঁর আগেকার অনেক কবিতায় সুর দিয়ে গান করে দিয়েছেন সে খবর এখানে বসেই পাই। সে রকম একটি গান - 'কালো, তা সে যতই কালো হোক্'—শুনেছিলাম শান্তিদেব গেয়েছিলেন যখন তিনি একবার আমাদের আশ্রমে বেড়াতে আসেন। পরে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অনেক গান গাইতে শুনি কবির আগেকার রচিত কোনও কোনও গানের সুরে সন্তোষ সেনগুপ্ত যখন তাঁর দলবল নিয়ে এসে আমাদের 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিয়ে যান সেই সময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত রচনাবলীর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য নিজস্ব সম্পদ কীর্তন, বাংলা দেশের প্রাণ বাউল ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের সুরও বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। বহু গান তাঁর আছে ওই সব সুরের ওপর। বিশেষ করে বাউল সুরে। বাউল গানের চিরদিনই তিনি খুব বেশি ভক্ত ছিলেন। শেষ জীবনের গানেও তাঁর বাউল সুরের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অনেকেই হয়ত জানেন যে রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়ে থাকে 'বাউল কবি'। আর একটি জিনিস কবি সুরু থেকেই করতেন, সেটি হচ্ছে আমাদের নানান্ দেশের ত বটেই, বিদেশেরও অনেক গান ভেঙে তাতে বাংলা কথা বসিয়ে দিতেন। তাঁর রচিত 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি গীতিনাট্যে বিদেশী সুরের অনেক গান পাওয়া যায়। এইভাবে তাঁর সঙ্গীতে নানা জিনিস স্থান পেয়েছে। কোনও একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকেনি বা আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। পরে অবশ্য গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে—যা আজ পরিচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে।

একবার মনে আছে খুব বড় গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। গাইছেন রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে।

সে অবশ্য বহুদিনের কথা। আমার বয়স তখন অল্পই। রাধিকাবাবুকে দেখে মনে হল তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর মুখে সেদিন রামকেলী রাগে রচিত রবীন্দ্রনাথের—'স্বপন যদি ভাঙিল'—গানটি শুনবার সৌভাগ্য লাভ করি। এখনও কানে বাজে—'স্বপন'-এর 'ন' এর উপর ওঁর সেই অপূর্ব দানা বাঁধা গিট্‌কিরীর কাজ, আর মনে পড়ে 'ভাঙিল'-এর 'ভা'-র উপর মীড়ের ঠিক আগেই ঝোঁকটি ফেলার কায়দার কথা। এই গানটি কারও মুখে শুনলেই রাধিকাবাবুর কণ্ঠে শোনা গানটির সেই সব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কি সব উদাত্ত পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বরই ছিল তখন। এখনও হয়ত আছে ওস্তাদমহলে কিম্বা অন্যত্রও, কিন্তু আমরা আজকাল সাধারণতঃ যে সব শিল্পীদের গান শুনতে পাই তাদের গলা শুনে আমাদের মন ভরে না, বিশেষ করে ছেলেদের, তাদের কারও কণ্ঠেই ওজস্, পৌরুষ—এসব পুরুষোচিত শক্তি সম্পদের যে আবেদন, তার কোনও পরিচয়ই পাই না। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় কেমন শক্তিহীন, দুর্বল, শুধু মিষ্টত্বেরই পূজারী যেন তারা। অথচ গাইয়ে তারা সত্যই ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখনকার এই সই চাপা চাপা অস্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে আমাদের যারা আজীবন স্বাভাবিক খোলা গলায় গান গেয়ে এসেছি, প্রাণ এক এক সময় কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মাইক আমাদের অনেক উপকার করেছে। কিন্তু এদিক দিয়ে উপকার বেশি করেছে না ক্ষতি বেশি করেছে তাই ভাবি। মাইকের যুগে স্বাভাবিক গলায় কেউ আর বড় গান গায় না। তার মূল্যও কেউ ধরে বলে মনে হয় না। মাইকে আবার সকলের গলা সমান আসে না। কারও কারও খুবই ভালো আসে অন্যদের তুলনায়। এজন্যে প্রায়ই বলতে শোনা যায়—'অমুকের খুব ভালো গলা',—কিম্বা—'অমুকের মাইকের গলা নয়'—কারুরই আর আসল গলা শোনা আমাদের ভাগ্যে হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত, সঙ্গীতজগতের একটা নতুন স্তরের দ্বার খুলে দিয়েছে। সঙ্গীতজগতে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা যুগ। এই সঙ্গীত অন্য পর্যায়ে পড়ে। এর জাত আলাদা, অভিব্যক্তি অন্যভাবের, উপাদান ভিন্ন, গঠন গায়কী সবই তার বৈশিষ্ট্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের এমন এক জিনিসের আস্বাদ দেয় যে মনে হয় কি এক অনুভূতির মধ্যে বাস করি যেন। এসব ব্যক্ত করার নয়, বোঝানোও যায় না। শুধু অনুভব করার, যে পারে সেই পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতেই বোধ হয় প্রথম প্রতিভাত হয়, কথা সুর ও ভাব কিভাবে এক হয়ে যায় আর ব্যক্ত করে এই এক হয়ে ওঠাকে। তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যই

এইখানে, এই হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয়ের একটা বিশেষ দিক। এই এক হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হয় যে সুর সেই সুরই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতরকার আসল সুর। এইটি ফুটিয়ে তোলাই হল গায়কের কাজ। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা কত বেড়ে গেছে, ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। সর্বত্রই এখন তার আদর, তার চাহিদা। আমাদের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত এতটা প্রচলিত ছিল না। সুধী সমাজে বিশেষ কোনও কোনও গোষ্ঠীতে, কোনও সম্প্রদায়ের মাঝে ছিল তার সমাদর। তখনও জনসমাজ তাকে এইভাবে নিতে পারেনি। বোধকরি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঠিক এমনটি দেখে যেতে পারেননি। আজ দেশব্যাপী তাঁর সঙ্গীতের এতটা প্রচলন আনন্দেরই খবর, কিন্তু এখন তাঁর যে গান শুনি সে গান শুনে খুশি হতে পারি না এ সত্য গোপন করব না। যেভাবে আজকাল তার গান গাওয়া হয়ে থাকে, এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীত ব'লে যে গান আমরা অহরহ শুনছি, তার মাঝে রবীন্দ্রনাথের গানকে খুঁজে পাই না। সবচেয়ে বেশি বেদনা বোধ করি স্বরলিপির নিগড়ে বাঁধা তার এই বন্দীদশা দেখে। চারিদিকে নিয়ম কানুনের আঁট ঘাট বেঁধে তাকে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে যে গাইবার সময় এই সব নিয়ম কানুনের চোখ রাঙানীই যেন মনে হয়, গায়কের মনের ও চোখের সামনে বড় হ'য়ে, বাধা হয়ে ওঠে তার নিজেকে দেবার পথে, ঠিকমত ব্যক্ত করার বা ফুটিয়ে তোলার পথে, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পথে। শুধু স্বরলিপিকেই যথাসর্বস্ব করে নিয়ে চললে তার পরিণাম যা হবার তাই হয়ত হয়েছে। নইলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, বাইরে সুরের কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়েও গানে গায়কের নিজেকে দেবার এবং ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ যে আছে এ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের গান মনে হয় 'সিমপ্লিসিটি'-র প্রতিমূর্তি যেন। এতে নেই কোনও রকম আড়ম্বর, কোনও বাহুল্য। একেবারে সাদাসিধে রকমের—সহজ, সংযত, সুসম্বদ্ধ। এক একটি গান মনে হয় যেন সরলরেখায় ফুটে আছে একটি সুন্দর শুভ্র ফুল। তাই চলে না এর উপর বাইরের হস্তক্ষেপ। তিনি তার সঙ্গীত প্রতিমাকে অলংকার দিয়ে সাজাননি, সাজিয়েছেন অন্তরের পূজার ফুলে তাই তা এমন শুভ্রসৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথের গানে কত দিকই আমরা দেখতে পাই। তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিকে আমরা দেখতে শিখেছি নতুন করে, নতুন ভাবে। ভালোবাসতে শিখেছি, তাকে পেয়েছি কাছে, আপন করে। শুনেছি তার ভাষা, তার মনের কথা। কবি, তাঁর কাব্যে, তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে এনে তার অবগুণ্ঠন খুলে আমাদের সামনে তুলে ধরে দেখিয়েছেন

তার স্বচ্ছ স্বরূপ, তার রূপের আলো। ঋতুর ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন গানে গানে। কত ঋতু উৎসবসঙ্গীত রচনা করেছেন। প্রতিটি ঋতুকে তিনি কত ভাবে রূপ দিয়েছেন নৃত্যে, গানে, নাট্যাকারে, কত উৎসব সভা জমিয়ে দিয়েছেন, রাঙিয়ে দিয়েছেন গানের রঙে রঙে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুণে আর রবীন্দ্ররচনা-বলীর গুণে প্রকৃতিকে এখন আমরা শুধু ভালোবাসিনা। তাকে উপভোগ করি নানা ভাবে, আমাদের জীবনের মাঝে এসে সে আজ দাঁড়িয়েছে। তাই যখন বর্ষা নামে, মূসলধারে বৃষ্টি পড়ে, সুরু হয় মেঘের গুরু গুরু গর্জন—আমাদের মনের মধ্যে যাওয়া আসা করে একের পর এক কত গান আমরা কখনও গেয়ে উঠি—

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে

কখনও সুরু করি—

ঘনজটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে

কিম্বা—

আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে

ঘুমভাঙা চোখে যখন ভোরের আলোর পানে চোখ মেলে তাকাই কানে বাজে—

প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি উঠল বেজে যেই

তেমনি গভীর অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে নিদ্রাহারা চোখে কত সময়েই আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, গাইতে ইচ্ছে যায়—

আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে
চেয়েছিলাম চেয়ে থাকা তারার সাথে

গাইতে ইচ্ছে জাগে—

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে
আছে সবে মোর বাতায়ন পানে চেয়ে

জ্যোৎস্নাধোওয়া মনোহরণ রাত যখন মন প্রাণকে উদাস ক'রে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়, তখন পথিক মন গান গেয়ে চলে—

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ভাবনা আমার পথ ভোলে

কি অপূর্ব এসব অনুভূতি। কত অনুভূতি লাভ করেছি তাঁর গান গেয়ে। ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না যে কি নিবিড় যোগাযোগই আমাদের আজ এ সবের সঙ্গে। সবই যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। চেষ্টা করে মনে আনতে হয় না। তারা আসে আপনা আপনি, সঙ্গে সঙ্গে,

যেন আমাদেরই ভিতরের জিনিস, মিশে আছে রক্তে। তাই বলছি—ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকারে, দিনের তাপে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায়, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, ভাঙা গড়ায় আনন্দে উৎসবে—সব কিছুতে, সবের মাঝেই আমরা শুনি তাঁর গান বাজে আমাদের প্রাণে, আমাদের কানে। কত সহজ হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে আজ আমাদের সম্বন্ধ, আজ আমাদের অন্তরের লেন দেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর একটি অমূল্য দান হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধে তাঁর রচিত অতুলনীয় গানগুলি। গভীরতার অতলস্পর্শী এই গানগুলির সত্যই তুলনা খুঁজে পাই না। অবশ্য কবির কোন্ গানেরই বা তুলনা আছে। তবু মনে হয় এ যেন অন্য আরও কিছু। যতবারই গাওয়া যায় ততবারই পাওয়া যায় নতুন প্রেরণা, নিভৃত অন্তরে জ্বেলে দেয় পূজার প্রদীপ, দেখায় পথ আপনার গভীরে প্রবেশের। গাইতে গাইতে এমন হয় গান তখন আর গান মনে হয় না হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে দিয়ে ভগবানের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস, ভক্তি ভালোবাসার অসাধারণত্ব আমাদের বার বার দেখিয়ে দেয় তিনি কোন্ স্তরের মানুষ। জীবনে যা যখন ঘটেছে, তা যত সঙ্গীনই হোক আর তার আঘাত যত চরমেই উঠুক প্রতিটি ঘটনাকে তিনি যে দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, গ্রহণ করেছেন, তার কোনটাই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যায়ে পড়ে না। আধ্যাত্মিক সাধনা নইলে যে জ্ঞান, যে দৃষ্টি লাভ হয় না, সেই জ্ঞানের, সেই দৃষ্টির আলোকপাত দেখতে পাই আমরা তাঁর বহু গানে। তাই তা আমাদের অন্তরে আলো জ্বালতে পারে, পারে আমাদের মর্মে দাগ দিতে। আজও যখন গাই—

যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহিনা
যাক্ সে ধুলাতে,
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

প্রাণের ভিতর থেকে ধ্বনিত হতে থাকে শুধু এই প্রার্থনাই ঘুরে ফিরে। এ গান আগেও কত বার গেয়েছি, আজও গাই, আজ বরং আরও গভীরভাবে আরও গভীরতার আস্বাদ পাই। আজ বুঝতে পারি—

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে এনেছ তোমারি দুয়ারে।

গানের এই কলি গাইতে গেলে কেন চোখের জল বাধা মানে না। কোন অবস্থায় পৌঁছলে বলতে পারা যায়—

সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা
মাথায় তুলিয়া লব।

বলতে পারা যায়—

যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব সেই ত পুরস্কার।

দুঃখ আঘাত তিনি বহু পেয়েছেন, বহু সঙ্কটের দুর্জয় অন্ধকার রাত্রি তাঁকে পার হতে হয়েছে একা, কিন্তু তার মাঝে পড়ে তিনি দিশে হারান নি বা পথ হারান নি, বরং দুঃখ পাওয়ার সার্থকতা কোথায় তারই পথ আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন আশাবাদী, বিশ্বাসবাদী। তিনি জেনেছিলেন মৃত্যুর সঙ্গেই পথ ফুরিয়ে যায় না। মৃত্যুই শেষ কথা নয়। তাই গেয়ে গেছেন—

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।

গেয়েছেন— ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।

মৃত্যু এসেছে তাঁর দুয়ারে বার বার। নিয়ে গেছে তাঁর পত্নী পুত্র কন্যাদের অকালে। তাঁর শোক বা দুঃখ অপরে জানতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বেলাদি, কবির জ্যেষ্ঠাকন্যা, যেদিন মারা গেলেন সেদিনের কথা। আগেও শুনেছি এবং সম্প্রতি রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি বই খানাতে আবার পড়লাম। তাই সে সম্বন্ধে রথীবাবুর লেখা থেকেই একটু তুলে দিচ্ছি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা লিখছেন—

'শেষদিন পর্যন্ত রোজ দুপুরে দিদির কাছে যেতে লাগলেন। সেদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ—যখন ডিহি শ্রীরামপুর রোডের বাড়ি পৌঁছালেন তিনি বুঝতে পারলেন যা হবার তা হয়ে গেছে, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা 'বিচিত্রা'র বৈঠক ছিল। বাবা সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্পসল্প যেমন করেন সেদিনও তাই করলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে একজনও কেউ ঘৃণাক্ষরে জানতে পারল না যে মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে গেছে, মনের কী অবস্থা নিয়ে বাবা তাঁদের সঙ্গে সদালাপ করছেন।'

রথীবাবুর 'পিতৃস্মৃতি' থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা আর একটি চিঠি থেকে ক'টি লাইন তুলে দিচ্ছি, মীরাদিকে, কবির কনিষ্ঠাকন্যা, চিঠিটি লিখেছিলেন

মীরাদির ছেলেটি যখন চলে যায়। অনেক কথাই তিনি কন্যাকে লিখেছিলেন, আমি শুধু মাত্র একটুখানি তুলে দিচ্ছি, সেখানে তিনি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রর চলে যাবার বিষয়ে লিখছেন—

'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে! কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। —এসব থেকে খানিকটা বোঝা যায় যে কোন্ দৃষ্টি নিয়ে তিনি দুঃখ শোক গ্রহণ করেছেন ও দেখেছেন। এই লাইন কটি পড়লে মনে হয় তাঁর একটি গানের কথা। এই ভাবই বোধহয় তাতে ব্যক্ত হয়েছে। হয়ত বা গানটি এই সময়ের লেখা।—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যত দূরে আমি যাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

জীবন তরণীতে বসে বিশ্বাসের পাল তুলে দিয়ে কবি গানের পর গান গেয়ে গেছেন, আর সেই গানের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তারি আলো, তারই আনন্দ। সেই আলোই জ্বলে যখন গাই—

আমার মরণ বাঁচন ঢেউএর নাচন
ভাবনা কি বা তার
তোমারে করি নমস্কার—
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক
ফিরব না গো আর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতভাণ্ডার ত আর ছোটখাটো এতটুকু একটি সামগ্রী নয়। তা হল একটি বিরাট ব্যাপার। এই বিরাট ভাণ্ডারে রয়েছে কত অসংখ্য রকমের গান অসংখ্য ব্যঞ্জনা নিয়ে। ভাবতে গেলে মনে হয় এ যেন অন্তহীন পারাবারে এসে মিশেছে শত শত নদ নদীর স্রোতধারা। বাস্তবিক এ এক অভিনব সৃষ্টি কবির। তাঁর গানে আমরা পাই জীবনের অনন্তদিকের সন্ধান, পাই কত না-জানা দিকের পরিচয় এবং কত না-জানাকে জানার সুযোগ। তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোথাও নেই কোন সস্তার কারবার। আভিজাত্যের ঐশ্বর্যে ভরা তাঁর রচনা। জীবনের যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথের গানকে আমরা সাথীরূপে পাই আমাদের পাশে। আমাদের আনন্দে সে চলে আনন্দের ভরা,

ডালি নিয়ে, দুঃখে চলে সান্ত্বনার বার্তাবহ হয়ে। তাঁর গানে বার বার শুনি বাজে আহ্বানের সুর এগিয়ে চলার, শুনি সেই ডাক যে ডাকে রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায় অন্তরের অজানা ঘরের। প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় অপ্রকাশের। মানুষের সাধারণ জীবনের যত দিক আছে আর তার যতরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে সে সমস্ত নিয়েই গান আছে রবীন্দ্রনাথের, বাদ পড়েনি তার একটিও। প্রত্যেকটিকে দেখা যায় যথা সময়ে তার যথা স্থানে। তাই আমাদের মন সকল অবস্থায় আশ্রয় পায় তাঁর গানে। জীবনকে গানের মধ্যে দিয়ে এমন করে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা আর কোনও রচয়িতার গানে আমাদের হয়নি। আমাদের যুগে, আমাদের জীবনে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা! গান সম্বন্ধে তিনি আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছেন।

দিনের পর দিন কত ভাবেই কত অন্তরঙ্গতার অকৃত্রিম স্পর্শের মধ্যে দিয়ে দেখেছি ওই বিরাট ব্যক্তিস্বরূপের কত রূপই—পেয়েছি তাঁর কত পরিচয়ই—অমন মার্জিতরুচির একটি মূর্ত অভিব্যক্তি আর দেখলাম না, দেখিনি সৌন্দর্য-ময়তার অমন পরিপূর্ণ একখানি ছবি। ওঠা বসা থেকে আরম্ভ করে চলা বলা, আকার ইঙ্গিত আহার বিহার কোন কিছুর মধ্যেই কোন অশোভন, অসুন্দর বা অমার্জিত কিছু কখনও চোখে পড়ে নি। বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না যে সুন্দর করে দেখতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়েছেন। যেদিক দিয়ে তাঁকে দেখতে যাই—এমন কি অতি সাধারণ ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয়ও যা সচরাচর মানুষের চোখে পড়ার কথা নয়, সেই সব প্রত্যেকটিতেই এবং প্রত্যেক দিকেই তাঁর অসামান্যতা মনকে নাড়া দেয়, অবাক করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য বহুমুখী প্রতিভা যেমন আমাদের কাছে এক অপার বিস্ময়, তেমনি মানুষ হিসেবে তাঁর বহুমুখী অসাধারণত্বও আমাদের আর এক বিস্ময়। কত বারই মন বলে ওঠে—

তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ!

কবি পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী

কত কথা, কত হাসি
গেয়ে গান রাশি রাশি
ভরেছিনু আমাদের সেই দিনগুলি।
তারি স্মৃতি জড়ো করি'
সাজায়েছি ডালি ভরি'
এসেছি আজিকে দিতে তব করে তুলি।

প্রতিমাদির কথা লিখতে বসে মনে পড়ছে সে-সব দিনের কত কথা। কত আনন্দই করেছি আমরা। হাসি দিয়ে, গান দিয়ে ভরা আমাদের আনন্দের খেয়াতরী বেয়ে চলে গেছি ভরাপালে। করেছি এপার ওপার কত খুশির লহরী তুলে। সেই সব কত স্মৃতি, ছোট ছোট কত ঘটনার ছবি মনের সামনে আজ ভিড় করে আসছে। অতীত যেন এসে মিশে গেছে বর্তমানের মাঝে, কি লিখব জানি না। হয়ত যা মনে আসছে তাই, হয়ত ফেলে যাব কত কথাই, কিম্বা কিছু তার ভরে তুলব কয়েকটি পাতায়। যা বলতে চাই তা হয়ত বলা হবে না—এসব সম্ভাবনা নিয়েই শুরু করি তাঁর কথা।

প্রতিমাদিকে প্রথম দেখি আমার মামারবাড়িতে। তখন তাঁর সবে বিয়ে হয়েছে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কবির জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলাদি একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর নবপরিণীতা ভ্রাতৃজায়াটিকে আমার মাসিমাকে (অমলা দাশ) দেখাতে। সেটা কোন সাল আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে আমার বয়স তখন তেরো কি চোদ্দ, আর প্রতিমাদির হবে হয়ত ষোল-সতেরো। দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল—কি রং, যেমন বেলাদির, তেমন প্রতিমাদির, যেন ফেটে পড়ছে। মাসিমার ঘর আলো করে বসে আছেন কবিকন্যা ও কবিপুত্রবধূ—চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছিল না। প্রতিমাদির সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপরে তাঁকে দেখি তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, আমি প্রথম সেবার মাঘোৎসবে সেখানে গাইতে যাই। মাঘোৎসব উপলক্ষে আগত অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত প্রতিমাদিকে দেখতাম মাঝে মাঝে আমাদের সামনে আসতেন, আবার চলে যেতেন কোনো কাজে হয়ত। বিবিমাসিমা (ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী) আমাকে যেখানে নিয়ে যেতেন গান রিহার্সাল দেওয়াতে। মনে আছে জোড়াসাঁকোর বাড়ি যাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান, সে আকর্ষণ যে কী আকর্ষণ। কী ভালোই লাগত কবির সংস্পর্শে সুরের

খেয়ায় পাড়ি দিতে। ও-বাড়িতে গেলে আর একটা জিনিস আমার মনে
টানত, তা হচ্ছে প্রতিমাদিকে দেখার সাধ। ভিতরে ভিতরে তাঁর নিক
সংস্পর্শে আসার, কেন জানি না খুব ইচ্ছে জাগত, বেশ একটা আকর্ষণ অনুভ
করতাম। তাঁর কাছে যেতে পেলে খুব ভালো লাগত। তাঁর কাছে যাবা
এহেন আকাঙ্ক্ষা মিটতে আমার বেশি সময় লাগেনি। তিনি নিজেই একদি
আমাকে তাঁর তেতালার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখন সে ঘরে আর কে
ছিলেন না। সেই প্রথম প্রতিমাদির কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলাম
বড় ভালো লেগেছিল, ইচ্ছে পূর্ণ হবার আনন্দে মন ভরে গিয়েছিল, একটা গভী
তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। জোড়াসাঁকোর বাড়ি আমার যাওয়া আসা য
বেড়ে গেল প্রতিমাদিও আমার তত কাছের মানুষ, নিকট বন্ধু হয়ে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ, দিনুদা, এঁরা কলকাতায় এলেই আমার গান শেখার ডাক পড়ত
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, আমি দিনুদা সবাই এক টেবিলে বসেই খেতাম। প্রতিমা
আমাদের সঙ্গে বসতেন না—তিনি দাঁড়িয়ে খাবার দেওয়া থোওয়া এ-সব দেখা
শুনো করতেন। খাবার টেবিলে প্রায়ই দেখেছি কবি বেশ 'মুড'-এ থাকতেন
নানারকম রসিকতা নানারকমের সব কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যেত, যা-ই
বলতেন এমন করে বলতেন যে তা হত যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই উপভোগ্য
একদিন শুনি প্রতিমাদিকে হঠাৎ বলছেন, 'জানো, বউমা, তোমার শাশুড়িকে
আমি অনেক রান্না শিখিয়েছি'—প্রতিমাদি শ্বশুরের কথা উপভোগ করলেন বে
মিষ্টি মধুর হেসে। আমি কিন্তু খুব অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম কবির মুখের দিকে
কেননা তিনি যা বললেন তা আমাদের কাছে একেবারেই অভাবনীয়। মনে
পড়ে গেল শান্তিনিকেতনে যখন অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম তখন একদিন আমায়
বলেছিলেন—'বেলা যখন ছোট্ট শিশু আমি রাত্রে উঠে দুধ গরম করে তাকে
কত খাইয়েছি!' বলেই তখুনি আবার বলেছিলেন—'কি তোমার বুঝি বিশ্বাস
হচ্ছে না?' সত্যই, এ-সব দৃশ্য আমাদের কল্পনার বাইরে, স্বপ্নেরও অগোচর
তাই প্রথমটায় অমন আশ্চর্য হয়েছিলাম বটে, কিন্তু এই দুটি উক্তিতেই কবির
যেরূপ, তাঁর গৃহীজীবনের, সংসার ধর্মের যে স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছিল তা আমাদের
চোখে সম্পূর্ণ নতুন হলেও আশ্চর্য হবার সেই ঘোলাটে ভাবটি কেটে যাবার
পরই কবির সেরূপের মাঝে যা দেখতে পেলাম, যে জিনিসের আস্বাদ পেলাম
তা এতই মধুর, এতই মনোহর, এক কথায় তা সত্যই অপরূপ বলে মনে
হয়েছিল। কথার মাঝে মাঝে তিনি এমনি নানা চিত্র ফুটিয়ে তুলতেন যার
মধ্যে দেখতে পেতাম তাঁকে নতুন আলোয় নতুন করে।

প্রতিমাদি শান্ত স্বভাবের মানুষ হলেও আমাদের সঙ্গে নানা হৈ-হুল্লোড়ে থাকতেন। এ-সব ভালোবাসতেনও যেমন জানতেনও তেমন। নাচ গান জাতীয় জিনিস প্রতিমাদির খুবই প্রিয় বস্তু। এ-সবে তিনি ছিলেন আমাদের প্রধান উৎসাহদাত্রী এবং তাঁরই উদ্যোগে চলত আমাদের এই সব ব্যাপার। তখনকার দিনে এই ধরনের নাচগানের মেয়েলি ব্যাপার আমাদের মেয়ে হলেও তা হত গোপনে। একসঙ্গে সবাই মিলে মজা করা, ফুর্তি করা, একটু হৈ-চৈ করা এই ছিল উদ্দেশ্য, এতে আনন্দ প্রচুর পাওয়া যেত। তবে, বলাবাহুল্য, সে আনন্দের মধ্যে গভীর কিছু থাকত না। যাই হোক, ফুর্তি ইত্যাদি করার মাত্রা আমাদের অনেক সময়েই সীমা ছাড়িয়ে যেত। আমরা বেশ ভেসে যেতাম সেই সব হৈ-হুল্লোড়ের স্রোতে। প্রতিমাদি কিন্তু আমাদের মতন অমন করে ভেসে কখনো যেতেন না, দেখতাম ওরই মধ্যে ওঁর শান্তভাবের শুভ্রতাটি বেশ বজায় রাখতেন। প্রতিমাদির নেতৃত্বে আমাদের সে-সব দিনের আসরের নমুনাস্বরূপ দু-একটি মজার গল্পের অবতারণা করা যাক।

নাচ গান আমরা কেউ কিছু তেমন জানিনা, তবে একসঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করার জন্যে খুব বেশি কিছু যে দরকার করে তা মনে হয় না। এক আধটুকু ছিটে ফোঁটা থাকলেই যথেষ্ট। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতিমাদিদের আত্মীয়া ঠাকুরবাড়িতে কোনো মেয়ের বিয়েতে প্রতিমাদি ধরে বসলেন নাচ গানের একটা আসর করা যাক। ঠিক হল আমরা মহিলারা শুধু থাকব। পুরুষদের কাউকে আসতে দেওয়া হবে না। সৌম্যদের (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বসবাস ঘরে আসরটি হবে এবং মেয়েদের মধ্যে আমরাই থাকব আর বিশেষ কাউকে বলা হবে না শুধু 'কনে' থাকবেন। সন্ধ্যার পর আরম্ভ করা গেল নাচ গান, ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে। প্রতিমাদি আমায় সাজিয়ে দিলেন, সাজাতে গোজাতে তাঁর জুড়ি নেই। মনে আছে অতুলদার গান (অতুলপ্রসাদ) 'বঁধু ধরো ধরো মালা, পরো গলে' গানটি গেয়ে আমি নাচ শুরু করলাম। নাচ জমে এসেছে হঠাৎ দেখি যাঁরা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলেরই মুখ বেশ হাসি হাসি আর দৃষ্টি একটি দরজার দিকে। বুঝলাম ওদিকে কিছু একটা ঘটেছে, আমি নাচতে নাচতে সোজা সেই দরজার দিকে চলে গেলাম, গিয়ে দেখি দরজাটা একটু ফাঁক, দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই পিছন দিকে হাত দুটি পিছনে মুড়ে গুটিগুটি ঘরের দিকে চলেছেন (ঘরটি রবীন্দ্রনাথের বসবার ঘর। বারান্দাটি শেষ হয়েছে এসে এই ঘরেরই দরজায়)। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরলাম কবিকে,

বললাম, 'আপনি যে বড় লুকিয়ে আমার নাচ দেখছিলেন?' কবি তাড়াতাড়ি ঘরের আরাম কেদারায় আরাম করে বসে নিয়ে উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখে তাঁর সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে টপ্ করে বললেন—'দ্যাখো ঝুনু, তুমি যদি কথা দাও যে তুমি নাচবে তাহলে আমি আবার একটা বিয়ে করি!'—সকলের হাসির উচ্চরোলে ঘর প্রায় ফেটে যায় আর কি। কি হাসির ধুম! নাচের আসর তখনকার মত ভেঙে গেল। ঘরে ফিরে যেতেই দেখি সৌম্য সে-ঘরের ভিতরে। তার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে তাকে বকতে যাব, তার আগেই সে বললে, 'বাবা! লুকিয়ে তোমার নাচ দেখতে গিয়ে আমার কি অবস্থা হয়েছে দ্যাখো।' শুনে আর তাকে বকা হল না। দেখি সত্যসত্যিই তার বুকের নানা জায়গা মাটির ঘসটায় ছড়ে গেছে। সে নাকি সোফার নিচে গিয়ে ঢুকেছিল লম্বা উপুড় হয়ে শুয়ে বুক ঘসে ঘসে!

আর একবারের ঘটনা বলি, শান্তিনিকেতনে গিয়েছি কলকাতায় বিসর্জন নাটক হয়ে যাবার পরে কোনো সময়। প্রতিমাদিদের ঘরে তাঁর সঙ্গেই রয়েছি। তখন তাঁদের উত্তরায়ণের বাড়ি হচ্ছে। একতলা খানিকটা হয়ে গেছে। তারই একদিকের একটি অংশে রথীবাবু প্রতিমাদিরা থাকেন। আমি প্রতিমাদিদের ঘরে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় আরামে শুয়ে দিন কাটাচ্ছি। প্রতিমাদির সাধ হল একটা নাচগানের আসর করার। তখনো শান্তিনিকেতনে নাচ আরম্ভ হয়নি। আয়োজন হল ওই বাড়িরই বসবার ঘরে। এখানেও ছেলেদের বাদ দেওয়া হল। প্রতিমাদি, মীরাদি, কমলবৌঠান, নন্দলালবাবুর স্ত্রী সুধীরাদি, আর যতদূর মনে হয় ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীও ছিলেন আমাদের এই আসরে। আরো কে কে যেন ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। প্রতিমাদি নাচের ঘরটি সুন্দর করে সাজালেন। আমাকে সাজালেন। মনে আছে সুধীরাদি আকন্দফুল দিয়ে সব গহণা করে এনেছিলেন পাতার উপর আঁঠা দিয়ে ফুলগুলি বসিয়ে। ভারি চমৎকার ধরণের ফুলের গহণা। প্রতিমাদি গহণাগুলি আমাকে পরিয়ে সাজালেন। আসর আরম্ভ হবার আগে সবাই এসে গেছেন সুধীরাদি আসেন নি তখনো। তাঁর জন্যে তাড়াতাড়ি মোটর পাঠান হল। আমরা সব সেজে গুজে বসে আছি। দেখি মোটর ক্ষিতিমোহনবাবুকে নিয়ে এসে হাজির। কি কাণ্ড! আমরা সব এখন কোথায় লুকাব ভাবছি। ক্ষিতিমোহনবাবু বোধহয় ব্যাপারটি বুঝে নিজেই ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। বোঝা গেল যে ড্রাইভার ভুল করে সুধীরাদির বদলে ক্ষিতিমোহনবাবুকে নিয়ে এসেছে। যাক, আরম্ভ ত করা গেল। কমলবৌঠান আরম্ভ করলেন নাচ। আমিও শুরু করে

দিলাম—সে এক মজার ব্যাপার। যাই হোক খুব ফুর্তি করে আমরা নাচছিলাম যার যেমন ইচ্ছে যায়। শেষে প্রতিমাদিকে ধরা হল, তিনি নাচতে রাজী হলেন না তবে বসে বসে 'ভাও' বাতলালেন রবীন্দ্রনাথের—'ও কেন চুরি করে চায়'—গানটির সঙ্গে। খুব সুন্দর করেছিলেন, ঠিক বাঈজীরা যেমন করে 'ভাও' বাতলায় তেমনি। এই সব করে আসর যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ শুনি পাশের দিকের একটি ঘরের ছাদে এস্রাজ বাজছে—দিনুদার বাজনা মনে হল। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে সকলেই জানালার কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি ঘরের ছাদের এদিকটায়, যেখান থেকে আমাদের নাচের ঘরের সব বেশ দেখা যায়, সেইখানে বসে দিনুদা এস্রাজ বাজাচ্ছেন আর তাঁর পাশে বসে আছেন রথীবাবু, উভয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। দুজনেই আমাদের সবকিছু দেখেছেন এবং অপ্রস্তুত করবার জন্যে দিনুদা ও রথীবাবুর এই প্ল্যান। হাসাহাসি চেঁচামেচি কোনোটাই কম হল না।

শান্তিনিকেতনে একবার গিয়ে দেখি কবির 'ঋতুরঙ্গ' হবে তারই আয়োজন চলছে। এবার শুধু গীতিনাট্য নয়, ঋতুরঙ্গের মধ্যে নাচও থাকছে তাই নতুনত্বের রঙ লেগেছে সবার মনে, সকলেই আরো বেশি উৎসুক নতুন একটা-কিছু দেখবে বলে। বোধহয় এই ঋতুরঙ্গ থেকেই শান্তিনিকেতনে নাচ শুরু হয়। নৃত্যের শিক্ষক হিসাবে তখনো কারো আগমন হয়নি সেখানে। কাজেই টেকনিক্ ইত্যাদি না জেনেই নাচ আরম্ভ করা হচ্ছে। মেয়েরা যারা নাচবে তাদেরই ভার দেওয়া হয়েছে তাদের নিজের নিজের নাচ তৈরী করার। কি উৎসাহ সব মেয়েদের! প্রতিমাদি নিয়েছেন ভার। অনেক মেয়ের মধ্যে দেখা গেল নাচের সুন্দর ক্ষমতা। যারা সেরকম পারছে না তাদের প্রতিমাদি নানা-ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সে সময় প্রতিমাদির আশ্চর্য কতগুলি ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছিলাম। নিজে নাচতে না জেনেও এমন সব আইডিয়া, এমন সব সাজেশান তিনি দিচ্ছেন যে মনে হত নাচ তাঁর ভিতরের জিনিস, মনে হত প্রত্যেকটি নাচের ভঙ্গি (পোজ) তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছেন এবং সেইমত নির্দেশ দিচ্ছেন। দেখতে পেলাম প্রতিমাদির প্রতিভা মেয়েদের প্রেরণা যুগিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তাদের পিছনে সমানে লেগে থেকে জিনিসটিকে দাঁড় করিয়ে দিল। তাঁর সে কি নিষ্ঠার সঙ্গে অদম্য চেষ্টা! দেখতাম আর ভাবতাম এসব তাঁর কতকিছুই চাপা পড়ে থাকত আড়ালেই, কোনদিনই হয়ত খুলত না, যদি না তিনি অমন পরিবেশে এমন সংস্পর্শে এসে পড়তে পারতেন। যাইহোক আমিও প্রতিমাদিকে কিছু সাহায্য করেছিলাম, কোনো

কোনো মেয়েকে নাচ দেখিয়ে দিয়ে। কাকে যেন দেখিয়ে দিয়েছিলাম এই দুটি লাইন, বেশ মনে আছে—

জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে

বোধহচ্ছে ক্ষিতিমোহনবাবুর ছোটমেয়ে অমিতা এ গানটি গেয়ে নেচেছিলেন। যাইহোক কবির ঋতুরঙ্গ বেশ ভালোই হয়েছিল। আমার নিজের বিশ্বাস প্রতিমাদির ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আগ্রহেই ঋতুরঙ্গতে সেবার নাচ আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছিল।

ক্রমে প্রতিমাদির শিল্পীরূপ সকলের চোখে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি কি সাজানো-গোজানোয় কি নিজের পোশাক পরিচ্ছদে, তার রুচির একটা বৈশিষ্ট্য, পরে তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার পরিচয় আমরা সকলেই জানতে পারি তাঁর ছবি আঁকা থেকে, বাড়ির দেয়ালের গায়ে নানা জায়গায় অদ্ভুত সুন্দর সব ফ্রেস্কো করা থেকে এবং আরো পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগীত নাট্যাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে। সে-সব অনুষ্ঠানের রূপসজ্জা প্রভৃতিতে শুধু যে প্রতিমাদেবী একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন তাই নয়, সে-সবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত। প্রতিমাদেবীর রুচির, পছন্দের বা তাঁর অভিমতাদির কবি শুধুই যে মূল্য দিতেন তাই নয়, তিনি সকল বিষয়ে তাঁর পুত্রবধূর উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন এ আমরা সবাই জানি। দেখেছি, প্রতিমাদেবীকে না হলে তাঁর চলত না বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। এই সব অভিনয়ে রূপসজ্জা ইত্যাদির মূলে থাকত প্রতিমাদেবীর অনেকখানি পরিকল্পনা, তাঁর শিল্পীমনের স্পষ্ট ছাপ। এ সবের মধ্যে দিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করতেন তা রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে বিরাজ করত। যাঁরা কবির নাটক দেখেছেন, তাঁরা সবাই জানেন অভিনয়ের সঙ্গে তার রূপসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির বিশেষত্বের কথা। সেই কাজে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিমাদেবীও ছিলেন একজন বিশিষ্ট রূপকার।

একথা বললে বোধহয় খুব ভুল বলা হবে না যে, সবদিক দিয়েই প্রতিমা দেবী হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মনের মতন, তাঁর যোগ্য পুত্রবধূ। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে কতভাবে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে গেছেন। তবে একথাও ঠিক যে শিক্ষা গ্রহণ করবারও ক্ষমতা থাকা চাই। প্রতিমা দেবীর সে ক্ষমতা ছিল বলেই আজ যা হয়েছেন তা হতে পেরেছেন। বিশ্বের নানা

প্রান্ত থেকে কত মনীষী, জ্ঞানীগুণী কত বিশ্ববরেণ্য মহারথীদের আগমণ হয়েছে কবির অতিথিরূপে, বিশ্বভারতীর বিরাট অঙ্গনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা বিশ্বকবির সঙ্গে। কবিগুরুর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী নিজে তাঁদের সকলকে আপ্যায়িত করেছেন যোগ্য সমাদরে। যদিও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ থাকতেন বটে, কিন্তু সে প্রায় না-থাকারই মতো, কেননা অন্যান্য এত রকম কাজে তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হত যে প্রতিমা দেবীর হাতে এসব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রথীন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে বহু কাজেই প্রতিমা দেবীর উপর নির্ভর করতেন এবং তিনি সে সবই সামলেছেন যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে। এদেশে ওদেশে বহুলোকের সংস্পর্শে প্রতিমাদিকে আসতে হয়েছে, মিশতে হয়েছে। সর্বত্রই তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সকলের সঙ্গেই মিশতে পেরেছেন বেশ সহজভাবে, ফলে অনেকের সঙ্গেই গড়ে উঠেছে সহজ সুন্দর একটা সম্বন্ধ। প্রতিমাদির বন্ধু সংখ্যা কম নয়। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা বন্ধুবান্ধব। আমি একজন ফরাসী মহিলাকে জানি সুজান কারপেলস, তিনি ও তাঁর ভগ্নি শিল্পী আঁদ্রে কারপেলস ছিলেন প্রতিমাদির অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই মহিলাটি প্রতিমাদিকে যে কী ভালোই বাসতেন। শুধু ভালোবাসতেন বললে কিছুই বলা হয় না। প্রতিমাদি সম্বন্ধে একেবারে মুগ্ধ, মোহিত। কী অ্যাড্‌মিরেশন নিয়ে, কী অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি প্রতিমাদির কত গল্প যে আমার কাছে করতেন। আমি শুনতাম আর ভাবতাম, এই যে এসব বিদেশী নারী প্রতিমাদিকে এইভাবে গ্রহণ করেছেন, এতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, প্রতিমাদির প্রতি তাঁদের এই যে অকৃত্রিম ভালোবাসা সে কি শুধু তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ বলেই? 'অকৃত্রিম' ভালোবাসা বলছি এই কারণে যে, মৃত্যুর অল্পক্ষণ আগেও মহিলাটি প্রতিমাদির নাম করেছেন এবং তাঁর ছাত্রী আমাদের আশ্রমবাসী একটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছেন 'আমার খবর প্রতিমাকে কে পৌঁছে দেবে?' যখন শুনলেন 'সাহানা দেবে' তখন নিশ্চিন্ত হলেন। এই ফরাসী মহিলাটির নাম বদলে ভারতীয় নাম হয় 'ভারতী'। আমাদের আশ্রমে এসে কিছুকাল তিনি বসবাস করেছিলেন, সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। এইসব সূত্রে আমি এইটে বলতে চাই যে, প্রতিমাদেবী পড়েন অসামান্য নারীদের পর্যায়ে। তিনি অসাধারণ বলেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় নিজেকে অমনভাবে তৈরি করতে পেরেছেন। পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী অগুনতি গুণমুগ্ধ ভক্তদের অমন করে অনায়াসে অভ্যর্থনা করতে। পেরেছেন শ্বশুরকে স্বামীকে বিশ্বভারতীর নানা কাজে

সাহায্য করতে। যার জন্যে পেয়েছেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, যার জন্যে প্রতিমাদির উপর তাঁরা ছিলেন অনেকখানি নির্ভরশীল।

কবে জমে উঠল প্রতিমাদির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা, কবে তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলেন সে সব হিসেব আর করা হয়নি। শুধু জানি তাঁর সঙ্গে আমার সে সম্বন্ধ আজও তেমনি আছে। দূরত্বের ব্যবধান তাকে ছিন্ন করতে পারেনি। পারেনি বাধার সৃষ্টি করতে। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই আজ চল্লিশ বছরের উপর। তবু আমাদের সে সম্বন্ধের রঙ বদলায় নি। আছে তেমনি অম্লান। আজও তিনি আমার আবেদনে আব্দারে তেমনি স্নেহের সঙ্গে সাড়া দেন। তাঁর কাছে জীবনে আমি যা পেয়েছি তার হিসেব হয় না, হিসেব করা যায় না।

আজ তাঁকে এই 'অর্ঘ্যদান' অনুষ্ঠানের আনন্দের দিনে আমি আমার কৃতাঞ্জলির অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হই!

পণ্ডিচেরীর পথে

কোনোকিছুতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলছে না। ঠিক রসটি যেন পাওয়া যাচ্ছে না, মনের ভারও আর কিছুতেই যেন যায় না—এ অবস্থা যে জীবনে ঠিক কবে থেকে শুরু হল তা বলা কঠিন। বাল্যকাল কেটেছে আনন্দের অজস্রতায়, সরল মন তখন বুঝত না, জানত না অনেক কিছুই। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে পা বাড়ালাম বুঝবার জানবার পথে। মন জানতে চায়, অন্তর পেতে চায়, কিন্তু কী জানতে চায়, কী পেতে চায় তা তখনো তেমন স্পষ্ট নয়। এ পথেও পাওয়া গেল প্রচুর আনন্দের খোরাক, পাওয়া গেল কত কিছুর পরিচয়, সন্ধান। তারপরে পাড়ি জমানো গেল নবীনের অভিযানে। শুনলাম বসে যৌবনের ভরামনের গানের পর গান। লাভ করা গেল অজস্র অভিজ্ঞতারাশি নানা ভাবের। কিন্তু আরম্ভ হল অতৃপ্তি—জেগে উঠল একটা শূণ্যতাবোধ গভীর অন্তরের ক্রন্দন নিয়ে। কিসের এই অতৃপ্তি, এই ক্রন্দন? কী চায় এ জীবন? মনে হত যা চাইছি তা যেন ঠিক পাচ্ছি না। যা পাচ্ছি তা থাকছে না, মন তাতে ভরছে না। এমন কিছু কি পাবার নেই যা যাবার নয়, যা থাকে যা চিরকালের চিরস্থায়ী? সেইরকম কিছু রসাস্বাদনের জন্য তৃষ্ণা জাগতে শুরু করল। সেইরকম কিছু আছে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে মন নাড়াচাড়া করে, ঘুরে বেড়ায় তার পিছনে।

এল ১৯২৬ সাল। জীবনের চাকা ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল ঝড় প্রবল বেগে। তার প্রচণ্ড দাপটে ভেঙে দিয়ে গেল আমার জীবনের অনেক কিছু। নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল কত কি! কিন্তু পেলাম এমন কিছু যার উপর দাঁড়িয়ে আরম্ভ করা গেল জীবনের আরেক অধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ হল আমার গৃহত্যাগ।

আমি ছাড়লাম গৃহ। দিলাম পাড়ি অনিশ্চিতের অন্ধকার বুকে আপন ভবিষ্যৎকে সঁপে দিয়ে। সামাজিক সংস্কারে পড়ল বিষম নাড়া। উঠল আলোড়ন, তোলপাড় যেন সব। অযাচিত উপদেশবাণে জর্জরিত জীবন মনে হলেও পরাজয় মানেনি অন্তর, চলেছি যেদিকে সেদিকে যাবার জন্য সব অগ্রাহ্য করে। আমায় ঠেকায় তখন কে? ধরে রাখেই বা কে?—

'এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না কো আর'—

শরীর ভাঙল তবু যাত্রাভঙ্গ হল না। চললাম ভাঙা শরীর নিয়েই।—

'আমার কে বা আপন কে বা অপর,
কোথায় বাহির কোথায় বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমি আছ আমি আছি এই জেনেছি সার।
তোমারে করি নমস্কার।'

একজন নিকট আত্মীয় সেই সময় আমার চেহারা ও শরীরের অবস্থা দেখে বলেছিলেন—'যা চেহারা হয়েছে দেখ্‌ছি, এরপরে টি-বি যদি হয় তবে আমার বাড়িতে তোমার স্থান মিলবে না তা বলে দিচ্ছি।' আশ্চর্য, আমারো সঙ্গে সঙ্গে জবাব বেরিয়ে এল—'বাঁচবার যদি আমার দরকার থাকেই তবে এত বড় এই দুনিয়ায় আশ্রয় আমার মিলবেই। আপনার কাছে আমি কখনোই আসব না।' কোন্‌ ভরসায় যে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ দিয়ে অত জোরের সঙ্গে অমন নিশ্চিন্তস্বরে এই কথাগুলি তখন বের হয়েছিল পরে বুঝতে পারি—বুঝতে পারি শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের চরণতলে যার ভাগ্য বাঁধা, তাঁদের করুণা যাকে এমন করে চিরকালের আশ্রয় দিয়ে গ্রহণ করবে সে কেনই বা যাবে আর কারো কাছে আশ্রয়ের জন্যে। বুঝতে পারি সেই কথাগুলি ছিল আমার অন্তরাত্মার বাণী, রূপ নিয়েছিল রসনায়।

গৃহত্যাগের পরে আমার প্রথম আশ্রয়দাতা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে শান্তিনিকেতনে। ভগ্ন স্বাস্থ্য, রিক্ত জীবন আমার। কী অপরিসীম স্নেহ-মমতায় সিক্ত করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তিনি সবাই যখন দিয়েছিল দূরে ঠেলে। সবাই যখন ফিরিয়েছিল মুখ তিনি তখন বাড়িয়েছিলেন হাত—দিয়েছিলেন আমার বোঝা লাঘব করে। শুধু তিনি নন, তাঁর বাড়ির মেয়েরা—পুত্রবধূ প্রতিমাদি, কন্যা মীরাদি, দিনেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কমলবৌঠান। এঁদের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়ে, সেবা যত্ন দিয়ে, অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসার মধুর স্পর্শ দিয়ে আমার ব্যথিত জীবনের অনেকখানি ব্যথা নিয়েছিলেন তুলে। এঁদের কারো মধ্যে দেখিনি আমার সংক্রামক ব্যাধিকে ভয় করতে, বা তার জন্যে আচরণে কোনরকম আড়ষ্টতা। কবি তাঁর স্বভাবসুলভ সহানুভূতির সুরে দুঃখের সঙ্গে কতবার বলেছেন আমায়—'ঝুনু, আমি অবাক হয়ে যাই দেখে যে তোমার এত বড় বড় সব আত্মীয় থাকতে কেউ একবার এল না তোমায় দেখতে বা তোমার পাশে দাঁড়াতে!'

১৯২৭ সালে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আমি যাই কবির কাছে শান্তিনিকেতনে। সেখানে প্রায় আড়াই মাস থেকে পথ ধরি ভাওয়ালী সানা-

টোরিয়মের। অসুস্থ শরীরে একা যাচ্ছি দেখে প্রতিমাদেবী তাঁর জানা একটি চাকর ও চাকরানীকে আমার সঙ্গে দিলেন। এরা স্বামী-স্ত্রী ও বাঙালী এবং বয়স অল্পই। এদের দুটিকে সঙ্গে পেয়ে আমার কত যে সুবিধা হল তা বলাই বাহুল্য। 'ভাওয়ালী' অবস্থিত হিমালয় কুমায়ন পর্বত অঞ্চলের নৈনীতাল শৈলবাসের খুব কাছেই। ডাণ্ডিপথ ধরে গেলে ব্যবধান মাত্র সাত মাইল। এই পর্বতের উচ্চতা বোধকরি সাত হাজার ফিট, কি এই রকমই কিছু হবে। শান্তিনিকেতন থেকে আমি কবির সঙ্গে রওনা হই। তিনি নেমে যান কাশীতে, আমি চলে যাই লক্ষ্ণৌয়ে আমার পিসতুতো ভাই অতুলদার (অতুলপ্রসাদ সেন) বাড়িতে। ওখান থেকে রাত্রের ট্রেন ধরে সকালে কাঠগুদাম স্টেশনে নেমে একটি ভাড়া মোটরে চেপে রওনা হলাম ভাওয়ালী অভিমুখে, প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ। আরোগ্য আবাসে যখন পৌছলাম তখন বেলা আড়াইটে বেজে গেছে।

মোটরে রাস্তার দৃশ্য চোখে পড়বার মতন এমন কিছু মনোরম লাগেনি। বার বার মনে পড়ছিল, দার্জিলিং পাহাড়ে যাবার পথ কী অনির্বচনীয় শোভা-মণ্ডিত। কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব দৃশ্যাবলী, যা দেখে কেবলই চমক লাগায়, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়—ভোলা যায় না। তারপর যখন একেকটি ঝরনার সামনে দিয়ে পাহাড়ে উঠবার ছোট রেলগাড়িটি আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে যায় তখন সে যে কী রোমাঞ্চকর ব্যাপার হয়! মনে হয়, ফেনিলোচ্ছল জলের স্রোতধারা উল্লাসে গর্জন করতে করতে তীব্রবেগে ছুটে নেমে আসছে। সে জলধারার কী শব্দ! অনেক সময় চলন্ত রেলের যাত্রীদের গায়ে এসে পড়ে তার জলের ছিটে। বহুদূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গা চিরে সাদা ধব্‌ধবে একটি কম্পিত রেখা উপর থেকে নিচের দিকে নেমে চলে যাচ্ছে। ট্রেন চলতে থাকে—কানে ভেসে আসে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। শিহরণ জাগে—মনে হয় এইবার বুঝি ঝরনা আসবে। এই রকম কত দৃশ্য দেখে কতবারই মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব কবির পদাবলী গানের লাইন—'একই অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে।'

ভাওয়ালীর পথে কিন্তু কোনো জলধারাই দেখা গেল না, সবুজের স্বল্পতাও চোখে পড়ে। যাহোক আরোগ্য আবাসের গাইড আমাকে ৫৮ নম্বর কুঠিতে পৌছে দিল। বাড়ি পছন্দ হল। বাড়িখানা নতুন, সবে শেষ হয়েছে। আমিই প্রথম রুগী প্রবেশ করলাম এই নবনির্মিত কুঠিতে। পৌছেই যে দৃশ্য সর্বাগ্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হচ্ছে সামনের বৃক্ষবিরল মেটে রংএর পাহাড়ের দৃশ্য। মনে হচ্ছিল যেন 'পাহাড় বসে আছে মহামুনী' (রবীন্দ্রনাথ)। গাছপালা নেই বললেই হয়। যাও-বা দু'একটি দেখা যায় তাও দেখলে মনে হয়

যেন প্রহরীর মত দূরে দূরে একেকটি দাঁড়িয়ে আছে একা। অসীম শূণ্যতাকে বক্ষে নিয়ে পাহাড় যেন কোন ধ্যানে মগ্ন।

'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর'-এর এই গৈরিক রূপ চোখকে মুগ্ধ করে না কিন্তু মনকে নিঃসন্দেহে উদাস করে দেয়, টেনে নিয়ে যায়, এমন এক নিরালা কোণে যেখানে ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছে করে, ভাবতে ইচ্ছে করে আর ইচ্ছে করে তাঁরি ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতে। এই পাহাড়কে দেখলে একাকীত্বের যে রূপ ভেসে ওঠে সে রূপ আমার অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে ধ্যান-স্পৃহা। সানাটোরিয়ম যেদিকটায় সেদিকে অবশ্য প্রচুর পাইনগাছ দেখা যায়, অন্যান্য গাছপালাও যথেষ্ট আছে তবে বাংলাদেশের (পশ্চিমবঙ্গের) শৈলাবাস দার্জিলিং, আসাম অঞ্চলের শিলং, দাক্ষিণাত্যের উটাকামণ্ড প্রভৃতির মত এদিকের পাহাড় অঞ্চলে অমন বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহ বা সৌন্দর্যসম্পদ নেই। এদিক থেকে হিমালয়ের কোনো তুষারশৃঙ্গও দৃষ্টি গোচর হয় না।

ভাওয়ালী জায়গা হিসেবে বিশেষ কিছু নয়। অতি ছোট একটা জায়গা। সানাটোরিয়ম ছাড়া এর অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। সানাটোরিয়মটি যথার্থই ভালো এবং বেশ রীতিমত বড়। রুগী সংখ্যাও যথেষ্ট, সারা বছরই সানাটোরিয়ম বেশ ভর্তি থাকে।

এইবার বলি এই আরোগ্য আবাসে আমার প্রবেশের অভিজ্ঞতার কথা। আমি এখানে এসে পৌছাবার আগেই অনেক রুগী দেখলাম, এসে গেছেন। সানাটোরিয়ম খুলে যায় মার্চ মাসের গোড়াতেই। আমি পৌছাই মার্চের শেষের দিকে। ডিসেম্বর মাসে সানাটোরিয়ম বন্ধ হয়ে যায়, রুগী বা ডাক্তার কেউই আর থাকতে পারে না তখন। সকলকেই নেমে আসতে হয়।

আটান্ন নম্বরের যে নবনির্মিত 'কটেজ'-এ গিয়ে আমি উঠলাম সেটি 'এ' ক্লাস কটেজ। গোটা বাড়িটাই আমি নিয়েছিলাম। মনে আছে, গিয়ে চারিদিকে তাকাতেই—উপরে, নিচে, আশেপাশে, কিছু দূরেও, দেখা গেল রুগীরা যে যার কোয়ার্টারের বারান্দায় একেকটি নেয়ারের খাটে শুয়ে আছে। কারো কারো মুখে থার্মমিটার। সানাটোরিয়মে ভর্তি হলে প্রথমে কিছুকাল সব রুগীকেই শুইয়ে রাখা হয়। তাই দেখলাম সকলেই শয্যাশায়ী। এদের চোখেমুখে কিসের ছায়া যেন পড়েছে, অবসন্ন, ভরসাহীন নিষ্প্রভ দৃষ্টি, বিমর্ষ ভাব। জীবনের কাঁটা মরণবাঁচনের কোনদিকে কখন ঘোরে! কোন দিককার ঘণ্টা কখন বাজে!—এই উদ্বেগ নিয়ে এখানকার জীবন আরম্ভ। বাঁচবার ইচ্ছে থাকলেও মরণের আশঙ্কা এদের অর্ধমৃত করে রেখেছে। এই পরিবেশে ঢুকে আমার যেন কেমন দম্ বন্ধ

হয়ে আসতে লাগল। এতই অস্বস্তিকর মনে হল এখানকার আবহাওয়া। মনে হল, এ কোথায় এলাম! এখানে থাকব কেমন করে! আশ্চর্য এই যে দু'এক-দিন থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হতে লাগল এ জীবনের দিন গোনা-গুন্তির মধ্যে এসে ঠেকেছে। এই বিশ্ব থেকে বিদায় নেবার সময় যেন এগিয়ে আসছে। ফুরিয়ে আসছে এখানে থাকার মেয়াদ— সর্বক্ষণ এই রকম একটা ভাব। চিরবিদায়ের চোখ দিয়ে তখন সবকিছু দেখতে আরম্ভ করেছি। মায়া লাগছে পৃথিবীর মায়া কাটাতে। বাঁচবার কথা কিন্তু আর মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে —আর ক'দিনই বা! বাঁচতে এসে মরণকেই বরণ করে নিলাম যেন। কিন্তু রক্ষে, এই অবস্থা ছিল মাত্র ক'দিনই। হিমালয়ের ওই সমাহিত ধ্যান-মৌনমূর্তি আমায় ডাক দিল, আমি ভুললাম সেই ডাকে। পেলাম একটা নতুন উৎসাহের সাড়া। জীবনের অর্থ আমার কাছে বদলে গেল। আমি নিজের মধ্যে প্রবেশের পথ পেলাম। আর পেলাম প্রেরণা সেই পথ অনুসরণ করে চলার। আরম্ভ করা গেল নিয়মিত ধ্যান ধারণা। ধীরে ধীরে মন গুটিয়ে আসতে লাগল। সপ্তাহে একদিন করে মৌনব্রত অবলম্বন করে ডুবে থাকতাম তারই মধ্যে। সারাদিন উপবাসাদি পালন করে সন্ধ্যার পরে তা ভঙ্গ করতাম। বেশ লাগত। এই সময় আমি প্রথম উপলব্ধি করি অন্তর্মুখীনতা কাকে বলে, পরিচয় পাই আন্তর জীবনের, স্পর্শ পেতে আরম্ভ করি দৈবশক্তির আর বিশ্বাস পাই তার অস্তিত্বের।

পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ছড়ানো বাড়িগুলি বা কোয়ার্টারগুলি রুগীদের বাসস্থান। 'এ' ক্লাস, 'বি' ক্লাস, 'সি' ক্লাস ও 'ডি' ক্লাস—এইভাবে রুগীদের থাকবার বন্দোবস্ত আছে যে যেমন খরচ করে থাকতে পারে সেই মত। 'এ' ক্লাস হল একটি পুরো বাড়ি একটি রুগী থাকার জন্যে। এই 'এ' ক্লাস বাড়ি বা কটেজগুলি এমনভাবে তৈরী যে, ইচ্ছে করলে একে 'বি' ক্লাসে পরিণত করা যায়, দরকার হলে দুটি রুগীকে রেখে। বাড়িগুলি সব পাকা, পাথরের তৈরী। বেশ সুবন্দোবস্ত আছে, অসুবিধা হয় না একটুও। 'এ' ক্লাস বাড়িতে বেশ প্রমাণ মাপের দুটি ঘর ও সামনে সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা। পিছন দিকের এমনি একটি বারান্দার দুদিকে মুখ করে দুটি রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি আছে। বাড়ির সামনের দিকে (কোনো কোনো বাড়ির পিছন দিকেও) একটুখানি করে ফাঁকা জমি আছে। রুগী যখন একটু উঠে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি পায় তখন প্রথম সে বাড়ির এই জমিতেই বেড়িয়ে বেড়াতে শুরু করে। এই বাড়িগুলিতেই যখন দুজন করে রুগী রাখা হয় তখন তাকে বলা হয় 'বি' ক্লাস।

বাড়িভাড়া একেক জনের পড়ে 'এ' ক্লাসের অর্ধেক। আর 'সি' ক্লাস হল সামনে লম্বা টানা বারান্দাযুক্ত ছয়টি ঘরের একটি বাড়ি—ছয় জন রুগী থাকার মত। ভাড়া 'বি' ক্লাসের অর্ধেক। এই বাড়ির পিছন দিকে প্রতিঘরের সঙ্গে রয়েছে একটি করে রান্নাঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। সামনের টানা-বারান্দাটি কেবল সকলের ব্যবহারের জন্যে। ঘর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা প্রত্যেকের আলাদা। তারপর 'ডি' ক্লাস, সেটাতে একটি ঘরে দু'তিন জন করে রুগী থাকার ব্যবস্থা আছে। বাড়িভাড়া লাগে না। তবে সকলকেই নিজের নিজের খাওয়া দাওয়ার আলাদা বন্দোবস্ত করতে হয়। 'ডি' ক্লাসের বাড়িটি বেশ বড়, দোতলা। আরো দোতলা বাড়ি আছে দেখেছি, তবে তা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সানাটোরিয়মের ইউরোপীয়ান রুগীদের ব্যবস্থাদি সব অন্য রকম। তারা থাকে একটি বড়বাড়ির একেকটি ঘরে। বাড়ির চারিদিকের বারান্দা সকলেই ব্যবহার করে থাকে। তাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হয় না। সকলের রান্নার জন্যে একটি রান্নাঘর আছে, সেইখানেই সকলের রান্না হয় ও রুগীদের ঘরে ঘরে খাবার দিয়ে আসা হয়। এই সব তদারকের কাজে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে বহাল থাকতে দেখেছি। এই মহিলাটি আমাকে বড় স্নেহ করতেন, মাঝে মাঝে ওদের রান্নাঘরের বিলিতী খাবার এনে আমাকে খাইয়ে যেতেন।

পাইনগাছের ফাঁকে ফাঁকে আরোগ্যআবাসের এই ছোট ছোট কটেজগুলি দূর থেকে দেখতে লাগে ছবির মতন। রুগীদের বেশির ভাগ সময় বারান্দায় খোলা হাওয়ায় থাকতে হয়। রাত্রেও ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করার হুকুম নেই। পাহারা থাকে এইসব দেখার জন্যে। সামনের পাহাড়ে ভাল্লুক দেখা যায় প্রায়ই, তাই রাত্রে জানালা-দরজা খোলা রাখতে বেশ ভয় ভয় করত। কিন্তু উপায় ছিল না। কত সময় টিন বাজিয়ে হল্লার শব্দ রাতে কানে আসত। শুনেছি ভাল্লুক তাড়াবার ওইরকমই পন্থা ওদের।

সানাটোরিয়ম জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হলে দেখা গেল রুগীদের মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন। দ্বিতীয় পর্ব বলছি এই কারণে যে প্রথম এসে দেখেছিলাম রুগীদের সব একধারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শয্যাশায়ী অবস্থা—এই অবস্থাকেই আমি ধরে নিয়েছি সানাটোরিয়ম জীবনের প্রথম পর্ব বা প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয়পর্বে দেখা গেল, ডাক্তাররা রুগীদের উঠে হেঁটে, বেড়িয়ে বেড়াবার অনুমতি দিচ্ছেন। রুগীরাও তাদের স্বাভাবিক জীবনের খানিকটা আস্বাদ আবার ফিরে পেয়ে আনন্দিত। তাদের সেই মৃত্যুভয়জড়িত উদ্বেগের

অবস্থা কেটে গেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও মুক্ত হয়েছে বিষাদের সেই বিষাক্ত স্পর্শ থেকে। রুগীদের মাঝে আলাপ-পরিচয়াদি আরম্ভ হয়েছে। ঘরে ঘরে বন্ধুত্ব জমে উঠতে দেরী লাগছে না। সানাটোরিয়ম-জীবন হাসি-খুশিতে, প্রফুল্লতায় ভরে উঠেছে। রুগীরা নিজেদের ব্যাধি নিয়ে কেউ আর তখন ভাবছে না—এই চিন্তাটা কবে যেন আপনা হতেই খসে পড়েছে তা তারা বুঝি বা টেরও পায়নি। ছেড়ে আসা ঘর-সংসারের মতনই ঘর সংসার পেতে তারা বেশ জমিয়ে বসেছে। ওজন বাড়ছে শুনলে আনন্দ, কমছে জানতে পারলে মন ভার—এই সবেতে মনের রং এক-আধটুকু বদলালেও মোটামুটি বেশ খুশি মনে সকলে জীবন যাপন করছে তা বোঝা যাচ্ছে।

ভাওয়ালীতে থাকাকালীন কতগুলি বড় অপ্রীতিকর ঘটনায় সম্মুখীন হয়ে দারুণ মুস্কিলে পড়তে হয় আমাকে। মহিলা রুগী যাঁরা আরোগ্যআবাসে এসেছেন তাঁদের অভিভাবক হিসেবে সঙ্গে কেউ না কেউ আছেন, আমি রয়েছি একা। আমার মত এমনভাবে একেবারে একা থাকতে আর কোনো মহিলা রুগীকেই ওখানে দেখা যায়নি। তাছাড়া সব রুগীদেরই কখনো কখনো কোনো আত্মীয়-স্বজন কিম্বা বন্ধু-বান্ধব কেউ এসে দেখে যেতেন। আমার ভাগ্যে সেরকম কোনো সুযোগ ঘটেনি। কেউই আমায় দেখতে আসেননি। এটা অবশ্য চোখে পড়বার মতই বিস্ময়কর ব্যাপার। কেন না অনেকেই এখানে জেনে গেছেন যে আমি দেশবন্ধুর ভাগিনেয়ী এবং লক্ষ্ণৌএর সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ. পি. সেনের ভগ্নী। এইসব নানান কারণে আমার সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগে। আলোচনাও চলতে থাকে এই নিয়ে। পরে দেখা গেল, আমার এই একা থাকার সুযোগ নেবার চেষ্টা করছেন কোনো মহোদয় ব্যক্তি, নানা উপায়ে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করে আমায় উত্ত্যক্ত করে তুলতে লাগলেন। বড় ডাক্তারকে রিপোর্ট করলাম। কিন্তু দেখলাম ফল কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে আমি সানাটোরিয়ম ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হলাম, শহরের মধ্যে একটি বিরাট বাড়ির অর্ধেকাংশ ভাড়া নিয়ে। সে বাড়ির পাশেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাড়িওয়ালা তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করেন এবং দুধ-মাখন ইত্যাদির কারবার করেন। কাজেই সেসব পাবার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত হল আবার আরেক বিপদ। এই বাড়ির কাছেই বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন এক অবিবাহিত মুসলমান ভদ্রলোক, শোনা গেল তাঁরও এই একই অসুখ। হঠাৎ শুনি আমারই বাড়ির বাকি অর্ধাংশ ভাড়া নেবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার

চাকরের কাছে খবর নিয়ে জেনেছেন আমি একা থাকি, সঙ্গী কেউ নেই। ভদ্রলোকের আমার বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া নেবার সম্ভাবনার কথা শোনা মাত্র আমি বাড়িওয়ালাকে বলে পুরো বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে নিলাম। তিনি বেশ একটু অবাক হলেন একা মানুষ আমি এত বড় বাড়ি নিয়ে অনর্থক অর্থব্যয় করছি কেন। প্রকাণ্ড বাড়ি; সব ঘরই খালি পড়ে রইল। ভাড়া দিতে হল দ্বিগুণ, কিন্তু উপায় কি!

তারপরে পড়া গেল মুসকিলে এক সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিয়ে। সানাটোরিয়মে থাকতে এঁকে দেখেছি রুগী মহলে প্রায়ই যাতায়াত করতে। সেখানে সকলেই এঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। ইনি গেলেই ঘরের ভিতর এঁকে নিয়ে এঁর চরণ পূজো করত। এঁর কাছে তাঁরা নানা ধর্ম কথা শুনতেন, ইনি ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতেন, ব্যাখ্যা করে তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। আমার তখন এঁর উপর বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এবাড়িতে আসার পর প্রথম যখন ইনি আসতে আরম্ভ করেন তখনো ভালোই লাগত এর সংসর্গ, কথাবার্তা। বেশ শিক্ষিত মনে হত। এঁর কথাবার্তা শুনলে বোঝা যেত পড়াশুনা এঁর যথেষ্ট আছে। আমাদের এই বাড়ির পিছন দিকে একটু নেমে গিয়ে, নিচে ছিল এঁর ছোট্ট কুটির একটি। আমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়েও এনেছিলেন সে কুটির। কিন্তু পরে ওঁর যাতায়াতের মাত্রা এতই বেড়ে গেল যে তা উপদ্রবের মতই ঠেকত। একে ভাওয়ালীর এদিকের এই অঞ্চলটা খুব নির্জন, জনশূন্য এই বিরাট পুরীতে আমার মত এরকম রুগীর একা থাকাটাই সমস্যা, তার উপর সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সময়-অসময় নেই, সন্ন্যাসী ঠাকুরের অকারণ এত ঘন ঘন আসা-যাওয়ায় —আমার অস্বস্তি ক্রমে বেড়েই চলল। এমন হল যে শেষ পর্যন্ত রাত্রি হতে না হতেই চারিদিকের জানলা-কপাট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে চুপটি করে বসে থাকতাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাওয়া গেল এই অস্বস্তিকর ব্যাপারের হাত থেকে। ওঁর আসা বন্ধ হল।

এসব নানা ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও ভাওয়ালীতে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। পেয়েছি অন্তর্লোকের আলো, পেয়েছি চলার শক্তি, পেয়েছি প্রতীক্ষার আনন্দ, বিশ্বাসের আস্বাদ। এই ভাওয়ালীর নির্জন বাসে আমি শুরু করি শ্রীঅরবিন্দের গীতা পড়তে। টের পাই তাঁর যোগ নেওয়া সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। ফলে বলা চলে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল আমি শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের কৃপালাভ করে তাঁদের শ্রীচরণাশ্রয়ে বাস করছি পণ্ডিচেরীধামে।

ভাওয়ালী থেকে নেমে আসবার সময় হয়ে এল, কেননা সানাটোরিয়ম বন্ধ হয়ে যাবে। ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী—এই তিন মাস সানাটোরিয়ম বন্ধ থাকে। সানাটোরিয়মে না থেকে অন্যত্র কোনো রুগী থাকলেও তাকে অনেকখানি নির্ভর করে থাকতে হয় সানাটোরিয়মের ডাক্তারের উপর। কাজেই সানাটোরিয়ম বন্ধ হয়ে গেলে আর ভাওয়ালীতে থাকা চলে না। নেমে যেতেই হয়। তাই ভাবছি, নামতে ত হবেই। কিন্তু নেমে যাবোই বা কোথায়? সেই হচ্ছে এখন আমার মহাসমস্যা। যখন চারদিকে অকূল পাথার মনে হচ্ছে ঠিক সেই সময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবানের অশেষ করুণারূপে একটি স্নেহপূর্ণ পত্র পাই আমার অতি প্রিয়বান্ধবী মায়াদেবী (কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কন্যা) ও তাঁর স্বামী ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (স্যার সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র) কাছ থেকে। তাঁরা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন অতি অবশ্য এবং অবিলম্বে তাঁদের কাছে শিমুলতলায় যাই, তাঁরাও সেখানে বেড়াতে আসছেন। ওঁদের চিঠি থেকে জানতে পারলাম মায়া খুবই কঠিন রোগে ভুগে সবে সেরে উঠেছেন। তাঁদের এই ডাকে আমি যেন অকূলে কূল দেখতে পেলাম, মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হল। প্রণাম করলাম সেই অদৃশ্য মঙ্গলময়কে, আমি না জানতে পারলেও যিনি আমার জীবনতরীর হাল ধরে আছেন।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি ভাওয়ালী থেকে নেমে আসি। ডাক্তারদের মতে আমার অসুখ সারেনি। উপকারও বিশেষ কিছু হয়নি। লক্ষ্ণৌএ অতুলদার বাড়ি দু'চার দিন থেকে শিমুলতলা রওনা হই। পথে দু' দিনের জন্যে যাত্রা ভঙ্গ করে পাটনায় আমার দাদা সুধাংশুমোহন গুপ্তের (ব্যারিষ্টার) বাড়িতে কয়েক দিন থেকে চলে আসি সোজা শিমুলতলায় মায়াদের কাছে। আমি সেখানে পৌছে দেখি মায়া শঙ্করবাবুরা তখনো সেখানে এসে পৌছাননি। তাঁরা এলেন তার পরের দিন। দেখলাম মায়াকে নামানো হল চেয়ারে করে। আজো চোখে জল আসে মায়া ও শঙ্করবাবুর উদারতার কথা ভাবি যখন। আমি তখন যে রোগে আক্রান্ত সে রোগকে ভয় করত না এমন লোক তখনকার দিনে কমই দেখা যেত। সেই রোগাক্রান্ত আমার সঙ্গে মায়ার এই অবস্থা, সবে মাত্র যে টাইফয়েডের মত রোগ থেকে উঠে এসেছে। দুর্বল, হাঁটতেও যার কষ্ট হয়, সেই তার সঙ্গে এক বাড়িতে একত্রে বাস করা যে কত মারাত্মক ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাঁরা নিজেরাই যে শুধু আমার ব্যাধিকে গ্রাহ্য করেন নি তাই নয়, তাঁদের

একমাত্র শিশুকন্যা, তাকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতে বা বাধা দিতে দেখিনি—এতই উদার মনের পরিচয় পেয়েছি তাদের। একবার নয়, কত বারই, কত ঘটনায়। ব্যারাকপুরে এঁদের বাড়িতে আমি বহুবার গিয়েছি, থেকেছি। এঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে অতি যত্নে রেখেছেন এঁদের কাছে আমি যতবারই থেকেছি, আমার জন্যে এঁরা যা করেছেন তা এ জীবনে ভুলবার নয়। গৃহত্যাগিনীকে গৃহে স্থান দেবার জন্যে এঁদের বড় কম কথা শুনতে হয়নি। কিন্তু দেখলাম 'ও ভয়ে কম্পিত নয়' এঁদের হৃদয়—সে সব অকাতরে অগ্রাহ্য করে অকুণ্ঠচিত্তে আমায় স্থান দিয়েছিলেন এঁদের মাঝে আর এঁদের গৃহের মাঝে। শুধু তাই নয়, মায়া শঙ্করবাবুর অমায়িক আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমি মুহূর্তের জন্যেও কখনো ভাবতে পারিনি যে এঁরা আমার আপন কেউ নয়, ভুলে যেতাম যে এঁদের সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্বন্ধ নেই। 'পর কখনো আপন হয় না'—এ কথাটি ছোটবেলা থেকে কত যে শুনে আসছি, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা কিন্তু এর উল্টো সাক্ষ্যই দেয়।

শিমুলতলায় মায়াদের কাছে কিছুদিন থেকে আমি কলকাতায় আসি চিকিৎসার জন্যে। আমার ভগ্নিপতি ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ ঘোষ বার বার আমার চিকিৎসা করবার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁরই অনুরোধে তাঁদের বাড়ি চলে আসি। বহু বড় বড় অসুখে তাঁর চিকিৎসায় আমি সেরেছি। কাজেই এবারও যখন তিনি চাইলেন আমার চিকিৎসা করতে, মন সহজেই সম্মতি দিল। আবার আরম্ভ হল আমার চিকিৎসা। প্রায় পাঁচ মাস পরে, তাঁরই চিকিৎসায় আমি ভালো হয়ে উঠি। সেখান থেকে বায়ুপরিবর্তনের জন্যে গেলাম অন্ধ্রদেশের ভিজাগাপট্টম (বিশাখাপট্টনম) 'ফেবোজ ম্যানসন' নামক একটি বোর্ডিংহাউসে আমার জন্যে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম—যে শ্রেণীর লোকের ভীড় ও তাদের যা কাণ্ডকারখানা—তা দেখে আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। শুধু যে ভীড় তাই নয়, সারাদিন সমানে কী যে হৈ-চৈ, তার উপর এতই অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন যে ও বাড়িতে ওই পরিবেশে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হল। বেরিয়ে পড়লাম অন্য কোথাও যদি থাকা যায় তারই সন্ধানে। সঙ্কল্প এই যে—সেরকম থাকার জায়গা যদি পাই তো থাকব, নয়ত ফিরে যাব—এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।

রাস্তায় নেমে যাকে সামনে পেলাম জিজ্ঞাসা করতে করতে চললাম যদি কেউ কোনো বাড়ির সন্ধান দিতে পারে। এই রকম করেই পাওয়া গেল একটি

বাড়ির সন্ধান। পাওয়া মাত্র গেলাম দেখতে। সমুদ্রের তীরে তীরে যে রাস্তা গিয়েছে তারই উপর একতলা এই বাড়িটি। সামনেই অকূল বারিধি, তার উত্তাল তরঙ্গ রাশি কূলে ভেঙে পড়ার শব্দ গর্জনের মতই ক্রমাগত ভেসে আসছে। একটা আলাদা বাড়ি পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেল। চলে এলাম জিনিসপত্র নিয়ে। কিন্তু আমাকে তখুনি আবার বের হতে হল আসবাবপত্র জোগাড়ের চেষ্টায়। এ বাড়িতে আসবাবপত্র কিছুই ছিল না। নতুন জায়গা, পথঘাট জানা নেই। ঘুরে ঘুরে দোকানপাট খুঁজে বের করে প্রয়োজন মত কয়েকটি জিনিস মাস হিসেবে ভাড়া করে নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল। এ দেশটি একেবারে সমতল ভূমির উপর নয়। জায়গায় জায়গায় উঁচুনিচু আর এদিক ওদিক পাহাড় আছে। সমুদ্র আর পাহাড় দুটো থাকাতে অনেক স্থলে প্রাকৃতিক দৃশ্য চেয়ে দেখবার মতন। এখানকার সমুদ্রের ঢেউ দেখলাম খুব বড় বড়। একেকটা কী যে উঁচু—তীরে এসে যখন আছড়ে ভেঙে পড়ে মাথায় সাদা তুলোর রাশির মত ফেনা নিয়ে, তখন সে ভারি চমৎকার ব্যাপার মনে হয়। কূল পেয়ে সাগরের উল্লাস যেন আর ধরে না। বার বার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে যেন লুটিয়ে পড়ে তার স্পর্শ নিয়ে যাচ্ছে। শেষ নেই, আশ আর মেটে না। মনে হচ্ছিল অকূল নিধিও কূলের মায়ায় মুগ্ধ! আমি প্রায়ই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম বালুতটে—উপরে অবারিত ওই অসীম অনন্ত আকাশ, আর নিচে তারই ছায়া-বুকে দিগন্ত বিস্তৃত অপার অগাধ জলধি—আমার বুকে জাগিয়ে তুলত সুর, আপনার সীমা হারাবার।

একটু গুছিয়ে বসবার পর বেড়াতে এলেন নীরেন রায়। দিলীপকুমার রায় তাঁর এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই পরিচয়ই নীরেনবাবুর সব পরিচয় নয়। আমি তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি বলছি সেই কথাই। আমার ভাওয়ালী যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ইনি আমার জন্যে যা করেছিলেন তা যদি না করতেন তবে সে-সময় আমাকে সেখানে পড়তে হত অথৈ জলে এবং পেতে হত আরো কত যে দুঃখকষ্ট যার ফলে আমার জীবনের সমস্যা হয়ে উঠতে পারত আরো কঠিন, আরো জটিল। সেই সময় এঁকে পেয়েছিলাম পরম সহায়, সুহৃদ বন্ধুরূপে এবং সেই সূত্রেই গড়ে উঠেছিল আন্তরিক হৃদ্যতার একটি সুন্দর সম্বন্ধ। অনেক পরিচয় পেয়েছি এঁর সহৃদয়তার। মানুষটির অন্তর এত দরদে ভরা। মনটিও কোনো রকম দূরত্ব রচনা করে চলে না। বেশ স্বচ্ছন্দে কাছে এগিয়ে আসতে জানে, কোনো আড়ষ্টতা না রেখে। সব কিছুকে সরস করে তুলবার, একটা সহজ সজীব পরিবেশ গড়ে নেবার এঁর

বেশ একটা ক্ষমতা দেখেছি। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম চিকিৎসাধীনে, তখন ইনি প্রায়ই সেখানে গিয়ে আমার খোঁজ খবরাদি নিতেন। আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে এঁকে আপনজনের মতই ভাবতে, চিন্তা করতে দেখেছি।

নীরেনবাবু আসার দিন কয়েক পরে এলেন দিলীপ কুমার। তিনি আসাতে বাড়ির আবহাওয়া গেল বদলে। দুই বন্ধুর একত্র হওয়া এবং সেই সঙ্গে দিলীপের প্রাণখোলা হাসির রোল ও প্রাণোচ্ছলতায় আমাদের ঘুমন্তপুরী যেন জেগে উঠল আলোর স্বপ্ন নিয়ে। নীরেনবাবু বেশ মিশুক স্বভাবের এবং কইয়ে বলিয়ে মানুষ হলেও আমার সঙ্গে উনি একা বসে আর কত কীই বা বলবেন। কাজেই দিলীপ আসাতে ওঁর সুবিধা হয়ে গেল। দিলীপকুমার এসেই আসর জমিয়ে তুললেন। আরম্ভ করে দিলেন গান, গল্প। আরম্ভ করে দিলেন নানা জনের এবং নিজেরও কবিতা, গল্প প্রবন্ধাদি পাঠ করে শোনানো। তার উপর সকলে একসঙ্গে সকালে সমুদ্রস্নান, সন্ধ্যায় মোটর চেপে হাওয়া খেতে বের হওয়া—এই সবেতে দিনগুলি বেশ আনন্দমুখর হয়ে উঠল। বাড়ির সামনে খোলা গোল চত্তরে বসে সকাল সন্ধ্যায় চলত বন্ধুদ্বয়ের কতরকম চিত্তাকর্ষক সব আলাপ-আলোচনা। আমার অন্তর তা থেকে সংগ্রহ করে নিত তার খোরাক। এঁরা দুইজনেই চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত। লক্ষ্য করতাম, এঁদের আলোচনার বিষয় প্রায়ই শেষ হত এসে আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে। সে সময় শুনতে পেতাম শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমুখ মহাজ্ঞানী মহাযোগী মহাত্মাদের অদ্ভুত ভালো ভালো কত সব কথা, অমূল্য বাণী। শুনে মনে হত সে-সব যেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিত,—বাস্তবিক তাঁদের সে সব কথা অন্তরের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করত, দাগ কেটে বসে যেত। মনে হত, মন যেন কে অন্য এক সুরে বেঁধে দিল।

মনে পড়ে এঁদের কথা বলতে দিলীপকে কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখতাম। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলতেন, চোখেমুখে জলে উঠত কিসের এক আলো, আর সেই আলোতে দেখতে পাওয়া যেত তাঁর অন্তরের ছবি, অন্তর্নিহিত রূপটি। দেখতে পাওয়া যেত তাঁর জীবনে এঁদের স্থান কোথায়, আর সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠত শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে তাঁর জীবন তখনই কতখানি প্রভাবিত। দিলীপ কুমারের কথাবার্তা শুনেই আমি প্রথম যোগজীবন সম্বন্ধে আলো পাই ও ধীরে ধীরে সেইদিকে আকৃষ্ট হই। সে অবশ্য ভাওয়ালী যাবারও আগের কথা। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের কথা তিনিই আমায় বলেন ও তাঁরই কথায় অবগত হই পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সেই সাধনায় মগ্ন, জানতে পারি সেখানকার শ্রীঅরবিন্দ

আশ্রম সম্বন্ধে সব খবরাখবর। শ্রীঅরবিন্দ যে মহাযোগী একথা অবশ্য শুনেছিলাম বহু আগেই, আমার মায়ের মুখে। আমি তখন ছোট। অগ্নিযুগের সময় থেকেই, আমাদের অন্তর পূর্ণ ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায়। মাকে দেখতাম কী শ্রদ্ধা, কী ভক্তি নিয়েই তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কথা বলতেন। তখন দেখেছি ভগবানের চিন্তা নিয়ে থাকতে আমার মা কত ভালোবাসতেন। হয়ত তাঁর সেই দৃষ্টান্তই তলে তলে আমার পরবর্তী জীবনে পাণ্ডিচেরীর পথে আসার প্রেরণা যুগিয়েছে।

দিলীপের সংস্পর্শে এসে আমি জীবনকে দেখতে শিখি অন্য দৃষ্টি নিয়ে। দেখতে পাই অনেক কিছুই, যা ছিল পড়ে আমার দৃষ্টির বাইরে, অগোচরে। জীবনের গভীরতর দিকে দৃষ্টি পড়ে, দেখতে পাই পথ সামনে এগিয়ে চলার। অনুভব করি একটা আগ্রহ আপনাকে জানার, বিকশিত করে তোলার। দিলীপের কাছে যা শিখেছি যা পেয়েছি তা বলতে গেলে কিছুই বলা হয় না। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর গান শুনে ও তাঁর কাছে গান শিখে বাংলা গান সম্বন্ধে আমার মত ও ধারণা অনেক বদলে যায়। অবশ্য বাংলা গান বলতে আমি ভাবমূলক ও বাণীপ্রধান গানের কথাই বলছি। সে সম্বন্ধে আমার মধ্যে অনেক সব গোঁড়ামি ছিল বলা চলে। প্রায় বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই জাতীয় গানে খুব বেশি তান, সুরের কাজ, বা ভেরিয়েশন (Variation) অথবা ইমপ্রোভাইজেশন (improvisation)—এসব চলে না। ঠিক যেন খাপ খায় না এবং ওতে গানের ভাব খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ই। তাই ওসবে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। অন্তরেরও সায় ছিল না। আজ এসব লিখতে বসে বারবারই মনে পড়ছে ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসের কথা। আমার মামা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সেবারে সভাপতি নির্বাচিত হন। সেবার সেই কংগ্রেস প্যাণ্ডালে বসেই প্রথম শুনি সুভাষবাবুর বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের গান। কী রকম যে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বরে ও গায়কীর অভিনব ঢঙে! মনে হয়েছিল, সঙ্গীত জগতের একটা নতুন দিক যেন দেখতে পেলাম। পরে তাঁর কাছে বহু গান শিখি ও সেই সব গান গেয়ে এত আনন্দ পাই যে তারই মাধ্যমে উপলব্ধি করি বাংলা ভাবমূলক গানে সুরের বিস্তার অন্তরায় হয় না বরং সহায় হয় যদি গায়কের গানে প্রাণ থাকে ও গায়ক শিল্পী হন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে অবশ্য অন্য কথা। যাক এইবার ফিরে আসা যাক আবার আগের কথায়, যা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে।

বন্ধুদ্বয় বেশিদিন ছিলেন না। দিলীপকুমার আগেই ফিরে যান। নীরেনবা ছিলেন আরো দু'চার দিন।

এইসব দরদী, শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, সুজন, এঁদের শুভকামনাপূর্ণ সহানুভূতি-শীতল স্পর্শে আমার নানা সংগ্রাম-সংঘর্ষের উষ্ণ তাপে জর্জরিত জীবন পারেনি শুকিয়ে যেতে, বরং পেয়েছে প্রেরণা নবজীবন লাভের। সেই প্রেরণার মূলে সিঞ্চিত করে চলেছে যাঁর করুণার অবিরল ধারা তিনিই চালাচ্ছেন জীবন আমার, পাচ্ছি সেই অনুভূতি, পাচ্ছি বিশ্বাস এপথ আমায় নিয়ে চলেছে সেই পথের দিকে, পণ্ডিচেরীর পথ যেখান থেকে শুরু।

বেশ বুঝতে পারছি ক্রমেই নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠছি। নিঃসঙ্গ জীবন শুধু যে ভালো লাগছে তাই নয়, তারই দিকে ঝুঁকেছে ভিতর বাহির সব যেন। অন্তরের নিভৃত কক্ষের পেয়েছি সন্ধান, সেইখানে গিয়ে স্থিতি হতে চাইছে আমার মন, প্রাণ, আমার সব। কেউ এলেও সেই নিভৃত কক্ষে তার পদধ্বনি পৌঁছায় না। ইদানীং লক্ষ্য করছিলাম যে, প্রিয়-পরিজন, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গ, সাহচর্য আমার অতি কাম্য ছিল, তাদের খুব কাছে পেলেও ভিতরে নিঃসঙ্গতা বোধ ঘুচত না। অনেক সময়েই দেখতাম, ভিতরটা থাকতে চাইত আপনাকে নিয়ে নিরালায়—বাইরেটা যা করবার তা করে চললেও—নিজের মধ্যে এইরকম একটা বিভক্ত ভাব অনুভব করা গিয়েছিল কিছুদিন। এবাড়ির আশেপাশে অন্য কোন বাড়ি না থাকায় এবং বাড়িটা রাস্তার উপর না হয়ে তার থেকে একটু উঁচু মতন জায়গায় অবস্থিত বলে কোলাহলও বিশেষ পৌঁছাত না, এক সমুদ্রের অবিরাম অবিশ্রাম একঘেয়ে গর্জন ছাড়া—আমার কানে তা বাজত যেন নিত্যকালের নিত্যকলার সুর। নির্জনতার চাইতেও আরো ভাল লাগত নীরব হয়ে থাকতে, ইচ্ছে হত—

'নীরব হয়ে রইব বসে চাইব গো জোড় হাতে'

নীরবতার মাঝে পাওয়া যেত কিসের একটা স্পর্শ যেন। আমার চেতনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে উর্ধ্বমুখী হতে চাইত।

এখানে মাস দুয়েক থেকে আমি স্থির করলাম দাক্ষিণাত্যের উটকামণ্ড পাহাড়ে গিয়ে কিছুকাল থেকে আসব। কেননা ডাক্তারদের মতে আমার আরো কিছুকাল বাইরে থাকা প্রয়োজন। খোঁজ-খবরাদি নিতে আরম্ভ করলাম। লেগে গেলাম 'উটি' যাবার আয়োজনে। জানা গেল উটিতে একটি বাড়ির এক অংশ ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। ঠিকানা জেনে নিয়ে সেই ঠিকানায় পত্র লিখে উত্তর পেলাম, বাড়িভাড়া, খাওয়া-দাওয়া চাকর-বাকর ইত্যাদি সব সমেত

লাগবে দৈনিক ছ'টাকা। স্থির করে ফেললাম ওখানেই যাব এবং সে খবর জানিয়ে তাদের লিখে দিলাম সব ঠিক রাখতে।

বাড়িটির গৃহকর্ত্রী যিনি, তিনি বিধবা একজন ইংরেজ মহিলা। স্বামী এবং পিতা উভয়েই ছিলেন ইংরেজ। মাতা তখনো জীবিতা। ফরাসী মহিলা। দুইটি পুত্রকন্যা ও বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে তিনি থাকতেন পাশের বাড়িতেই। বাড়ির যে অংশটি আমি পেয়েছিলাম তাতে ছিল শোবার ঘর দুটি, কাপড় ছাড়ার ঘর একটি, স্নানের ঘর দুটি এবং বসবার ঘর আর খাবার ঘর করা হয়েছিল একটি মস্ত বড় ঘরকে ভাগ করে। সব ঘরই যথেষ্ট আসবাবপত্র দিয়ে বেশ সাজানো থাকার খুব আরাম আছে, সুবিধাও আছে। আমার খাবার, স্নানের গরমজল ইত্যাদি যা কিছু দরকার, সবই আসত বাড়ির মালিকের বাড়ি থেকে। আমাকে কিছুই করতে হত না। কাজেই কোনো হাঙ্গামা ছিল না। চাকর এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে কাপড় কেচে দিয়ে যেত। ঠিক সময়ে স্নানের জন্যে গরম-জল আসত। খানসামা খুব ভোরে বিছানায় চা (বেড্-টি) দিয়ে যেত। পরে সাড়ে আটটায় দিয়ে যেত ছোটাহাজরী (ব্রেকফাস্ট)। দুপুরে একটার সময় আসত লাঞ্চ্ বা দুপুরের খাবার, বিকালে চা, রাত্রে আটটার সময় ডিনার। প্রতিবারেই যথেষ্ট খাবার এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিলিতি খাবার দিত। আমি কোনোবারেই সব খাবার খেয়ে উঠতে পারতাম না। মহিলাটি আমার সঙ্গে এত ভালো আপনজনের মত ব্যবহার করতেন যে আজো তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। প্রায়ই এসে জেনে যেতেন, আমি ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া করছি কি না। না খেলে আমার শরীর সারবে না, ইত্যাদি এমন স্নেহের সঙ্গে বলতেন। শুধু তাই নয়, ভালো করে খাবার জন্যে বেশ জোরজবরদস্তি করতেন আপনজনের মতনই। এই মহিলাটিকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। প্রায়ই যেতাম তাঁদের বাড়ি। বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা যে কী ভালোই কফি করতেন! ওঁদের বাড়ি গেলেই কফি খাওয়াতেন। অদ্ভুত কফি খেয়েছি ওঁর হাতের।

ভাইজ্যাগ (vizag—বিশাখাপট্টনম) থেকে উটি যাবার আগে আমার চাকর-চাকরাণীকে জিনিসপত্রসহ কলকাতা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে আমি চলে আসি সোজা উটির দিকে। এই উটি হল দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পর্বতের একটি বিখ্যাত শৈলাবাস। উচ্চতা বোধকরি ৭৪০০ ফিট। সৌন্দর্যের জন্যে উটি বিখ্যাত। শুনেছি একে বলা হয় সৌন্দর্যের রাণী—Queen of beauty.

ভাইজ্যাগ থেকে দুপুরে রওনা হয়ে পরদিন প্রাতে আমি মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে নামি। এই আমার প্রথম মাদ্রাজে পদার্পণ। সারাদিনই আমাকে

অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কেননা নীলগিরির গাড়ি ছাড়বার কথা রাত্রে। তাই আমি দু'একবার বেরিয়েছিলাম গাড়ি করে শহর দেখতে। সন্ধ্যা নাগাদ গেলাম সমুদ্রতীরে। কী চওড়া যে এখানকার সমুদ্রের বেলাভূমি! সমুদ্রের জল খুব গাঢ় নীল। এই বিস্তীর্ণ বালুতটে বসে চা-পানাদির সুবিধার জন্যে রেস্তোঁরা আছে। অনেকেই দেখলাম সঙ্গী সাথী নিয়ে চা নয় ত কফি পানে রত। অবশ্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাবারও আছে। বেলাভূমির উপর ছোট ছোট টেবিল এদিক-ওদিক পাতা রয়েছে, যার যে জায়গা পছন্দ, সে সেই জায়গা বেছে নিয়ে বসে যায়—কখনো বা যুগলে কখনো বা সদলবলে। খোলা আকাশের নিচে নীল সমুদ্রের সামনে বসে কেক্ ও আইসক্রীম খেতে খেতে স্থানটিকে উপভোগ করছিলাম। অন্ধকার হয়ে আসতে ফিরে এলাম স্টেশনে।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় গাড়ি ছাড়ল নীলগিরি যাবার। পরদিন ভোরবেলা গিয়ে নামলাম উটি যাবার ছোট রেলগাড়ি যে স্টেশন থেকে ছাড়ে সেই স্টেশনে। স্টেশনটির নাম মনে নেই তাই উল্লেখ করতে পারলাম না। সকাল-বেলা রেলওয়ে স্টেশন থেকেই চা-পান সেরে নিয়ে বসলাম গিয়ে উটাকামণ্ডের গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ল সাড়ে আটটায়। ভেবেছিলাম এই পথে না জানি কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যই দেখব! কিন্তু সে রকম কোন দৃশ্যই দেখতে পাওয়া গেল না। যা চোখে পড়ল তা দৃশ্য নয়, অজস্র কলাগাছ। পার্বত্য অঞ্চলে এত কলাগাছ আমি এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। উটকামণ্ডে গিয়ে নামলাম দুপুরে। স্টেশনে নেমে কাউকে দেখতে পেলাম না। একটি রিক্সাওয়ালাকে বাড়ির নাম বলতে সে আমাকে নিয়ে সেই বাড়িতে পৌছে দিল। পৌছে জিনিসপত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে—যাঁর বাড়ি তিনি নিজে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন ওখানাকার বন্দোবস্ত ব্যবস্থাদির বিষয়। বাড়ির অন্য অংশে ছিলেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের কোনো নিকট আত্মীয়া, তাঁর স্বামী পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে। এঁদের দিকের বাড়ির অংশটি ছিল আমার দিকের দ্বিগুণ বড়। আমাদের এই বাড়ির নাম ছিল 'Ivy Bank'। বাড়িটি ছিল বড় সুন্দর জায়গায়। পাশেই একটু নিচে উটির সবচেয়ে সুন্দর পার্ক। কত রকম রং-বেরং-এর ফুলের কেয়ারী আর তার যা বাহার—দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। আমাদের বাড়ি থেকে পার্কের দিকে তাকালে মনে হত ঠিক যেন নানা রকম ফুলের নক্সাকাটা সবুজ গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আমি যখন তখন নেমে যেতাম পার্কে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় চাঁদের আলোর তারাভরা রাতে ইচ্ছে

হলে চলে গিয়ে একাকী চুপ করে বসে থাকতাম। এই পার্কের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে রাজভবনের প্রবেশপথ। আর তার নিচের দিকে বিরাজিত মস্ত বড় ময়দান—বেড়া দিয়ে ঘেরা, বোধকরি খেলাধূলোর জন্তে। মনে হত, এই সমতল স্থানটিই এই পর্বতের পাদভূমি আর পাহাড় উঠেছে যেন এইখান থেকেই।

উটির রাস্তাঘাট ভারি সুন্দর। মোটরে বেড়াবার অতি চমৎকার সব রাস্তা চলে গিয়েছে দূরে······বহুদূরে। এই সব রাস্তায় বেড়াতে গেলে চারিদিকের পাহাড় দেখায় অনেকটা ঢেউ খেলানো মত, দেখতে ভারি সুন্দর—সবুজের পর সবুজের ঢেউ যেন চলে গেছে, যতদূর দৃষ্টি যায়। দার্জিলিং-এর মত এই পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া দেখা যায় না। আর এদেশের চড়াই-উতরাইও দার্জিলিংয়ের মতন অমন খাড়া নয়। দার্জিলিং-এ রাস্তায় বের হলে প্রায়ই জায়গায় জায়গায় এমন সব খাদ দেখতে পাওয়া যায় যে, নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়—মনে হয় পড়লে আর রক্ষে নেই, সোজা একেবারে খাদের গভীরে। চারিদিকে উঁচু উঁচু বিরাট পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন অনন্তকালের প্রহরীর মত। যেদিকে তাকানো যায় মনে হয়, সবই যেন অভাবনীয় ব্যাপার, নয়নে মনে লেগে থাকে একটা অবাক বিস্ময়ের ঘোর সর্বদাই। বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা যখন প্রভাতসূর্যের কিরণ স্পর্শে তার মেঘে ঢাকা আবরণ সরিয়ে উঁকি দেয়—সে যেমন এক অপূর্ব অপরূপ অভিব্যক্তি, আবার টাইগার হিলের সূর্যোদয় --সেও তেমন এক অপার বিস্ময়—অন্ধকারের যবনিকার অন্তরাল থেকে প্রথম আলোর চরণ ফেলে সূর্যদেবকে যখন হিমালয়ের শিখরদেশ ছাড়িয়ে উঠতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে তার সেই রক্তিম আলোর ছটায় যখন মনে হয় শিখরে শিখরে বুঝি জ্বলে উঠল আগুন তখন সে দৃশ্যে আমাদের অন্তরে যে কিসের সাড়া তোলে আর এনে দেয় কোন অনুভূতির উন্মাদনা--খুঁজে পাই না তা প্রকাশ করবার ভাষা!

নীলগিরির বিখ্যাত 'রূপের রাণী' উটির রূপৈশ্বর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে রূপ স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হলেও হিমালয়ের মত অমন বিস্ময় দিয়ে ঘেরা নয়। তার রূপসজ্জার মাঝে চটক আছে, মৌলিকতাও আছে। কিন্তু নেই সেই স্বর্গীয় আভিজাত্য, সেই দিব্যমহিমা। উটির সৌন্দর্য আমাদের নয়ন মনকে পরিতৃপ্তি দেয় কিন্তু পারে না তুলতে অন্তরের গভীরে কোন সাড়া, পারেনা জাগাতে সেই বিস্ময়, ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য হবার স্তম্ভিত হতবাক হয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকার সেই অসহ্য পুলক শিহরণ!

অবশ্য হিমালয়ে যা আছে তা যে নীলগিরিতেও থাকবে এমন কোনো কথা নেই। পর্বত দেখলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে আর বলতে ইচ্ছে হয় তার কথা। হিমালয় জগতে অতুলনীয়। ভারতবাসী হিমালয়কে শুধু পর্বতরূপেই দেখেনা, দেখে দেবতাত্মারূপে। দেখে তার মাঝে বিরাটকে, মহানকে —আর দেখে দেবাদিদেবের লীলাভূমি রূপে। হিমালয় আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণার উৎস। তার গুহায় গুহায় জ্বলে তপস্বীর তপোবহ্নি। হিমালয়ের বিরাট বক্ষে আত্মার অনির্বাণ বাণী, আত্মোপলব্ধির শাশ্বত আহ্বান, অনাদিকালের অনন্ত ব্যঞ্জনা। হিমালয় দর্শনে মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সে অন্য জিনিস। একবার যে হিমালয় দেখেছে তার বোধকরি বা অন্য কোনো পর্বতই আর সে তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষ, যারা চোখ দিয়েই শুধু দেখে না, পেতে চায় সমস্ত অন্তর দিয়ে দৃশ্যের মাঝে দৃশ্যের অতীত যা তারই নিবিড় স্পর্শ।

হিমালয়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি অক্ষয় সম্পদ। হিমালয় আমার জীবনকে বারবার ঘুরিয়ে দিয়েছে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্যের দিকে। এনে দিয়েছে চেতনার উন্মেষ। খুলে দিয়েছে আন্তর জীবনের প্রবেশদুয়ার—নিয়ে গেছে তারই রহস্যরাজ্যে। এই হিমালয়ে শ্রীঅরবিন্দকে আমার ইষ্ট গুরুরূপে আমি অন্তরে উপলব্ধি করি ও পাই। হিমালয়ের সঙ্গে আমার অন্তরের কোথায় যেন একটা যোগাযোগ ঘটে গেছে। একদিন যে দ্বার সেইখানে উদ্ঘাটিত হয়েছিল আপনা হতেই আমার অলক্ষ্যে, জীবনের নানা ঘটনাচক্রে তা কতবারই বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলেও তা হতে পারেনি সে কেবল তাঁর অসীম কৃপায়, যিনি খুলে দিয়েছিলেন সেই দুয়ার। নীলগিরিতে আমি যা পেয়েছি তা পেয়েছি আমার অন্তরের আকুতির ফলে—পেয়েছি চেয়েছি বলে। হিমালয় যা দিয়েছে, তা দিয়েছে না চাইতেই, আপনা হতে। হিমালয় আমায় দেখিয়েছে পথ, নীলগিরি দিয়েছে পথ ছেড়ে আমার আপন পথে চলতে দিতে। একটি দিল পথ ধরে, অপরটি দিল পথ করে।

এমনি করে চলেছি সেই পথে যে পথে যাবার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছি এতদূর। বাইরের দিক থেকে দেখলেও দেখা যাচ্ছে আমি চলেছি দক্ষিণ মুখে ক্রমশ এগিয়ে। জানি না কবে পৌঁছব পণ্ডিচেরীর উপকূলে। দেখতে পাচ্ছি জীবনের জাল গুটিয়ে আসছে চারদিক থেকে ধীরে ধীরে। যাবার জন্যে ব্যাকুলতাও বেড়েই চলেছে। পণ্ডিচেরী যেতে হলে শ্রীমায়ের অনুমতি বিনা ওখানে যাওয়া যায় না জানতাম। শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে চিঠি লিখলাম সব জানিয়ে। এই তাঁর চিঠির উত্তর —

শ্রীমতী সাহানাদেবী সমীপে—

আপনার পত্রের মর্ম মাকে শুনাইয়াছি, শ্রীঅরবিন্দও জানিয়াছেন।

যোগজীবন কঠিন। যোগ-শক্তির দাবি-দাওয়া অসম্ভব। যোগপথে কেবল তাহাদেরই প্রবেশ করা সার্থক, যাহারা অনন্যগতি, যাহাদের আত্মবলিদান নির্মম, অখণ্ড।

সাধারণ জীবনের পুরাতন সংস্কারের কোন পাথেয়ই এখানে কাজে আসিবে না—সে সব বরং অন্তরায়। মনের কল্পনার প্রেমের ছাঁচে ফেলিয়া যোগশক্তিকে রূপ দেওয়া চলে না। যোগশক্তির কাছে নিজস্ব ছাঁচ—সাধককে সর্বতোভাবে তাহার মধ্যে নিজেকে গলাইয়া হারাইয়া দিতে হয়।

আপনি নিজের সহিত আরও বুঝাপড়া করিয়া দেখিবেন। যোগের জন্য আপনার হৃদয়ের ডাক যত ঐকান্তিক ও সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে, মায়ের স্পর্শলাভও তত সুলভ হইয়া উঠিবে।

পণ্ডিচেরী, ১৩৩৫ —শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

নলিনীবাবুর চিঠি পড়ে অনেক কিছু অবগত হলাম যা ছিল আমার ধারণার বাইরে। যোগী, ঋষি, তপস্বী, সন্ন্যাসীদের কঠোর তপস্যার, কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনেছি অনেক, পড়েছিও বড় কম নয়, কিন্তু সেসব সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা জন্মালেও স্থির কিছুই জানতাম না। অখণ্ড আত্মবলিদানের এই অতি কঠিন নির্মম দিকটা কখনো চেতনার সামনে উদয় হয়নি, তবে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণভাবে না করলে যে নয়, এবং তা যে একেবারে গোড়াকার কথা, সে সম্বন্ধে ভালো করেই অবহিত ছিলাম। নলিনীবাবুর চিঠি যোগশক্তির দাবীদাওয়া এবং যোগসাধনার সর্তের দিকে আলোকপাত করল, স্পষ্ট হয়ে উঠল সেদিক। তাঁর চিঠি পড়ে মন এগিয়ে এল তার প্রস্তুতির পথের দিকে চলবার জন্যে। তাঁর চিঠির প্রভাবে আমাকে পৌঁছে দিল এমন জায়গায় যেখানে গিয়ে দেখলাম ভয়-ভাবনা সব সরে গেছে। সম্ভব-অসম্ভবের কথা তখন আর ভাবছি না—চলতে আরম্ভ করলাম কিসের তাগিদে যেন, যাবোই আমি, যেতে আমাকে হবেই—এই শক্তির খোরাক নিয়ে। অনুভব করলাম অন্তরের ভিতর জ্বলে উঠেছে এক শিখা, সেই শিখা বুকে নিয়ে আমি চলেছি যেন—কোন্ দিকে, কোথায় বা কেন, এসব কখন মুছে গেছে জানি না। ভেসে উঠেছে এক পথ তা হচ্ছে পণ্ডিচেরীর পথ।

উটি থেকে নেমে এলাম ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে নেমে পেলাম একটি সঙ্গী। পথ বদলে চলে গেলাম তার সঙ্গে আরো দক্ষিণের দিকে। তাঞ্জোর, ত্রিরুচিরপল্লী, মণ্ডপম এবং রামেশ্বর

দেখে আমি ফিরে গেলাম বাংলাদেশে (পশ্চিমবঙ্গে)। গিয়ে রইলাম প্রিয় বন্ধু মায়াদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে।

এবার পাহাড় থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত আমার অন্তর ধরেছে আরো গভীরে যাবার পথ। গভীরতর অনুভূতির পাচ্ছি নানা আস্বাদ, খুলে গেছে আর এক দিক যেন। সামনে আর এক রাজ্য, আর এক লোক, আমি যেন অন্যলোক-বাসী। যেমন ঘুম আসে আমার তেমনি ধ্যান আসত। কেবলি নিরালা খুঁজে ফিরতাম ভিতরে যা পাচ্ছি তাই নিয়ে একান্তে পড়ে থাকতে। মনে হত আমার ভিতরে বাহিরে তারই প্রভাব যেন জমাট বেঁধে উঠছে—আর আমি ভুঁইয়ে পা দিয়ে আর চলছি না। চলছি অন্য কিছুর উপর দিয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে আর এক জীবন।

ঠিক এই সময় ঘটল প্রমাদ, ঘটল এমন এক ঘটনা যার প্রচণ্ড ধাক্কায় মনে হল গেল বুঝি আমার সব ধূলিসাৎ হয়ে। ছিন্নমূল লতার মত পড়লাম লুটিয়ে বেদনায় দিশেহারা হয়ে একেবারে ভেঙে। এ আঘাত যে আসবে তা আমার জানা ছিল এবং তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুতও করছিলাম। কেননা এটা ত জানা কথাই যে, কোনো আসক্তি থাকলে ভগবানের পথে এগোনো যায় না। তাই তার জন্যে ভিতরে ভিতরে তৈরী হচ্ছিলাম। কিন্তু এত অকস্মাৎ, এত অতর্কিতে ব্যাপারটি ঘটে গেল যে নিজের অবস্থা ভালো করে বুঝে নেবার আগেই দেখি আমি ধরাশায়ী, অত্যন্ত বিচলিত, আকুল হয়ে পড়েছি যা পেয়েছিলাম অমন একান্ত করে তা হারাবার ভয়ে। কিছু করবার যেন আর ক্ষমতা নেই, এতই কাতর, এতই অবসন্ন। পরে যখন স্থিরচিত্ত হলাম, খোলাচোখে সব তাকিয়ে দেখলাম—তখন দুঃখের অবধি রইল না ভেবে যে, যে আসক্তির থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করেছি কেবল, সেই মুক্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা যখন এল ভগবানের আশীর্বাদরূপে আমাকে সেই পথে নিয়ে যেতে, তখন দেখলাম আমার অবশ তনু মন প্রাণ তাকে গ্রহণ করতে পারল না, চাইল না তাকে, রইল পড়ে বদ্ধ ঘরে হতাশার অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরে। অবাক হয়ে দেখলাম এই প্রতিক্রিয়া! এতটা যে হবে কে ভেবেছিল!

তাই ভাবি আমাদের এই প্রকৃতি গঠিত কি দিয়ে, কোন উপাদানে তার কিছু কি আজো জানতে পারলাম? শুনেছি এরই রূপান্তরের পথে নিয়ে যেতে চাইছেন শ্রীঅরবিন্দ মানুষের চেতনাকে দিব্যচেতনায় রূপান্তরিত করে। শ্রীঅরবিন্দের 'The Mother' বইখানা পড়তে শুরু করলাম। মনে আছে প্রথম প্রথম তার কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে বার বার পড়তে পড়তে দেখতে

পেলাম ধীরে ধীরে আমার মানসে যেন আলোকপাত হচ্ছে। যত পড়ছি তত দেখছি পণ্ডিচেরী আমাকে কেবলি টানছে। অবসাদ কবে কেটে গেল জানি না। আবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, পা বাড়ালাম চলার পথে।

কিছুদিন বাদে আমাকে ব্যারাকপুর থেকে চলে আসতে হল। মায়া আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তার চিকিৎসার জন্যে তাকে নিয়ে শঙ্করবাবু গেলেন কলকাতায়। তাদের খালি বাড়িতে আমি আরো কিছুদিন থেকে চলে এলাম কলকাতায় আমার ছোটমাসিমা মুরলাদেবীর বাড়িতে। ভবানীপুরে টাউওসেণ্ড রোডে ছিল তাঁদের বাসাবাড়ি। আমি সেখানে যাবার পর নানা জায়গা থেকে আসতে লাগল গাইবার নিমন্ত্রণ। সভাসমিতিতে গাইবার কোনো তাগিদই আর ছিল না। অথচ সব জায়গায় প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হত না। এসবের থেকে মন একেবারে সরে গিয়েছে। ছোটমাসিমার বাড়িতে প্রায়ই গানের আসর লেগেই থাকত। কাজেই আমাকে সেই আসরে গিয়ে বসতেও হত। সেই আসরে প্রায়ই দেখতাম আসন গ্রহণ করতেন পরম স্নেহাস্পদ হেমেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ সুগায়কেরা। আজো কানে বাজে হেমেনের 'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালো-বাসি'। অমন করে এ গান আর কাউকেই গাইতে শুনিনি। রবি ছিল ক্লাসিকাল সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ও ভক্ত। তারই শিক্ষায় তার কন্যা সুবিখ্যাতা গায়িকা মালবিকা কানন আজ সঙ্গীত জগতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে একজন।

শ্রীঅরবিন্দের বই পড়ার আলো আমার মধ্যে এনে দিল একটা দ্রুত পরিবর্তন। আমি লক্ষ্য করছি, তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে আমার সমস্ত সত্তা ঝুঁকেছে পণ্ডিচেরী যাবার ও শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনের দিকে। ব্যাকুলতা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে এর থেকে নিজেকে অন্য কোনোদিকে আর সরাতে বা ফেরাতে পারছি না। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের যোগ গ্রহণের আগ্রহ বোধ করতে আরম্ভ করেছি পণ্ডিচেরী যাওয়ার আগেই এবং সে আগ্রহ বা ইচ্ছে ধীরে ধীরে ক্রমে যে গভীরতর হয়ে উঠছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল। তবে এতদিন যা করেছি তাকে তো ঠিক সেভাবে সাধনা করা বলা চলে না। ভিতর থেকে যেমন যেমন তাগিদ পেয়েছি, বুঝেছি, সেইমত চলেছি তাকে আশ্রয় করে। গুরু আমায় গ্রহণ করবেন কিনা তা জানি না, তবে তাঁর কৃপা আমি পেয়েছি। নইলে পণ্ডিচেরী যাবার আগে থেকে যে-সব অনুভূতি আমার হতে আরম্ভ করেছিল সে-সব কখনোই সম্ভব ছিল না গুরুর কৃপা ছাড়া। গুরুর কৃপা, গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক সাধনপথে চলা যে কত বিপজ্জনক, সে কথাও

আমার অবিদিত ছিল না। তাই যা বলতে চাইছি তা এই যে, আজ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছি, যে ভাবেই পেয়েছি তা পেয়েছি শুধু তাঁরই প্রসাদে। তাঁরই আশীর্বাদের ধারা রূপে সে-সব নেমে এসেছে আমার জীবন ধৌত করে। নইলে ধ্যানধারণা করতে আমায় কেউ শেখায়গুনি, বলেও দেয়নি। অথচ প্রথম যেদিন ধ্যান করতে চেষ্টা করি, দেখলাম কোনো অসুবিধাই হল না। আপনা হতেই জমে গেল ধ্যান। তাই বলছি, বললে হয়ত ভুল বলা হবে না যে, এ সবই হয়তো পথ কেটে নিয়ে এসেছে এইখানে যেখানে এসে আজ দাঁড়িয়েছি।

যাইহোক পণ্ডিচেরী যাবার তাগিদেও তার তীব্রতা এত বেশি অনুভব করছি আজকাল যে, অন্যান্য সব সমস্যার চিন্তাকে তা ছাপিয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেও কী দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছি—শ্রীঅরবিন্দ আমায় নেবেন কি না এই দুশ্চিন্তায়। কতই উতলা হয়েছি আকুল হয়েছি এইভেবে যে,—যোগসাধনা অসম্ভব কঠিন ব্যাপার, অসাধারণ আধার ভিন্ন তা হবার নয়। তাই আমার মত আধারের আশা কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না। কেমন করেই বা তবে শ্রীঅরবিন্দের আমায় গ্রহণ করা সম্ভব? সংশয় এসেছে বার বার—যা না থাকলে সাধনা করা অসম্ভব, আমার নিজের মধ্যে তার কিছুই যে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবে? হতাশায় ভেঙে পড়েছি, কোনো দিক দিয়ে কোনো ভরসাই আর পাচ্ছি না—শ্রীঅরবিন্দ আমায় নেবেন বলে। কেবল একটি সঙ্কল্পে দেখছি চিত্ত আমার স্থির, তা হচ্ছে এই যে, যোগজীবন না পেলে এজীবন আর আমি রাখব না। একেবারেই অসম্ভব আর এভাবের জীবন যাপন, অসহ্য।—দুদিন আগেও ছিল এই অবস্থা, অথচ দুদিন পরে দেখছি ওই ধরনের দ্বন্দ্বদোলার কোলাহল আর কানে আসছে না—কোনও যোগ্যতা নেই জেনেও না ঝাঁপ দিয়ে পারছি না—এইটে আজ সুস্পষ্ট। দেখতে পাচ্ছি—সের বাটখারার একদিকে কিছু চাপালে তার অন্য খালি দিকটা যেমন একেবারে সোজা উপরে উঠে যায়, আমার অবস্থা হয়েছে অবিকল সেই রকম। সমস্ত ওজন গিয়ে পড়েছে পণ্ডিচেরী গিয়ে সাধনা করার দিকে, অন্য দিকটা রয়েছে খালি, শূন্য। সত্তার কাঁটা ঝুঁকেছে সেইদিকে ওজন যেদিকে বেশি। অন্য আর সবদিক থেকে রুচিও গেছে চলে। এ যে কোন যাদুবলে জানিনা। কি বিতৃষ্ণা সবেতে! গান যে আমার জীবনের জীবন, সেই গানেতেও কী বিরাগ। কেউ গাইতে বলে পাছে, পালিয়ে বেড়াই সেই সম্ভাবনার সামনে পড়ার ভয়ে। আমার এ আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে যায়। কেন না গান যে শুধু আমি ভালোবাসি তাই নয়, গাইতেও অসম্ভব ভালোবাসতাম, এবং আমাকে গান গাওয়ানোর জন্যে কখনো

কোন সাধ্যসাধনার দরকার করেনি। সেই গান আমার ভিতর থেকে এমনই সরে গেছে যে, আর যে কখনো গাইব তা আর সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে না। এতই অর্থহীন বিস্বাদে ভরা সবকিছু ঠেকছে। মনে হচ্ছে, অল্পদিনের জন্যেও যদি একবার পণ্ডিচেরী গিয়ে থাকতে পারতাম তবে নিজেকে না হয় দেখতাম ওখানকার পরিবেশে কেমন থাকি, যদিও ভিতরে ভিতরে অনুভব করছি আমি পণ্ডিচেরী চলে যাচ্ছি, অথচ অনুমতির জন্যে এখনো পত্র লেখা হয় নি। নলিনীবাবু সেই যে লিখেছিলেন, 'আপনি নিজের সঙ্গে আরো বোঝাপড়া করিয়া দেখিবেন'—আমি আজো বোঝাপড়া করেই চলেছি। শেষে আর থাকতে না পেরে নলিনীবাবুকে আবার পত্র লিখলাম যে, আমি গিয়ে কিছুদিন অন্ততঃ থাকতে পারি কিনা এবং তার জন্যে একটা ছোটখাটো বাড়ি পাওয়া যেতে পারে কি না।

এই তাঁর দ্বিতীয় পত্র —

শ্রীমতী সাহানাদেবী সমীপে—

আপনি একবার এখানে আসিতে পারেন—মা অনুমতি দিলেন। তবে কয়েকদিনের জন্যে মাত্র—মায়ের আশীর্বাদ লইয়া যাইতে। বলা বাহুল্য এখানে যে কয়দিন থাকিবেন তাহার বন্দোবস্ত নিজেরই করিতে হইবে। হোটেলে থাকিতে আশাকরি আপনার কোনো অসুবিধা হইবে না।

যখন আপনার সুবিধা হয় তখনই আসিবেন—তবে পূজার সময় ভিড় হইবার সম্ভাবনা, তাহার পরে আসিলেই ভাল হয়। আশাকরি কুশলে আছেন।

9, Rue de la Marine —শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

Pondicherey, Sept, 22 1928.

নলিনীবাবুর দ্বিতীয় পত্রের সঙ্গে আমি যা পেলাম তা যে কত বড় পাওয়া তাই কেবল মনে হচ্ছে! আমার এতদিনের চাওয়া, এতদিনের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। এ জীবন কী মহা সুযোগ পেল! আশাতীত কোন্ আশ্বাস সব কিছুর উপর তার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। সব যেন কেমন অন্যরকম ঠেকছে। তাঁর চিঠিতে 'মা অনুমতি দিলেন' আর 'মায়ের আশীর্বাদ লইয়া যাইতে'—এই দুটি কথা জপের মত আমার ভিতরে অনবরত চলেছে, এই দুটি কথা যেন আমার ভবিষ্যৎকে একটি মহান পরিণতির দিকে এনে দিল আর এই দুটি কথার মধ্যে দিয়ে মা চলে এলেন আমার একেবারে কাছে—কী আপনজনই যে মাকে মনে হতে লাগল। এই 'আপন' বোধের সঙ্গে পারিবারিক বা জাগতিক কোনো 'আপন' বোধের তুলনাই হয় না। এর জাতই আলাদা। জীবনে কাউকে

কখনো এমনতর, এত আপন মনে হয়নি। বোধকরি ভগবান ভিন্ন এমন ক'রে আপনার আর কেউই হতে পারে না। কেবলই মনে হচ্ছে, এই মা হচ্ছেন সেই মা, শ্রীঅরবিন্দের 'দি মাদার' বইতে যাঁর বিষয় পড়েছি, সেই মাকে আমি প্রণাম করতে যাচ্ছি, সেই মা আমার মাথায় হাত রাখবেন—এ যে কি একটা অভাবনীয় ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছি! যত ভাবছি তত যেন কেমন একটা শিহরণ অনুভব করছি, আর বুকের মধ্যে কি যেন কেবল ঠেলে ঠেলে উঠছে, চোখে জলও রাখতে পারছি না। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তর বার বার সেই মায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

মা এলেন এ জীবনে। খুলে গেল আমার আরেকদিকের দুয়ার।

পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম। নলিনীবাবু লিখেছেন, পূজার পরে গেলেই ভালো। আমিও স্থির করলাম নভেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দেন শুনেছি, সেই সময়েই যাব। তবে নলিনীবাবুর চিঠিতে আমি দর্শন পাব কি না সে সম্বন্ধে দেখলাম কোনো উল্লেখ নেই। তাই শ্রীঅরবিন্দ দর্শন পাব কিনা বোঝা গেল না। মায়ের কাছে যাচ্ছি, তাঁর আশীর্বাদ পাচ্ছি, এতেই আমার মন ভরে আছে। কলকাতা আর মোটেই ভালো লাগছিল না। মনে ভাবলাম পণ্ডিচেরীতে যখন এখুনি যাওয়া হচ্ছে না, তা আরো খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে বাঙ্গালোরে গিয়ে না হয় অপেক্ষা করা যাক, সময় হলে সেখান থেকে যাওয়া যাবে।

বাঙ্গালোর খুব সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর জায়গা, বহুকাল থেকেই দেশটা দেখার ইচ্ছে জাগত মনে। তাই এবার সুযোগ গ্রহণ করে বাঙ্গালোর যাওয়া স্থির করলাম। তবে স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে। জাহাজে মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরে বাঙ্গালোর যাবো। ইউরোপগামী সুবৃহৎ 'এস্ এস্ মালবরো নামক জাহাজের প্রথমশ্রেণীতে আমার জন্যে 'প্যাসেজ' বুক করা হল। অনেকেই ভয় দেখালেন যে জাহাজের কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার নিয়ম নেই, শুধু একটি 'হুক' মত দিয়ে আটকে রাখা চলে বটে, কিন্তু বাইরে থেকে তা খোলা যায়। কেননা জাহাজে কোনো বিপদাপদের সম্ভাবনা হলে দরজা খুলে যাতে যাত্রীদের জাগিয়ে দেওয়া যায় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। এও শুনলাম যে জাহাজের ক্যাপটেনরা নাকি অনেক সময় নেশা করে যাত্রীদের বিরক্ত করে থাকে। আমি এ পথে অনভিজ্ঞ যাত্রী তার উপর একা—ইত্যাদি। যাইহোক, ১৯২৮ সালের ২৩শে অক্টোবর বিকেল পাঁচটার সময় কলকাতা খিদিরপুর ডক্ থেকে জাহাজে উঠলাম।

পাটনা থেকে আমার দাদা সুধাংশু মোহন গুপ্ত দু'একদিনের জন্যে কলকাতা এসেছিলেন। আমি যাবার আগে তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি বললেন, 'কিরে তুই কবে ফিরে আসছিস ?' আমি বললাম, 'আর ফিরব বলে ত মনে হয় না।' দাদা বললেন, 'তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় না যে তুই এখুনি একেবারে থেকে যেতে পারবি।' আমি আবার বললাম, 'আমার কিন্তু মনে হয় আমি আর ফিরব না'—জানি না কেন বলেছিলাম, কেন না পণ্ডিচেরীতে একেবারে থেকে যাবার কোন আশ্বাস তখনো পাইনি। কিন্তু আমার ভিতর বলছে, আমি ফিরব না। চলেছি চিরদিনের মত, চলেছি আমার গন্তব্যস্থলে। পণ্ডিচেরীর মধ্যেই আমার চেতনা তখন বাস করছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, প্রিয়জন কারো কথাই মনে আসছে না, সব কোথায় সরে গেছে—যাকে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম, সেও তখন সেখানে আর নেই, মুছে গেছে কখন চেতনা থেকে। মনে হত সর্বক্ষণ আমায় যেন কে ধারণ করে আছে আর তুলে ধরেছে অন্য এক দিকে যেখানে ছিলাম সেখানে আর আমি নেই, সরে গেছি অন্য কোথাও।

খিদিরপুর ডক্ থেকে নির্দ্ধারিত সময়ে আত্মীয় বন্ধু যাঁরা আমায় তুলে দিতে এসেছিলেন, বিদায় নিলেন। আমি তখনো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে। বাংলা দেশের কূল ছেড়ে ভাসলাম, চেয়ে রইলাম সেই কূলের দিকে। জাহাজ যখন সেখান থেকে ধীরে ধীরে মাঝগঙ্গার দিকে সরে যাচ্ছে হঠাৎ দেখি আপন মনে মৃদু স্বরে কখন গান ধরেছি—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি—

জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে নোঙর করল গঙ্গার মাঝখানে। জলপথে এই যাত্রাই আমার পণ্ডিচেরীর পথে প্রথম পদক্ষেপ। যাঁদের কাণ্ডারী করে ভাসলাম জন্মভূমির কূল ছেড়ে, সেই শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে চললাম কেবিনের দিকে। গিয়ে দেখি, সে কেবিনে আমার নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নেই। অতএব পুরো কেবিনটাই আমার একার দখলে জেনে বেশ আরাম বোধ হল। খানিকক্ষণ সেই কামরায় শুদ্ধ হয়ে বসে রইলাম, পরে উঠে যখন ডেকে গেলাম তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে উঠেছে। চারিদিক শান্ত স্থির। রাত্রের নিস্তব্ধ পদধ্বনির আশায় সন্ধ্যা যেন কান পেতে আছে। অত বড় ডেক জনশূন্য, তারই একধারে একটি ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। দেহে মনে তখন কিসের ছোঁওয়া যেন লেগেছে—কোন্ সূচনার

নিবিড় স্পর্শে মুদে এল দু'নয়ন—সেই অনুভূতির অতলে আমি তলিয়ে গেলাম। তন্ময়তা ভাঙল—কেউ ডাকল, ডিনারের (রাতের খাবার) সময় হয়েছে, খাবার জন্যে। মস্ত বড় খাবার ঘর, গোল গোল অনেক টেবিল সুন্দর করে সাজান। তারই একটাতে গিয়ে বসলাম। সামনেই 'মেনু' রয়েছে, তা থেকে যা যা ইচ্ছে হয় বললে খানসামারা সেসব এনে হাজির করে। রাতের এই খাবার পর্বের পরে বসবার ঘরে নাচ গান শুরু হলে আমি নিজের কেবিনে ফিরে গেলাম।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙল যখন বিছানায় চা দিয়ে গেল—চা, পাউরুটি টোস্ট আর একটা আপেল। ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম জাহাজ চলছে, রাত্রে না ভোরের দিকে কখন ছেড়েছে তা জানতেও পারিনি। তৈরী হয়ে নিয়ে ডেকে গেলাম, গিয়ে দেখি তখনো জাহাজ সমুদ্রে পড়েনি। দুই তীর বেশ দেখা যাচ্ছে যদিও গঙ্গা অনেক চওড়া হয়ে এসেছে। বসে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। দেখছি ধীরে ধীরে দুইদিকের দুই তীর ক্রমশ: দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে আর অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটা জায়গায় এসে দেখা গেল গঙ্গা ভাগ হয়ে দুদিকে চলেছে দেখাচ্ছে যেন 'V'-এর মতন। আমাদের জাহাজ এরই একটির মুখে ঘুরে চলল। জলের বিস্তৃতি ক্রমে এতই বেড়ে গেল যে, তটরেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল—তারপর জল, শুধু জল আর জল! তরঙ্গ দেখে বোঝা যাচ্ছে সাগর দূরে নয়—আমার ভিতর দুলে উঠল সাগরে ভাসার আনন্দে। এক সময় দেখি জাহাজ খুব দুলতে শুরু করেছে। ঢেউয়ের কলোচ্ছ্বাসে আর জলের অন্যরকম রং দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে, সাগর সঙ্গমে এসে পড়েছি। যখন দেখলাম সত্যিই অকূলবারিধির নীল বক্ষে চলেছি ভেসে, তখন সে যে কী হল, মনে হল আমিও যেন আপন সীমা হারিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি! মনে হল—

আজি অপার ওই সে সত্তায় মোর
তনু মন হল লয়,
আজি তারি সুরে মোর জীবনজলধি—
শত তরঙ্গে বয়।
কূল নাই আমি অকূলধারা
নিমেষে নিমেষে রভসে হারা।
মোর মাঝে আজি চন্দ্র তারা
কিরণ পরশ পায়।

আজি অপার সে ওই সত্তায় মোর
তনু মন ডুবে যায়।

আজো মনে আছে সেদিনের সেই অদ্ভুত অনুভূতির রোমাঞ্চের কথা। তারপর আরম্ভ হল সমুদ্রপীড়া—সি সিক্‌নেস্—সে যে কী নিদারুণ কষ্টকর জিনিস—মাথা তোলে কার সাধ্য, তুলতে গেলেই মনে হয় সব উঠে আসবে। দুপুর থেকে সেই যে বিছানায় পড়লাম, ওই এক অবস্থায় কাটল সেইদিন আর সে রাত। খাটের সঙ্গে লাগানো একটি ঠোঙা মতন জিনিস দেখেছিলাম, তখন বুঝিনি কি উদ্দেশ্যে ওটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার সেটা বোধগম্য হল। পরের দিন সকালে জাহাজের পোর্টেস এসে তাসের প্যাকেটের মতন কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট দিয়ে গেল। খুলে দেখি আইসক্রীম, প্যাকেটে মোড়া এরকম আইসক্রীম এই প্রথম দেখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ঠাণ্ডা দ্রব্য পেটে পড়ায় বেশ সুস্থ বোধ হতে লাগল। উঠলাম, দেখি মাথা আর ঘুরছে না। কেবিনের পোর্ট-হোল দিয়ে এবার উঁকি দিলাম—তাকিয়ে মনে হল নিচে সমুদ্রের জলে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, এত ঘোর নীল জলের রং দেখাচ্ছে! তাড়াতাড়ি চলে গেলাম উপরে ডেক্-এ। গিয়ে দেখি জাহাজ একবার উঠছে তরঙ্গের মাথায়, আবার নামছে। এই ওঠা-নামার সময় একবার সে এদিকে কাত হচ্ছে আরেকবার অন্য দিকে—কী উদ্দাম, কী অসম্ভব প্রবল এই সমুদ্র, কী তার শক্তি!

এই জাহাজের ডেক থেকে দেখেছিলাম এক অবিস্মরণীয় সূর্যোদয়—মনে এতই রেখাপাত করেছিল যে আজো সে তার অপরূপ মহিমায় আমার স্মৃতির পটে অঙ্কিত হয়ে আছে। বর্ণনা করতে পারব কি না জানি না। আমার মনের সে ভাব হয়ত বা খানিকটা ব্যক্ত করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি লাইনে—

আমি কী হেরিলাম নয়ন মেলে
আমার নয়ন ভুলানো এলে

সবে তখন ভোর। কবির লাইন তুলে দিয়েই বলি—'প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি উঠল বেজে যেই'—দূরে দিগন্তের পানে চেয়ে আছি। যেদিকে তাকাই মনে হচ্ছে আকাশ জল পৃথক করে কিছু আর বোঝা যাচ্ছে না, একেবারে এক হয়ে মিশে যেন একাকার হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে শুধু ধূসর অনন্ত ধূ ধূ—সেই বিশাল, অসীম, উদার অন্তহীন পরিধির মাঝে যতদূর দৃষ্টি যায় তার শেষ সীমার একদিকে হঠাৎ দেখা গেল সরু লাল একটি রেখা।

বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল। ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে সেই লাল রেখা লাল্‌চে আভায় পরিণতি লাভ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল পূর্ব দিকচক্রবালের ললাট রাঙিয়ে। তারপর সেখানে শুরু হল রঙের খেলা, ফুটে উঠতে লাগল কী অভাবনীয় সব রঙের সমাবেশ আর তার সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে তার পটপরিবর্তন। মনে হচ্ছিল, কোন মহাশিল্পীর পটে আঁকা স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অপরূপ একেকটা দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করে এক অপার রহস্য সৃষ্টি করে চলেছে। নব নব বর্ণজাল রচনা করে সূর্যদেব এলেন দৃষ্টি পথে। জল থেকে সবে তিনি মাথা তুলেছেন আর নিমেষে আকাশ আর জল পৃথক হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। নিজের মধ্যে আলোককে ধারণ করে ধীরে ধীরে উঠে এলেন আলোর আঁধার সাগরের বক্ষ হতে যেন। তারপর সোনালী দীপ্তিমণ্ডিত স্বর্ণ-সত্তা আলো ঢেলে দিতে দিতে চললেন তাঁর অনন্ত পথ-পরিক্রমায়—সে যে কী দেখেছি, চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। চারিদিকে সেই ধূসর অনন্তের মাঝে বসে আমি দেখছি শাশ্বত রূপৈশ্বর্যের এক অনুপম উদ্ভাস।

ঘুরে ফিরে মনে জাগছে—যিনি আমাকে এত দিচ্ছেন, শেখাচ্ছেন এমনভাবে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে, দেখাচ্ছেন কত নব নব দৃষ্টি দিয়ে, অনুভূতি অভিজ্ঞতা দিয়ে, যে জীবন এতখানি গড়ে তুলেছেন, ভরে তুলেছেন করুণা দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, আশীর্বাদ দিয়ে, সে জীবন কখনোই বৃথা যেতে পারে না, পারে না ব্যর্থ হতে—আশ্রয় আমার মিলবেই তাঁর চরণতলে।

২৯শে অক্টোবর, চারদিনের দিন, বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ হবে, মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজ থেকে নামলাম। একটি বাঙালী ডাক্তার আমায় নিতে এলেন, নামটি তাঁর স্মরণে নেই। আমার অপরিচিত হলেও আমার বিষয় যিনি এঁকে লিখেছিলেন তিনি এঁর বিশেষ পরিচিত। তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করা হলে তিনি তাঁর মোটরে আমায় সেণ্ট্রাল স্টেশনে নিয়ে এসে বাঙ্গালোরের গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। গাড়ি ছাড়ল দুটোর সময়। সন্ধ্যা নাগাদ বাঙ্গালোরে পৌঁছে গেলাম। যাঁদের বাড়িতে গিয়ে উঠবার কথা, সেই দত্তদম্পতি আমায় নিতে স্টেশনে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গেলাম।

বাঙ্গালোরে তখন রীতিমত ঠাণ্ডা। শহরটি ভারি সুন্দর। বেশ ছড়ানো মত। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি যাঁদের অতিথি হয়েছিলাম, তাঁরা ক্যানটন মেন্টের দিকে থাকতেন। সেদিকটা বেশ ফাঁকা। প্রায় বাড়িতেই চারপাশে

খানিকটা করে জমি আছে। সামনে বাগানে বেশ সুন্দর সুন্দর সব ফুল ফুটে থাকতে দেখা যায়, বিশেষ করে গোলাপ ফুল—কী সুন্দর গোলাপ যে বাঙ্গালোরের! এদেশের ফুল, সব্জী সবই বিখ্যাত, নানান দেশে চালান যায়। বড় চমৎকার মানুষ এই দত্তদম্পতি যাঁদের কাছে আমি ছিলাম। এঁদের সংসারটি ছিল ছোটখাটো। ছিলাম আরামে, যত্নের অবধি ছিল না। ভাবলাম বেশ চুপচাপ থাকা যাবে—চুপচাপ থাকা তখন একান্ত দরকার বোধ করছি। যে পথে চলেছি, কোনো রকম গোলমাল বা হৈ-চৈ সে পথে চলার অন্তরায় মনে হচ্ছে। তা ছাড়া সত্যিই আমি পারছিলাম না তখন আর কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে বা থাকতে, কেবল ইচ্ছে হত চলে যেতে তার মাঝে যা আমাকে অবিরত টানছে। কিন্তু যা ভাবা যায় তা সব সময় হয় না। দেখি ক্রমাগত লোকজন আসছে দেখা করতে, বেশির ভাগ গান গাইবার আমন্ত্রণ নিয়ে। পণ্ডিচেরী যাবার মুখে এসব আর একেবারেই ভাল লাগছে না, অথচ ঘটনাচক্রে এমনই ঘটছে যে প্রত্যাখ্যান করার শত চেষ্টা করেও কিছুতেই যেন কৃতকার্য হতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত যেতেই হচ্ছে। আমার ভিতর বাহির সব সত্তা ব্যগ্র উন্মুখ পণ্ডিচেরীর জন্যে। সর্বক্ষণ তখন সে পণ্ডিচেরী মুখী হয়ে থাকতে চাইছে, অন্য আর কিছুতেই কোনো উৎসাহ কেউ দিতেও পারছে না, নিজেও বোধ করছি না, তবু করতে হচ্ছে জোর করে সকল ইচ্ছের বিরুদ্ধে! এ অবস্থার কষ্ট যেন শরীরের ব্যাধির যন্ত্রণার চেয়েও দুঃসহ।

আমার নিজের জ্যেঠতুতো বোন লেডি অ্যালরিয়ান ব্যানার্জি (সার কে.জি. গুপ্তের তৃতীয়কন্যা) তখন ওখানে। বহুকাল তিনি বাঙ্গালোরে বসবাস করছেন —তাঁর স্বামী, যখন মহীশূর স্টেটের দেওয়ান ছিলেন তখন থেকেই। আমি ওখানে গিয়েছি শুনে রোজই একবার করে হয় দেখা করতে আসতেন, নয়ত গাড়ি পাঠাতেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে। তাঁর একটুও ইচ্ছে নয় যে, আমি গান বাজনা এ সব ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত পণ্ডিচেরী চলে যাই। কেবলই বোঝাতেন, 'এখুনি, এত শীগগীর সব ছেড়ে তুই পণ্ডিচেরী যাবি কেন? সংসার না করতে চাস না হয় না-ই কর'ল, কিন্তু আরো ত কত কাজ করার আছে।— কোনো কিছুই ভাবব না, কারো দিকে তাকাব না, সব ফেলে শুধু একমাত্র নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকব। নিজের কথাই ভাবব, এ তো স্বার্থপরতা। আরো বয়স হোক তখন না হয় যাবি। গানের এমন বিধিদত্ত ক্ষমতা তোর সব তো নষ্ট হয়ে যাবে ও জীবন নিলে—ইত্যাদি।' এঁরা যে সোসাইটির মানুষ, আধ্যাত্মিকতার বিষয় এঁদের কোনো ধারণাই নেই, সত্যিই কিছু বোঝেন না।

সাংসারিক জীবন ছেড়ে যাওয়া মানেই এঁদের কাছে 'লস্ট টু দি ওয়ার্ল্ড'—কাজেই কিছু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়। ওখানকার শিক্ষিত, কালচার্ড সম্প্রদায়, ইউরোপীয়ান মহল ইত্যাদি নানা জায়গায় এঁর বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। আমি হয়ত যাঁদের তেমন, আমল দিইনি এমন কেউ কেউ এঁর কাছে গিয়ে এঁকে ধরতেন, ইনি তাঁদের হয়ে এমন করে আমায় অনুরোধ করতেন যে তখন আর না গিয়ে উপায় থাকত না।

বিশেষ কারো অনুরোধে একটি ইউরোপীয়ান মহিলাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নাচ শেখাবার ভার পড়ল। শুনলাম একটা কি অনুষ্ঠান হচ্ছে তার মধ্যে এই নাচটিকেও তাঁরা তালিকাভুক্ত করতে চান। বলা বাহুল্য মহিলাটির নাচের সঙ্গে গানও আমাকেই গাইতে হবে। এই তাঁদের অনুরোধ। মহা বিপদে পড়া গেল। নাচের আমি তেমন কিছুই জানি না। শান্তিনিকেতনে তখন সবে নাচ শুরু হয়েছে। টেকনিক ইত্যাদির শিক্ষা তখনো কারো তেমন হয়নি। তা ছাড়া আমার সব আগ্রহের কেন্দ্র তখন শুধু পণ্ডিচেরী—নানা অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভূতি উপলব্ধির মাঝে পাচ্ছি অবিরত উপরের আলো। পাচ্ছি এমন বস্তু যার কাছে আর কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না—এই অবস্থায় গিয়ে নাচ গান শেখাতে হবে, যেতে হবে এমন জায়গায়, যেখানে যাবার কোনো তাগিদই কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। বাইরে কাউকে কিছু বলতেও পারছি না, কিন্তু ভিতরে বয়ে বেড়াচ্ছি দারুণ অনিচ্ছা। হঠাৎ একদিন মনে হল—কেনই বা এসবের মূল্য দিচ্ছি? কে আমার কী ক্ষতি করতে পারে? ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এলো অন্য ভাব। নাচ শেখালাম—'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানটির সঙ্গে, গানটিও স্টেজে বসে গেয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু এ যেন শেষ হবার নয়। নানা মহিলা সমিতি, টাটা ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতি বহু জায়গা থেকে যখন দফে দফে গানের আয়োজন আরম্ভ হল, তখন একদিন ঠিক করলাম গা ঢাকা দিতেই হবে। দত্তজায়াকে বললাম, কেউ দেখা করতে এলে বলবেন, কোনো বিশেষ কারণে এখন দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কেউ যেন কিছু মনে না করেন।

বাঙ্গালোরের কাছেই 'নন্দী হিল' বলে ছোট একটি পাহাড় আছে, দেখবার মতন। আগেই আমাদের সেখানে বেড়াতে যাবার কথা হচ্ছিল। শ্রীমতী দত্তকে বলতে, তিনি তখুনি ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমি ও তাঁর দু একটি বন্ধুসহ তাঁর সঙ্গে সেখানে চলে গেলাম। ওখানে যাবার আগে নলিনীবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের দর্শন আমি পাব কি না তাই জানতে

চেয়ে। কেননা তাঁর পূর্বের পত্রে সেবিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। তাঁর চিঠি পেলাম। তিনি লিখছেন—

শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী সমীপে—

আশা করি এদিকে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আপনার এখানে থাকার জন্যে যতদূর যা সুবিধা হয় তার চেষ্টা দেখিতেছি।

২৪শে নভেম্বর যে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাইবেন একথা কি আপনাকে আগে জানাই নাই?

ঠিক কবে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন সময় মত জানাইতে ভুলিবেন না। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

Pondicherry শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বাঙ্গালোরের ভিড়ের পরে নন্দী পাহাড়ে কী গভীর শান্তি মনে হল। তার উপর শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাবো এ হেন খবরে ভিতরটা হয়ে থাকল অন্য সুরে বাঁধা—দেখছি তারই স্বপ্ন। ১৯০৮ সালে বোমার মামলার পরে শ্রীঅরবিন্দ যখন জেল থেকে বের হয়ে আমার মামা চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে আসেন, তখন তাঁকে অল্পক্ষণের জন্যে দেখেছিলাম, কিন্তু সে চেহারা খুব স্পষ্ট মনে নেই, শুধু একটু একটু মনে আছে—রোগা শ্যামবর্ণ আবছা একটি সৌম্যমূর্তি। বার বার এই কথাই মনে জাগছে, শ্রীঅরবিন্দ, মা দুজনের দর্শন পাবো, আশীর্বাদ পাবো, স্পর্শ পাবো—তাঁদের চরণধূলা মাথায় নিয়ে আরম্ভ করব সম্পূর্ণ নতুন এক অজানা জীবন—সে জীবনের কথা ভাবতে দুটি চোখ ধীরে ধীরে বুজে এল, আমি চলে গেলাম যেন কোথায়!

নন্দী হিলের মাথায় শুধু বড় বড় দুটি অতিথি আলয় (গেস্টহাউস) ছাড়া আর কিছু নেই। তার একটিতে আমরা আশ্রয় নিলাম। আমরা কজন ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই তখন সে পাহাড়ে। যেমন সুন্দর দৃশ্য, তেমনি নির্জন—যা আমি খুঁজছিলাম তাই। নিচের সমতলভূমি পাহাড়ের চারদিক থেকেই বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। খাবার-দাবার ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না, সবই আনিয়ে নিতে হয় নিচে থেকে। এই পাহাড়ে যাঁরা পারেন হেঁটেই ওপরে ওঠেন, না পারলে বেতের চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারের সঙ্গে দুদিকে লম্বা দুটো বাঁশ বেঁধে কুলিরা বহন করে নিয়ে যায়। মুসলমান আমলের কোনো সুলতান কিম্বা নবাবের কিছু ওখানে ছিল তারই ধ্বংসাবশেষ দেখালো গাইড, নাম ধাম মনে নেই। ওখানে তিন-চার দিন ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু ছাড়া সমস্তক্ষণই থাকতাম নিজের মনে একা। পণ্ডিচেরী যাবার দিন এগিয়ে আসছে।

নিজেকে তৈরী করে নেবার জন্তে একটা সচেষ্টতা সর্বদাই লেগে থাকত। কেবলি মনে হত এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হেলায় না হারাই, ওঁরা যা দেন তা যেন ঠিকমত গ্রহণ করতে পারি, নিজেকে যেন নিবেদন করে দিতে পারি তাঁদের চরণে। 'The mother' বইয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন মায়ের কাছে 'open' করার কথা, তখন পড়ে সব বুঝতে না পারলেও প্রার্থনা জাগত যেন খুলে ধরতে পারি শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন। জাহাজেই বোধ হয় একদিন ধ্যানের সময় আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে, আমার ভিতরটা যেন নিজেকে একেবারে সটান খুলে দিয়েছে যে জিনিস উপর থেকে নামছে তার দিকে।

নন্দী পাহাড়ে একটা গুহা মতন দেখেছিলাম চলে যেতাম সেইখানে, গিয়ে প্রায়ই বসে থাকতাম। ধ্যানে অনেক কিছু উপলব্ধি করি নন্দীহিলের এইখানে এই গুহায়। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যে যার ঘরে শুতে গেলে আমি বেরিয়ে পড়তাম। কী অনন্ত আঁধার, অন্ধকারের অনন্ত বাহু যেন শূন্যকে আলিঙ্গন করে আছে, রাত্রি সমাধিমগ্ন—একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে জমে আছে—আমার ভিতর এর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে হয়ে যেত স্থির। অনুভব করতাম ভগবানের অস্তিত্ব ওতপ্রোত সব কিছুতে, সর্বঘটে। উপলব্ধি হত আমি তাঁর মধ্যে রয়েছি, আমার চেতনার মুখ ঘুরে গেছে তাঁর দিকে।

বাঙ্গালোরে ফিরে এলাম নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে। অনুভব হতে লাগল আমি মায়ের, চলেছি তাঁর দিকে, আর তাঁর খুব কাছে চলে এসেছি। মনে হতে লাগল পণ্ডিচেরীর আশ্রমেই আমি যাচ্ছি। অন্য কোথাও নয়, আর আমিও আশ্রমেরই। এই অনুভূতি আমাকে একটা বিশেষ অবস্থায় এনে দিল। নলিনীবাবুকে এসব নানা অনুভূতি ইত্যাদির বিষয় মাকে জানাতে লিখলাম, এবং জানতে চাইলাম এসব সত্য কিনা। এই চিঠি লেখার দুদিন পরে আমি রাত্রে একদিন শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম। দেখলাম তিনি আসছেন হেঁটে সবুজ ঘাসের জমির উপর দিয়ে। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। প্রণাম করে তাঁর দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'আমার পণ্ডিচেরী থাকার কি হল?' তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন ও পরে বললেন—'পণ্ডিচেরী? পণ্ডিচেরী এখনই কেন? আরো কিছুকাল গান টান কর না?' উত্তর শুনে আমার মনে হল আমি যেন একেবারে ভেঙে পড়লাম। কাতরকণ্ঠে বললাম,—'গান? গান আমি তো আর করতে পারব না!'—তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন,—

'পণ্ডিচেরী তোর হয়ে গেছে, কাল চিঠি পাবি।'—এই দর্শন হয় আমার ১৪ তারিখে রাত্রে। পরের দিন নলিনীবাবুর এই চিঠিখানা পাই—

শ্রীমতী সাহানা দেবী সমীপে—

আপনার পত্রখানা পাইলাম। মাকে পড়িয়া সব শুনাইয়াছি। তিনি বলিলেন আপনার যেসব অনুভূতি হইয়াছে, সবই সত্য, কোনোটাই ভুল বা কল্পনামাত্র নয়। এখানে থাকার সম্বন্ধে যাহা আপনি ভাবিয়াছেন তাহাও সত্য। আশ্রমের মধ্যেই আপনার জন্যে ঘর স্থির হইয়াছে। তবে বিছানা আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে আশাকরি। খাটের প্রয়োজন হইবে তাহাও অর্ডার দিলাম—তৈয়ারী খাট এখানে পাওয়া যায় না, দাম বারো টাকা পড়িবে। এক কথা এই তবে, আশ্রমের খাদ্য আপনার পছন্দ হইবে কি না—আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

আপনার 'engagement' যা বলিলেন, এখানে আপনি অসিলে আপনার নিকট সব শুনিয়া ইতিকর্তব্য স্থির করা যাইবে।

আপনি লিখিয়াছেন এখানে ২১শে সন্ধ্যায় আসিয়া পৌছিবেন। কিন্তু সন্ধ্যায় তো এখানে কোনো গাড়ি নাই। এক আছে তিন কি সাড়ে-তিনটায়, আর একটা আছে রাত্রি এগারটায়। মাদ্রাজ হইতে সচরাচর সকলে আসে আরেকটা গাড়িতে—সেটা ভোর ৫টায় এখানে আসিয়া পৌছে। কারণ এটায় থ্রু-ক্যারেজ আছে, নামতে উঠতে হয় না। কলিকাতা হইতে ২৪শে উপলক্ষে আরও ২।৪ জন আসিতেছেন—সুরেশ চক্রবর্তীও। যদি সময়মত খবর পাই তবে আপনাকে জানাইব কবে তাঁহারা মাদ্রাজে পৌছিবেন।

—শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত

বাঙ্গালোর থেকে পণ্ডিচেরী রওনা হই ১৯২৮ সালের ২১শে নভেম্বর, দুপুরের ট্রেনে। মাদ্রাজ এসে এগ্‌মোর স্টেশনে রইলাম বাকি সময়টা। মনের সে কী অবস্থা—একদিকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের দর্শন পাবার আশার আশায় উৎফুল্ল উন্মুখ অন্তর,—অপরদিকে তাঁদের এত বড় সান্নিধ্যের সংস্পর্শে আসার অতিশয় আগ্রহের মাঝে চাপা উৎকণ্ঠার সঙ্গে উত্তেজনা মেশানো একটা ভাব। একদিকে—সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জীবন বরণের স্বপ্ন,—আর অপর দিকে একেবারে অন্য পরিবেশে গিয়া পড়ার উদ্বেগ। সব মিলিয়ে একটা কিসের চাপের মধ্যে রয়েছি যেন। রাত্রি সাড়ে-নয়টার সময় ছাড়ল পণ্ডিচেরীর গাড়ি। আমার ভিতরে সব শান্ত হয়ে গেছে কখন জানি না। রাত কেটে গেল ধ্যানের একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে। মাঝে

মাঝে তার ঘোর খানিকটা কেটে গেলেও আবার চলে যাচ্ছিলাম তারই গভীরে। পরের দিন ভোর পাঁচটায় গাড়ি এসে থামল পণ্ডিচেরী স্টেশনে। তখনো ভালো করে আলো হয়নি—শুকতারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে। কয়েকটা আলো কেবল স্টেশনে মিটমিট করে জ্বলছে।

পণ্ডিচেরীর পথ আমার ফুরালো—অতীত জীবনকে বিদায় দিয়ে নামলাম গাড়ি থেকে বাইশে নভেম্বর। উষার প্রথম পদসঞ্চারের সঙ্গে আমার পণ্ডিচেরীর জীবনউষাও পা বাড়ালো। চললাম আশ্রম অভিমুখে। শুরু হল নবজীবন-যাত্রা প্রভাতের নবীন আলোয়। আশ্রম থেকে দুজন সাধক স্টেশনে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের পিঠ অবধি লম্বা চুল। আমাকে একটি গাড়িতে তুলে দিয়ে আর সকলে সঙ্গে হেঁটে চললেন। পণ্ডিচেরীর এই গাড়িগুলিকে বলা হয় 'পুশ্'। মানুষে ঠেলা গাড়ি, পিছন দিক থেকে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যায়। তখনকার দিনের এই গাড়িগুলি অনেকটা কলকাতার সাবেককালের ফিটন গাড়ির মতন দেখতে ছিল, তার থেকে বরং আরও একটু বড় এবং উঁচুও। সামনে স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে হাতল শুদ্ধ একটি লোহার ডাণ্ডামত লাগানো, সওয়ারী এই হাতলটি ধরে ইচ্ছেমত গাড়ি ঘোরাতে ফেরাতে পারে।

আমায় আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে সাধকরা বলে গেলেন, নলিনীবাবু সাড়ে সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সে বাড়িতে এখন শ্রীমায়ের সেলাই হয়, সেই একতলা বাড়ির রাস্তার দিকের ঘরখানা আমার জন্যে রাখা হয়েছিল, সেইখানে উঠলাম। রাস্তার অপরদিকে সামনেই মা-শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়িতে থাকেন, সেই বাড়ি—এই বাড়িটিকে আশ্রমের 'মেনবিল্ডিং' বলা হয়ে থাকে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে মায়ের ঘরের জানালাগুলি দেখা যায়। ঘর দেখে আমি ত অবাক। কোথায় ভেবেছিলাম খড়ের না হয় খোলার চালের ঘরে বসে হয়ত বা কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, তা না হয়ে তার বদলে পেলাম চারিদিক খোলা এমন সুন্দর পাকা ঘর! ঘরে রয়েছে একটি খাট, টেবিল, চেয়ার এবং স্ট্যাণ্ডের উপর একটি কাঁচের আলমারি আর খাটের উপর বিছানো একখানা সতরঞ্চি। শুনলাম মা নাকি উপর থেকে এই সতরঞ্চিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্যে তাঁর এতখানি বিবেচনা কী যে স্পর্শ করল, কি যেন পেলাম। চুপ করে বসে আছি, ভাবছি তাঁর কথা। নলিনীবাবু এলেন, সঙ্গে দেখলাম আরেকটি ভদ্রলোক, লম্বা চুল দাড়িগোঁফ রয়েছে, হাসিখুশিতে ভরা, স্নিগ্ধ চাহনি, মনে হল কত কাছের মানুষ। কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকটি খুব রসিকতাপ্রিয়—সব কথাতেই রসিকতা করা তাঁর কথাবার্তায়

একটা ধরন যেন। অল্প কয়েকটি কথাই বললেন, কিন্তু ভারি ভালো লাগল। আলাপ করিয়ে দিলেন 'অমৃত' বলে। নলিনীবাবুর নাম আগেই শুনেছি বিশেষ করে প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অজানা ছিল না। তবে আমার ধারণার সঙ্গে তাঁর চেহারা কিছুই মিলল না। আমি ভেবেছিলাম নলিনীবাবু হবেন হয়ত হোমরাচোমরা দোহারা চেহারায় তারিকি গোছের কেউ একজন, দেখলাম শান্ত রোগামত মানুষটি, উন্নত ললাট, চোখের দৃষ্টি গভীর, অসাধারণ। প্রথমেই বললেন, মা সাড়ে নয়টার সময় দেখা করবেন। সাড়ে নয়টার একটু আগেই যেন যাই, তিনি গেটে উপস্থিত থাকবেন। বেশি কথা বলার লোক নন বোঝা গেল।

মা ডাকছেন, তিনি দেখা করবেন—সেই কথাই কেবল মনে হচ্ছে। তাঁর কাছে যাবো, তাঁকে দেখব এই একটা ভাবে মশগুল হয়ে আছি। ভিতরটা মেঘহীন আকাশের মত স্থির হয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। কারো সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল না। দরজায় কেউ ঘা দিল। খুলে দিলাম। প্রায় সাড়ে আটটা হবে তখন এনামেলের ডিসে ঢাকা খাবার নিয়ে একটি চাকরানী এল। খাবারের পরিমাণ দেখে আমি স্তম্ভিত। রীতিমত বড় বাটির এক বাটি ভরা 'ফস্কো'—ফরাসী দেশের কোকো জাতীয় একরকম পানীয়—'কোকোর চাইতে আরো অনেক বেশি সুস্বাদু, ছ-সাত স্লাইস পাঁউরুটি টোষ্ট, আর একটি কলা। একজনের জন্তে সকালে এতটা পরিমাণ খাবার খুব বেশি মনে হল। বন্দোবস্ত এত চমৎকার, কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না। ঘরে একটি জলের কুঁজো ও গেলাস রয়েছে। চাকরানী এসে ঘরের কাজ সব সেরে চলে গেল। এই রকম আরামে বসে সাধনা করব এ ত ভাবতেই পারিনি। সব এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে ভারি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। দরজার পিতলের হাতলটি পর্যন্ত ঝকঝক করছে। দেখবার মত। সব দেখেশুনে খুব ভালো লাগছিল। আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম এখানকার পরিবেশ অন্য কিছুতে পরিব্যাপ্ত, পার্থক্য পরিষ্কার ধরা যায়। এমন একটা শান্ত নীরবতা চারিদিকে বিরাজমান যে, মনকে স্বতই ভিতরদিকে ঘুরিয়ে দেয়। প্রথম দৃষ্টিতে সবকিছু সাধারণ বলে ঠেকলেও বোঝা যায় কোনো কিছুই ঠিক সাধারণ নয়, সাধারণের পেছনে রয়েছে একটা অসাধারণ কিছুর ছাপ। আশ্রমবাসীদের দেখলে মনে হয় একটা কিছু নিয়ে সবাই বেশ পরিতৃপ্ত, যেন ঠিক এ জগতে এঁরা বাস করেন না, এদের কারবার অন্য কোনো বস্তু নিয়ে।

সাড়ে নয়টা বাজবার একটু আগে গেলাম আশ্রমে, মা শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়িতে

থাকেন সেই বাড়িতে। সদর দরজায় নলিনীবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পথ দেখিয়ে। দোতলার একটি ঘরে মা দেখা করেন। সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে পা ফেলে উঠছি—এত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে যে একটু শব্দেই চমকে উঠছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম ডানদিকের ঘরে, ঢুকে দেখি তার শেষের দিকে একটি ছোট ঘর, পর্দা ফেলে রাখার জন্যে ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার মতন। সেই ঘরে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে মা বসে আছেন একটি সোফার উপরে, চরণ দুখানি খানিকটা যেন আসনপিঁড়ি হয়ে বসার ভঙ্গীতে গুটানো, ঠিক সামনে বরাবর মুখ করে নেই। বসে আছেন একটু আড় হয়ে, একপাশে সামান্য একটু ঘুরে ডান হাত দিয়ে মাথার কাপড়টি ধরে আছেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তাঁর দিকে চোখ পড়ল। দেখে প্রথমেই মনে হল—মানুষী তনু হলেও ইনি মানুষ নন, সামনে দেখছি মূর্ত এক দিব্যতাকে। দুটি হাত আমার আপনিই জোড় হয়ে এল। করজোড়ে সেই দিব্য প্রতিমার পানে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলাম। হেসে চোখ তুলে তাকালেন, কী যে সে হাসি, আর কী যে সে চাহনি—কোনো মানুষেরই যে তা সম্ভব নয়, এইটে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দিলাম শ্রীচরণে মাথা পেতে। তিনি মাথায় হাত রাখলেন, অন্তরের ভিতর দিয়ে সেই স্পর্শ কি যেন ঢেলে দিল, সব জুড়িয়ে গেল, গলে গেলাম আমি। হাত তুলে নিতে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। আবার মাথায় হাত দিলেন, দিতেই আমার দুচোখ আপনি বন্ধ হয়ে এল, চেতনা উপর দিকে দ্রুত উঠে যেতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে নামতে আরম্ভ করল শক্তি, মাথার ভিতর দিয়ে নেমে দেহের সব চক্রে সব জায়গায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছিল দেহ একটি আধার, সেই আধার এত ভরে উঠেছে যে, তা ক্রমশ ফুলে আঁট হয়ে শক্ত হয়ে আসছে—শরীর যেন বেড়ে যাচ্ছে (expand করছে) এই রকম লাগছিল।

মা একেকবার মাথায় হাত দিচ্ছেন টের পাচ্ছি, হয়ত বা তিনি চাইছিলেন যে আমি চোখ মেলি, কিন্তু পারছিলাম না। তাঁর প্রতি স্পর্শে আরো যেন তলিয়ে যাচ্ছি। শেষে মা আমার কপালের মাঝখানে একটি আঙুল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ রাখতেই চোখ মেলে চাইলাম। তখনো কিসের ঘোর লেগে আছে, চোখ কেবলি বুজে আসছে। হঠাৎ দেখি মা আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। মনে হল, সে দৃষ্টি মর্মভেদ করে চলে যাচ্ছে ভিতরে, আরো ভিতরে, একেবারে গভীরে অন্তরের অন্তস্থলে কিছু সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন—এমনই সে দৃষ্টি। ক্ষীণ দেহ, কিন্তু কী চোখ মায়ের, যেন সকল শক্তির উৎস। মায়ের চোখের কত রকম দৃষ্টি যে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলেন কিছু বলবার

আছে কি না। বলা হল, জীবনের অনেক কথাই, কী আগ্রহ নিয়ে যে সে সব শুনলেন। সমস্ত শুনে দুটি হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর নিজের বুকের মাঝে টেনে নিলেন ও শিরচুম্বন করলেন। সেই স্পর্শ ব্যক্ত করবার ভাষা আমার জানা নেই। একটু বাদে মুখটি আমার তুলে ধরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে স্বর্গীয় হাসি, দৃষ্টিতে পরম আশ্বাস—আমায় তিনি গ্রহণ করেছেন। আমার দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছি, দু'একটি অচেনা মুখ এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন, মাকে কেমন লাগল ইত্যাদি। কথা বলার অবস্থা ছিল না, তাই কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না। ঘরে এসে দরজায় খিল দিলাম। এত চোখের জল আমার কোথায় ছিল জানি না, সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সমস্তক্ষণ মনে হচ্ছে মাকে দেখছি—মায়ের তাকানো, হাসি, সব বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আর যখনি দেখছি আমি তাঁর বুকের মাঝে, সে যে কী অনুভূতি, তখনি আরো কান্নায় ভেঙে পড়ছি। সে কান্না কিসের কান্না জানি না। শুধু জানি এ কান্নায় মেলে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি।

পরের দিন বিকেল ৫টার সময় আমার ঘরে মা এলেন। আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন তিনি আসবেন। তাঁর জন্যে একটি চেয়ার সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলাম, এসে বসলেন। প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। মা আমায় গাইতে বললেন। আমি শুধু গলায় গাইলাম, মীরাবাঈয়ের একটি ভজন, 'ম্যা নে চাকর রাখো জী'। গান শুনে মা আরো একটি গাইতে বললেন। এমনি করে পর পর আমার মুখে চারটি মীরাবাঈয়ের ভজন সেদিন শুনলেন। যাবার আগে তাঁকে আবার প্রণাম করলাম। আদর করে সস্নেহে বলে গেলেন অসুবিধা কিছু হলে বা কোনো কিছুর দরকার থাকলে জানাতে যেন সঙ্কোচ না করি। মূর্তিমতী করুণা যেন! মনে হল যেন ভরে গেল সব।

কাল চব্বিশে নভেম্বর, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দেবেন। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি তাঁর কথা। তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা তখন থেকেই আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। আমাদের জীবনে তাঁর আসন তখনই পাতা হয়ে গেছে, তখন থেকেই অবনত শিরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের অঞ্জলি নিয়ে অন্তর তাঁকে বন্দনা করতে শিখেছে। শিখেছে তাঁর সম্মানের অর্ঘ্য সাজিয়ে তাঁকে পুজো দিতে। তখন থেকেই শুনেছি তিনি বিরাট পুরুষ, বিরাট আধার। শুনেছি তাঁর মহত্ত্বের কথা, অসামান্য চরিত্রের অশেষ গুণাবলীর কথা। তখন থেকেই জেনেছি মনীষীশ্রেষ্ঠ তিনি, অসাধারণের অসাধারণ—দেশভক্তির অনুপম নিদর্শন তিনি। আত্ম-

বলিদানের সুমহান দৃষ্টান্ত, মানবের পরমহিতৈষী বন্ধু। তিনি সকলের পরম পূজনীয়। পরে গুরুরূপে তিনি এলেন আমার জীবনে।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শন। আশ্রমের হাওয়া বদলে গেছে। দর্শন উপলক্ষে ভিড় জমছে। বাইরে থেকেও লোক সমাগম দেখা যাচ্ছে। আশ্রমবাসীদের সকলেরই চোখ, মুখ, আনন্দোজ্জ্বল, উদ্ভাসিত দর্শনের আগ্রহে, চেহারায় ফুটে উঠেছে আবেগঘন ভাব।

দোতলার যে ঘরে মা সকলের সাথে দেখা করেন, সেই ঘরে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। সকাল সাতটা থেকে দর্শন শুরু। উপরে উঠবার সিঁড়ির সামনে একটি বোর্ডে টাঙানো রয়েছে দর্শনার্থীদের নামের সঙ্গে তাঁদের দর্শনের সময় তালিকা। সিঁড়িতে উঠবার পিছন দিকের দরদালানে শতরঞ্চি বিছিয়ে রাখা হয়েছে, সেইখানে এসে যাঁদের ইচ্ছে বসে ধ্যান করছেন এবং যাঁর যখন দর্শনের সময় হচ্ছে তিনি ধীরপদে নীরবে উঠে যাচ্ছেন—একটি শব্দ নেই, একটি কথা নেই কারো মুখে। ধূপধুনা ও ফুলের গন্ধে ভরা এই নিবিড় নীরবতাপূর্ণ ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ, অন্তরের আস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলছে, প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে তার শিখা। পুষ্পমাল্যাদি অর্ঘ্য হাতে দর্শনার্থীরা যখন একে একে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপরে যাচ্ছেন, তখন মনে হচ্ছে বুঝি দেবালয়ে দেবদর্শনে যাচ্ছেন। দর্শন করে নেমে আসছেন মুখে এক অপূর্ব ভাব নিয়ে।

সময় এল আমার দর্শনে যাবার।

উঠলাম। তখন নিয়ম ছিল যে একজন যখন দর্শন করতে ভিতরে যাবেন, দর্শন শেষ হয়ে সে ফিরে না-আসা পর্যন্ত পরের জন অপেক্ষা করবে সিঁড়ির শেষ ধাপে। আমার আগের জন ভিতরে যেতেই আমি গিয়ে সেই ধাপে দাঁড়ালাম, দেখতে পেলাম সোজা সামনে বরাবর শ্রীঅরবিন্দ বসে আছেন একটি সোফার উপরে পিছন দিকে একটু হেলান দিয়ে—দেখলাম হিমালয় সম অটলতার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি যেন, বসে আছেন মহামহিমময়ের মহিমায়! গৌরকান্তি, পরিধানে গরদের শুভ্র ধুতি ও চাদর, বক্ষের আধখানা খোলা, মাথার কেশদাম ও শ্মশ্রুরাজি মিলিত হয়ে দেখাচ্ছে আবক্ষলম্বিত। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি কী শান্ত সমাহিত নয়নাভিরাম মূর্তি। মা বসে আছেন শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণ দিক আলো করে। আগে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম, দুটি হাত মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন তাঁর অনির্বচনীয় হাসির সুধা ঢেলে দিয়ে (অমন হাসি আর এ-জীবনে কারো দেখলাম না)। দৃষ্টি পড়ল গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের পদযুগলে, সুন্দর চরণ দুখানি। চরণতলে মাথা রাখলাম, মাথা আর তুলতে ইচ্ছে করছিল না;

মনে হল, আমার সমস্ত সত্তা লুটিয়ে পড়ল কী এক পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত নির্ভরে। আশ্চর্য ব্যাপার একটা দেখলাম এই যে, এর ঠিক আগের মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাবার জন্যে যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি তখন একটা অজানা উত্তেজনায় এত বুক ঢিব্‌ঢিব্‌ করছিল, মনে হচ্ছিল বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ী পিটছে। কিন্তু যেই তাঁকে দূর থেকে দেখলাম, সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, পায়ে মাথা রাখলাম তখন হল একেবারে অন্য অনুভূতি! তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে তাঁর ডান হাতখানি আমার মস্তকে রাখলেন। আহা! কী যে নরম সেই হাতের স্পর্শ। জানিনা সেই স্পর্শে কি ছিল বা কি পাচ্ছিলাম, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যা পাচ্ছিলাম তা আর কোথাও কখনো পাইনি। আর বলতে পারি সেই স্পর্শে জাগে ওই চরণে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে ফেলার আগ্রহ। পাওয়া যায় এমন এক ভরসা যাতে মন হয়ে যায় ভাবনামুক্ত। তাকালাম তাঁর দিকে, ওই চোখে চোখ রেখে আর চোখ ফেরাবার ক্ষমতা রইল না। মনে হল, কোন অতলের তল যেন দেখছি ওই চোখে। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম সে ঘর থেকে। কি ভাবে নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম জানি না, কি ভাবে দিন কাটল তাও জানি না। ওই নয়নাভিরাম মূর্তি জেগে রইল আমার সব জুড়ে। আমার সব ব্যেপে, সব ছেপে।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শন হল। যাঁর দর্শন পাবার জন্যে কবে থেকে কত কি ভেবেছি, যাঁর যোগ না পেলে এ জীবন রাখব না বলে স্থির করেছি, যাঁর চরণকূলে জীবনতরী ভিড়াব বলে অকূলে পাড়ি দিয়েছি, ভগবানকে ভাবতে গিয়ে যাঁর মূর্তি বারংবার আমার সামনে উদয় হয়েছে—আজ পেলাম সেই তাঁরই দর্শন—

গুরুরূপে কি?

অন্তরাত্মার উত্তর: শ্রীঅরবিন্দ শুধু গুরু নন্।

তাহলে মহাজ্ঞানী মহাযোগী রূপে?

উত্তর: তাও নয়। শ্রীঅরবিন্দ শুধু তাই নন।

পূর্ণযোগের স্রষ্টারূপে তবে?

উত্তর: হলেও তিনি শুধু তাই নন্।

তবে?

উত্তর: শ্রীঅরবিন্দরূপে।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দই, তিনি কোনো পর্যায়ে পড়েন না। তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ সারণং মম।